# জ্ঞানযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩

# জ্ঞানযোগ

স্বামী বিবেকানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা-৩

প্রকাশক
স্বামী আত্মবোধানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর
শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
এম্. আই. প্রেস
৩০ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা—৫

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সপ্তদশ সংস্করণ
ফাল্গুন, ১৩৬৪

দুই টাকা বার আনা

# সূচীপত্র

সন্ন্যাসীর গীতি ... ... ১

মায়া ... ... ৯

মানুষের যথার্থ স্বরূপ ( লণ্ডন ) ... ... ৩৮

ঐ ( নিউইয়র্ক ) ... ... ৬৮

মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ ... ... ১০৪

মায়া ও মুক্তি ... ... ১২৬

ব্রহ্ম ও জগৎ ... ... ১৪৬

জগৎ ( বহির্জ্জগৎ ) ... ... ১৭২

জগৎ ( ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড ) ... ... ১৮৯

অমৃতত্ব ... ... ২১৩

বহুত্বে একত্ব ... ... ২৩৩

সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন ... ... ২৫৮

অপরোক্ষানুভূতি ... ... ২৭৮

আত্মার মুক্তস্বভাব ... ... ৩১৩

কর্ম্মজীবনে বেদান্ত ( প্রথম প্রস্তাব ) ... ... ৩৩৭

ঐ ( দ্বিতীয় প্রস্তাব ) ... ... ৩৬৬

ঐ ( তৃতীয় প্রস্তাব ) ... ... ৩৯৭

ঐ ( চতুর্থ প্রস্তাব ) ... ... ৪১৭

# জ্ঞানযোগ

## সন্ন্যাসীর গীতি

### ১

উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান,
হিমাদ্রিশিখরে উঠিল যে গান—
গভীর অরণ্যে পর্ব্বত-প্রদেশে
সংসারের তাপ যথা নাহি পশে—
যে সঙ্গীত-ধ্বনি-প্রশান্ত-লহরী
সংসারের রোল উঠে ভেদ করি ;
কাঞ্চন কি কাম কিংবা যশ-আশ
যাইতে না পারে কভু যার পাশ ;
যথা সত্য-জ্ঞান-আনন্দ-ত্রিবেণী
—সাধু যায় স্নান করে ধন্য মানি—
উঠাও সন্ন্যাসি, উঠাও সে তান
গাও গাও গাও গাও সেই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ।

## ২

ভেঙ্গে ফেল শীঘ্র চরণ-শৃঙ্খল—
সোনার নির্ম্মিত হলে কি দুর্ব্বল,
হে ধীমান, তারা তোমার বন্ধনে ?
ভাঙ্গ শীঘ্র তাই ভাঙ্গ প্রাণপণে।
ভালবাসা-ঘৃণা, ভাল-মন্দ-দ্বন্দ্ব,
ত্যজহ উভয়ে, উভয়েই মন্দ।
আদর দাসেরে, কশাঘাত কর,
দাসত্ব-তিলক ভালের উপর ;
স্বাধীনতা-বস্তু কখন জানে না,
স্বাধীন আনন্দ কভু ত বোঝে না।
তাই বলি, ওহে সন্ন্যাসিপ্রবর,
দূর কর দুয়ে অতীব সত্বর ;
কর কর গান, কর নিরন্তর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

## ৩

যাক্ অন্ধকার, যাক্ সেই তমঃ,
আলেয়ার মত বুদ্ধির বিভ্রম
ঘটায়ে আঁধার হইতে আঁধারে।
নিয়ে যায় এই ভ্রান্ত জীবাত্মারে।
জীবনের এই তৃষা চিরতরে
মিটাও জ্ঞানের বারি পান করে।

৭

অন্বেষিছ মুক্তি কোথা বন্ধুবর ?
পাবে না ত হেথা, কিংবা এর পর ;
শাস্ত্রে বা মন্দিরে বৃথা অন্বেষণ ;
নিজহস্তে রজ্জু—যাহে আকর্ষণ ।
ত্যজ অতএব বৃথা শোকরাশি,
ছেড়ে দাও রজ্জু, বল হে সন্ন্যাসি—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

৮

দাও দাও দাও সবারে অভয়,
বল—'প্রাণিব্রাত, করো নাকো ভয় ;
ত্রিদিব পাতাল থাক যে যেখান,
সকলের আত্মা আমি বিদ্যমান ;
স্বরগ নরক, ইহামুত্রফল
আশা ভয় আমি ত্যজিনু সকল ।'
এইরূপে কাট মায়ার বন্ধন ;
গাও গাও গাও করে প্রাণপণ—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

৯

ভেব না দেহের হয় কিবা গতি,
থাকে কিংবা যায়—অনন্ত নিয়তি—
কার্য্য-অবশেষ হয়েছে উহার,
এবে ওতে প্রারব্ধের অধিকার ;

কেহ বা উহারে মালা পরাইবে,
কেহ বা উহারে পদ প্রহারিবে ;
চিত্তের প্রশান্তি ভেঙ্গো না কখন,
সদাই আনন্দে রহিবে মগন ;
কোথা অপযশ—কোথা বা সুখ্যাতি ?
স্তাবক-স্তাব্যের একত্ব-প্রতীতি,
অথবা নিন্দুক-নিন্দ্যের যেমতি ।
জানি এ একত্ব আনন্দ-অন্তরে—
গাও হে সন্ন্যাসি, নির্ভীক অন্তরে—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

## ১০

পশিতে পারে না কভু তথা সত্য,
কাম-লোভ-বশে যেই হৃদি মত্ত ;
কামিনীতে করে স্ত্রীবুদ্ধি যে জন,
হয় না তাহার বন্ধন-মোচন ;
কিংবা কিছু দ্রব্যে যার অধিকার,
হউক সামান্য—বন্ধন অপার ;
ক্রোধের শৃঙ্খল কিংবা পায়ে যার,
হইতে না পারে কভু মায়া পার ।
ত্যজ অতএব, এ সব বাসনা,
আনন্দে সদাই কর হে ঘোষণা—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

১১

সুখতরে গৃহ করো না নির্ম্মাণ,
কোন্ গৃহ তোমা ধরে, হে মহান্ ?
গৃহছাদ তব অনন্ত আকাশ,
শয়ন তোমার সুবিস্তৃত ঘাস ;
দৈববশে প্রাপ্ত যাহা তুমি হও,
সেই খাদ্যে তুমি পরিতৃপ্ত রও ;
হউক কুৎসিত, কিংবা সুরন্ধিত,
ভুঞ্জহ সকলি হয়ে অবিকৃত।
শুদ্ধ আত্মা যেই জ্ঞানে আপনারে,
কোন্ খাদ্য-পেয় অপবিত্র করে ?
হও তুমি চল-স্রোতস্বতী মত,
স্বাধীন উন্মুক্ত নিত্য-প্রবাহিত।
উঠাও আনন্দে, উঠাও সে তান,
গাও গাও গাও সদা এই গান—
ওঁ তৎ সৎ ওঁ

১২

তত্ত্বজ্ঞের সংখ্যা মুষ্টিমেয় হয়,
অ-তত্ত্বজ্ঞ তোমা হাসিবে নিশ্চয় ;
হে মহান্, তোমা করিবেক ঘৃণা,
তাহাদের দিকে চেয়েও দেখো না।
স্বাধীন, উন্মুক্ত—যাও স্থানে স্থানে,
অজ্ঞান হইতে উদ্ধারো অজ্ঞানে—

মায়া-আবরণে ঘোর অন্ধকারে,
নিয়তই যারা যন্ত্রণায় মরে।
বিপদের ভয় করো না গণনা,
সুখ-অন্বেষণে যেন হে যেতো না ;
যাও এ উভয় দ্বন্দ্ব-ভূমিপারে,
গাও গাও গাও, গাও উচ্চস্বরে—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

## ১৩

এইরূপে বন্ধো, দিন পর দিন,
করমের শক্তি হয়ে যাবে ক্ষীণ ;
আত্মার বন্ধন ঘুচিয়া যাইবে,
জনম তাহার আর না হইবে ;
আমি বা আমার কোথায় তখন ?
ঈশ্বর—মানব—তুমি—পরিজন ?
সকলেতে আমি—আমাতে সকল—
আনন্দ, আনন্দ, আনন্দ কেবল।
সে আনন্দ তুমি, ওহে বন্ধুবর,
তাই হে আনন্দে ধর তান ধর—

ওঁ তৎ সৎ ওঁ

# মায়া

মায়া এই কথাটি আপনারা প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন। ইহা সাধারণতঃ কল্পনা বা কুহক বা এইরূপ কোন অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা উহার প্রকৃত অর্থ নহে। মায়াবাদরূপ একতম স্তম্ভের উপর বেদান্ত স্থাপিত বলিয়া, ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য বুঝা আবশ্যক। মায়াবাদ বুঝাইতে হইলে সহসা হৃদয়ঙ্গম না হইবার আশঙ্কা আছে, একারণ আপনারা কথঞ্চিৎ মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ করিবেন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

বৈদিক সাহিত্যে কুহক অর্থেই মায়া শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। ইহাই মায়া শব্দের প্রাচীনতম অর্থ। কিন্তু তখন প্রকৃত মায়াবাদতত্ত্বের অভ্যুদয় হয় নাই। আমরা বেদে এইরূপ বাক্য দেখিতে পাই—"ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে", ইন্দ্র মায়া দ্বারা নানা রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। এস্থলে মায়া শব্দ ইন্দ্রজাল বা তত্তুল্যার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদের অনেক স্থলে মায়া শব্দ তাদৃশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে দেখা যায়। তৎপরে কিছুদিনের জন্য মায়া শব্দের ব্যবহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়া গেল। কিন্তু ইত্যবকাশে তৎশব্দ-প্রতিপাদ্য ভাব ক্রমশঃই পরিপুষ্ট হইতেছিল। পরবর্ত্তী সময়ে দেখা যায়, প্রশ্ন হইতেছে, "আমরা জগতের গুপ্ত রহস্য জানিতে পারি না কেন?" ইহার এইরূপ নিগূঢ়ভাবব্যঞ্জক উত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়—"আমরা অলীক ইন্দ্রিয়সুখে পরিতৃপ্ত ও বাসনাপর বলিয়া এই সত্যকে নীহারাবৃত করিয়া রাখিয়াছি"—"নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা

চাসুতৃপ উক্‌থশসশ্চরংতি!"[১] এস্থলে মায়া শব্দ আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই; কিন্তু উহাতে এই ভাবটি পরিব্যক্ত হইতেছে যে, আমাদের অজ্ঞতার যে কারণ অবধারিত হইয়াছে, তাহা এই সত্য ও আমাদিগের মধ্যে কুজ্ঝটিকাবৎ বর্ত্তমান। অনেক পরবর্ত্তী সময়ে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদে, মায়া শব্দের পুনরাবির্ভাব দেখা যায়। কিন্তু ইতোমধ্যে ইহার প্রভূত রূপান্তর সংঘটিত হইয়াছে; নূতন অর্থরাশি ইহার সহিত সংযোজিত হইয়াছে; নানাবিধ মতবাদ প্রচারিত ও পুনরুক্ত হইয়াছে; অবশেষে মায়াবিষয়ক ধারণা একটি স্থিরভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। আমরা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে পাঠ করি—"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।"—মায়াকেই প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী দার্শনিক পণ্ডিতগণ এই মায়াশব্দ বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করিয়াছিলেন। বোধ হয়, মায়াশব্দ বা মায়াবাদ বৌদ্ধদিগের দ্বারাও কথঞ্চিৎ রঞ্জিত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধদিগের হস্তে ইহা অনেকটা বিজ্ঞানবাদে ( idealism )[২] পরিণত হইয়াছিল এবং মায়া কথাটি এইরূপ অর্থেই এক্ষণে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতেছে। হিন্দু যখন 'জগৎ মায়াময়' বলেন, সাধারণ মানবের মনে এই ভাব উদিত হয় যে, 'জগৎ কল্পনামাত্র'। বৌদ্ধদার্শনিকদিগের ঈদৃশ ব্যাখ্যার কিছু ভিত্তি আছে; কারণ, এক শ্রেণীর দার্শনিকেরা বাহ্যজগতের অস্তিত্বে আদৌ বিশ্বাস করিতেন না। কিন্তু বেদান্তোক্ত মায়ার

---

[১] ঋগ্বেদ— ১০ম মণ্ডল, ৮২ সূক্ত, ৭ম ঋক্

[২] আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সমুদয় জগৎ আমাদের মনেরই বিভিন্ন অনুভূতিমাত্র, উহাদের বাস্তব সত্তা নাই, এই মতকে বিজ্ঞানবাদ বা idealism বলে।

শেষ পরিপুষ্টাকৃতি—বিজ্ঞানবাদ, বাস্তববাদ ( realism )[১] বা কোনরূপ মতবাদ নহে। আমরা কি এবং সর্ব্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার ইহা সহজ বর্ণনামাত্র। আমি আপনাদিগকে পূর্ব্বে বলিয়াছি, বেদ যাঁহাদের অন্তরনিঃসৃত, তাঁহাদের চিন্তাশক্তি মূলতত্ত্ব-অনুধাবনে ও আবিষ্করণেই অভিনিবিষ্ট ছিল। তাঁহারা যেন এই সকল তত্ত্বের বিস্তারিত অনুশীলন করিবার অবসর পান নাই এবং সেজন্য অপেক্ষাও করেন নাই। তাঁহারা বস্তুর অন্তরতম প্রদেশে উপনীত হইতেই ব্যগ্র ছিলেন। এই জগতের অতীত কিছু যেন তাঁহাদিগকে আকর্ষণ করিতেছিল, তাঁহারা যেন আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিলেন না। বস্তুতঃ উপনিষদের মধ্যে ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আধুনিক বিজ্ঞানের বিষয়ীভূত বিশেষ প্রতিপত্তিসকল অনেক সময়ে ভ্রমাত্মক হইলেও, উহাদের মূলতত্ত্বগুলির সহিত বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বের কোন প্রভেদ নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেখান যাইতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ইথর ( ether ) বা আকাশবিষয়ক অভিনব তত্ত্ব উপনিষদের মধ্যে রহিয়াছে। এই আকাশতত্ত্ব আধুনিক বৈজ্ঞানিকের ইথর অপেক্ষা সমধিক পরিপুষ্টভাবে বিদ্যমান। কিন্তু ইহা মূলতত্ত্বেই পর্য্যবসিত ছিল। তাঁহারা এই আকাশতত্ত্বের কার্য্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া অনেক ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন। জগতের যাবতীয় জীবনীশক্তি যাহার বিভিন্ন বিকাশমাত্র, সেই সর্ব্বব্যাপী জীবনীশক্তি-তত্ত্ব বেদে—উহার ব্রাহ্মণাংশেই, প্রাপ্ত হওয়া যায়। সংহিতার একটি দীর্ঘ মন্ত্রে সকল জীবনীশক্তির

---

[১] জগৎ কেবল আমাদের মনের অনুভূতিমাত্র নহে, উহার বাস্তব সত্তা আছে—এই মতকে বাস্তববাদ বা realism বলে।

বিকাশক প্রাণের প্রশংসাবাদ আছে। এই উপলক্ষে আপনাদের মধ্যে কাহারও কাহারও হয়ত জানিতে আনন্দ হইতে পারে যে, আধুনিক ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মতানুযায়ী এই পৃথিবীর জীবোদ্ভব-তত্ত্ব বৈদিক দর্শনে পাওয়া যায়। আপনারা নিশ্চয় সকলেই জানেন যে, জীব অন্য গ্রহাদি হইতে পৃথিবীতে সংক্রামিত হয়—এইরূপ একটি মত প্রচলিত আছে। জীব চন্দ্রলোক হইতে পৃথিবীতে আগমন করে—কোন কোন বৈদিক দার্শনিকের ইহাই স্থির মত।

মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা বিস্তৃত সাধারণ তত্ত্বসকল বিবৃত করিতে অতিশয় সাহস ও আশ্চর্য্য নির্ভীকতা দেখাইয়াছেন। বাহ্য জগৎ হইতে তাঁহারা এই বিশ্বরহস্যের মর্ম্মোদ্‌ঘাটনে যথাসম্ভব উত্তর পাইয়াছিলেন। আর তাঁহারা ঐরূপে যে-সকল মূলতত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহাতে যখন জগদ্রহস্যের প্রকৃত মীমাংসা হইল না, তখন আধুনিক বিজ্ঞানের বিশেষ প্রতিপত্তিসকল উহার মীমাংসার যে অধিকতর সহায়তা করিবে না, ইহা বলা বাহুল্য। যদি পুরাকালে আকাশ-তত্ত্ব বিশ্বরহস্য-ভেদে অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে উহার বিস্তারিত অনুশীলন আমাদিগকে সত্যাভিমুখে অধিক অগ্রসর করিতে পারিবে না। যদি বিশ্বতত্ত্ব-নির্ণয়ে এই সর্ব্বব্যাপী প্রাণ-তত্ত্ব অক্ষম হইয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার বিস্তারিত অনুশীলন নিরর্থক; কারণ তাহা বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তনসাধন করিতে পারিবে না। আমি এই বলিতে চাই, তত্ত্বানুশীলনে হিন্দু দার্শনিকগণ আধুনিক পণ্ডিত-দিগের ন্যায় এবং কখন কখন তাঁহাদিগের অপেক্ষাও অধিকতর সাহসী ছিলেন। তাঁহারা এরূপ অনেক সুবিস্তৃত সাধারণ নিয়ম

আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা আজও সম্পূর্ণ নূতন, এবং তাঁহাদের গ্রন্থে এইরূপ অনেক মতবাদ বিদ্যমান আছে, যাহা বর্ত্তমান বিজ্ঞান অদ্যাপি মতবাদরূপেও প্রাপ্ত হইতে পারে নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখান যাইতে পারে যে, তাঁহারা কেবল আকাশ-তত্ত্বে অধিরোহণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কিন্তু সমধিক অগ্রসর হইয়া সমষ্টি-মনকেও একটি সূক্ষ্মতর আকাশরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং তাহার উচ্চে অধিকতর সূক্ষ্ম আকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কিছুরই মীমাংসা হইল না। রহস্যের উত্তরদানে এই সকল তত্ত্ব অক্ষম। বাহ্য জগদ্বিষয়ক জ্ঞান যতদূরই বিস্তৃত হউক না কেন, এ রহস্যের উত্তরদান করিতে পারিবে না। মনে হয় যেন কথঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি, কয়েক সহস্র বৎসর আরও অপেক্ষা করা যাউক, ইহার মীমাংসা হইবে। বেদান্তবাদী মনের সসীমতা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, অতএব উত্তর করেন, "না, আমাদিগের সীমাবহির্ভূত হইবার শক্তি নাই। আমরা দেশকালনিমিত্তের বাহিরে যাইতে পারি না।" যেরূপ কেহই স্বকীয় সত্তা হইতে উল্লম্ফন করিতে সক্ষম নহেন, সেইরূপ দেশ ও কালের নিয়ম যে সীমাবন্ধনী স্থাপন করিয়াছে, তাহা অতিক্রম করিতে কাহারও সাধ্য নাই। দেশকালনিমিত্তসম্বন্ধীয় রহস্যাবধারণপ্রযত্ন বিফল; যেহেতু এরূপ চেষ্টা করিতে গেলেই এই তিনেরই সত্তা স্বীকার করিতে হইবে। অতএব ইহা কিরূপে সম্ভব? জগতের অস্তিত্ববাদ তাহা হইলে কিরূপ ভাব ধারণ করিতেছে?—"এই জগতের অস্তিত্ব নাই।" জগৎ মিথ্যা—ইহার অর্থ কি? ইহার নিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই, ইহাই অর্থ। আমার, তোমার ও অপর

সকলের মনের সম্বন্ধে ইহার কেবল আপেক্ষিক অস্তিত্ব আছে। আমরা পঞ্চেন্দ্রিয় দ্বারা এই জগৎ যেরূপ প্রত্যক্ষ করিতেছি, যদি আমাদের আর একটি অধিক ইন্দ্রিয় থাকিত, তাহা হইলে আমরা ইহাতে আর কিছু অভিনব প্রত্যক্ষ করিতাম এবং ততোধিক ইন্দ্রিয়সম্পন্ন হইলে, ইহা আরও বিভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইত। অতএব ইহার সত্তা নাই—সেই অপরিবর্ত্তনীয়, অচল, অনন্ত সত্তা ইহার নাই। কিন্তু ইহাকে অস্তিত্বশূন্য বলা যাইতে পারে না; কারণ ইহার ~~বর্ত্তমানতা রহিয়াছে~~ এবং ইহার সহিত মিশ্রিত হইয়াই আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। ইহা সৎ ও অসতের মিশ্রণ।

সূক্ষ্মতত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সাধারণ দৈনন্দিন স্থূলকার্য্য পর্য্যন্ত পর্য্যালোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদিগের সমস্ত জীবনই এই সৎ ও অসৎরূপ বিরুদ্ধভাবের সংমিশ্রণ। জ্ঞানাধিকারেও এই বিরুদ্ধভাব বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ মনে হয়, যেন মনুষ্য জিজ্ঞাসু হইলে সমগ্র জ্ঞানলাভে সক্ষম হইবে; কিন্তু কয়েকপদ অগ্রসর না হইতেই এরূপ অভেদ্য ব্যবধান দেখিতে পায়, যাহা অতিক্রম করা তাহার সাধ্যাতীত। তাহার সমস্ত কার্য্য বৃত্তসীমাবস্থিত হইয়া ভ্রাম্যমাণ এবং সেই বৃত্তসীমা তাহার পক্ষে অলঙ্ঘনীয়। তাহার অন্তরতম ও প্রিয়তম রহস্য-সকল মীমাংসার জন্য তাহাকে দিবারাত্র উত্তেজিত ও আহ্বান করিতেছে, কিন্তু ইহার উত্তর দিতে সে অক্ষম; কারণ তাহার নিজ বুদ্ধির সীমা উল্লঙ্ঘন করিবার সাধ্য নাই। তথাপি বাসনা তাহার অন্তরে সবলে প্রোথিত রহিয়াছে; কিন্তু এই সকল উত্তেজনার দমনই যে কেবলমাত্র মঙ্গলকর, তাহাও আমরা অবগত আছি।

আমাদের হৃৎপিণ্ডের প্রত্যেক স্পন্দন, প্রত্যেক নিঃশ্বাসের সহিত আমাদিগকে স্বার্থপর হইতে আদেশ করিতেছে। অপরদিকে এক অমানুষী শক্তি বলিতেছে যে, নিঃস্বার্থতাই একমাত্র মঙ্গলকর। জন্মাবধি প্রত্যেক বালকই সুখাশাবাদী (optimist); সে কেবল সুখের স্বপ্নই দর্শন করে। যৌবনসময়ে সে অধিকতর সুখাশাবাদী হয়। মৃত্যু, পরাজয় বা অপমান বলিয়া কিছু আছে, ইহা কোন যুবকের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বৃদ্ধাবস্থা আসিল—জীবন একটি ধ্বংসরাশি হইয়াছে, সুখস্বপ্ন আকাশে বিলীন হইয়াছে; বৃদ্ধ নিরাশাবাদ অবলম্বন করিয়াছেন। এইরূপে আমরা প্রকৃতি-তাড়িত হইয়া আশাশূন্য, অন্তশূন্য, সীমা ও গন্তব্যজ্ঞান-পরিশূন্যের ন্যায় এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ধাবিত হইতেছি। 'ললিতবিস্তরে' লিখিত বুদ্ধচরিতের একটি প্রসিদ্ধ সঙ্গীত এ সম্বন্ধে আমাদের স্মরণ হয়। এইরূপ বর্ণিত আছে, বুদ্ধদেব মানবের পরিত্রাতারূপে জন্মপরিগ্রহ করেন, কিন্তু তিনি রাজবাটীর বিলাসিতায় আত্মবিস্মৃত হওয়াতে, তাঁহার প্রবোধার্থ দেবকন্যাগণ কর্তৃক একটি সঙ্গীত গীত হইয়াছিল। সে সঙ্গীতের মর্মার্থ এইরূপ—"আমরা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছি, অবিরত পরিবর্তিত হইতেছি—নিবৃত্তি নাই, বিরাম নাই।" এইরূপ আমাদের জীবন বিরাম জানে না—অবিরতই চলিয়াছে। এখন উপায় কি? যাঁহার অন্নপানের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান, তিনি সুখাশাবাদী হইয়া বলেন, "ভীতিকর দুঃখের কথা কহিও না। সংসারের দুঃখ ও ক্লেশের কথা শুনাইও না।" তাঁহার নিকট গিয়া বল—"সকলই মঙ্গল।" তিনি বলেন, "সত্যই আমি নিরাপদে আছি; এই দেখ,

কেমন সুন্দর অট্টালিকায় বাস করিতেছি! আমার শীতের ভয় নাই! অতএব আমার সম্মুখে এ ভয়াবহ চিত্র আনিও না।” কিন্তু অপরদিকে শীতে ও অনাহারে কত লোক মরিতেছে! যাও, তাহাদিগকে শিক্ষা দাও যে ‘সমস্তই মঙ্গল’। কিন্তু ঐ যে একজন এ জীবনে ভীষণ ক্লেশ পাইয়াছে, সে ত সুখের, সৌন্দর্য্যের, মঙ্গলের ~~কথা শুনিবে না~~। সে বলিতেছে, “সকলকেই ভয় দেখাও; আমি যখন কাঁদিতেছি, অপরে কেন হাসিবে? আমি সকলকেই আমার সহিত ক্রন্দন করাইব; কারণ আমি দুঃখ-প্রপীড়িত, সকলেই দুঃখ-প্রপীড়িত হউক—ইহাতেই আমার শান্তি।” আমরা এইরূপ সুখাশাবাদ হইতে নিরাশাবাদে যাইতেছি। অতঃপর মৃত্যুরূপ ভয়াবহ ব্যাপার—সমগ্র সংসারই মৃত্যুমুখে যাইতেছে; সকলেই মরিতেছে। আমাদিগের উন্নতি, বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ কার্য্যকলাপ, সমাজসংস্কার, বিলাসিতা, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান—মৃত্যুই সকলের এক গতি। ইহাই সর্ব্বস্ব, ইহাই সুনিশ্চিত। নগরাদি হইতেছে, যাইতেছে; সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন হইতেছে—গ্রহাদি খণ্ড খণ্ড হইয়া ধূলিবৎ চূর্ণ হইয়া বিভিন্নগ্রহস্থিত বায়ুপ্রবাহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। এইরূপ অনাদি কালই চলিয়াছে। ইহার লক্ষ্য কি? মৃত্যুই সকলের লক্ষ্য। মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্য্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্ম্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে—সকলেই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইতেছে। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম মমতা বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন আমরা এ জীবনের মমতা করি? কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না? ইহা আমরা জানি না। ইহাই মায়া।

জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি রহিয়াছে। বালক বর্দ্ধিত হইয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হইল এবং হয়ত কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপি পুত্রে আকৃষ্ট। তাঁহার যখন বিচারশক্তি জাগরিত হয়, তখন তিনি তাহাকে স্নেহাবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি কিন্তু জানেন না যে, এ স্নেহ নহে—এক অপরিজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমণ্ডলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা দূরীভূত করিতে পারেন না তিনি যতই চেষ্টা করুন না, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া। আমরা সকলেই কল্পিত সুবর্ণলোমের[১] অন্বেষণে

---

[১] Golden Fleece : গ্রীক পৌরাণিক সাহিত্যে উল্লিখিত আছে যে, গ্রীসের অন্তর্গত থেসালিদেশের রাজবংশীয় আথামাসের পত্নী নেফেলের গর্ভে ফ্রিক্‌সাস নামে পুত্র ও হেল নাম্নী কন্যা জন্মে। কিছুদিন পরে নেফেলের মৃত্যু হইলে আথামাস ক্যাডমসকন্যা ইনোকে বিবাহ করেন। ইনো সপত্নীসন্তান-গণের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ ফ্রিক্‌সাসকে দেবোদ্দেশ্যে বলি দিবার জন্যই নানা কৌশলে তদীয় পতিকে সম্মত করান। কিন্তু বলিদানের পূর্ব্বেই ফ্রিক্‌সাসের স্বর্গীয়া গর্ভধারিণীর আত্মা তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট সুবর্ণলোমযুক্ত একটি মেষ লইয়া আসিলেন এবং তাহার উপর আরোহণ করিয়া সমুদ্র পার হইয়া পলায়ন করিতে আদেশ করিলেন। পথে ভগিনী হেল পড়িয়া গিয়া ডুবিয়া গেল—ফ্রিক্‌সাস কৃষ্ণসাগরের পূর্ব্বদিগস্থ কল্‌চিস নামক স্থানে উপনীত হইয়া তথায় জিউসদেবের উদ্দেশ্যে সেই মেষটিকে বলি দিয়া উহার চর্ম্মটি মার্সদেবের কুঞ্জে টাঙ্গাইয়া রাখিলেন। একটি দৈত্য উহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিল। কিছুদিন পরে ঐ সুবর্ণলোম আনয়নের জন্য আথামাসের ভ্রাতুষ্পুত্র জ্যাসন তদীয় প্রতিদ্বন্দী পেলিয়াস কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন এবং তিনি আর্গো নামক একখানি সুবৃহৎ অর্ণবযানে অনেক প্রসিদ্ধ বীরপুরুষবর্গে

ধাবিত হইতেছি, সকলেরই মনে হয়, ইহা আমারই প্রাপ্তব্য; কিন্তু তাঁহাদের কয়জন এ সংসারে জীবিত? জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিতে পারেন, এই সুবর্ণলোম প্রাপ্ত হইবার তাঁহার দুই কোটির একাংশের অধিক সম্ভাবনা নাই। তথাপি প্রত্যেক লোকেই উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন; কিন্তু অধিকাংশই কখন কিছুই প্রাপ্ত হন না; ইহাই মায়া। ইহসংসারে মৃত্যু দিবারাত্র সগর্ব্বে ভ্রমণ করিতেছে; আমাদের বিশ্বাস—আমরা চিরকাল জীবিত থাকিব। কোন সময়ে রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়—"এই পৃথিবীতে অত্যন্ত আশ্চর্য্য কি?" রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, "লোকসকল প্রত্যহই চতুর্দ্দিকে মরিতেছে, কিন্তু জীবিতেরা মনে করে, তাহারা কখনই মরিবে না।" ইহাই মায়া। আমাদের বুদ্ধি, জ্ঞান, জীবন, প্রত্যেক ঘটনা-মধ্যে সর্ব্বত্রই এই বিষম বিরুদ্ধভাব রহিয়াছে। সুখ দুঃখের, এবং দুঃখ সুখের অনুগামী হইতেছে। একজন সংস্কারক আবির্ভূত হইয়া জাতিবিশেষের দোষসমূহ প্রতিকারার্থ যত্নবান হইলেন, অমনি অপর দিকে বিশ সহস্র দোষ তৎপ্রতিকারের পূর্ব্বেই উত্থিত হইল। পতনোন্মুখ পুরাতন অট্টালিকার ন্যায় এক স্থানে জীর্ণসংস্কার করিতে, জীর্ণতা আসিয়া অপরদিকে আক্রমণ করে। ভারতীয় রমণীগণের চির-বৈধব্য-জনিত দোষপ্রতিকারার্থ আমাদের সংস্কারকগণ চীৎকার ও প্রচার করিতেছেন। পাশ্চাত্ত্য প্রদেশসমূহে অবিবাহিত থাকাই প্রধান দোষ। একস্থানে অপরিণীতাদের

---

পরিবেষ্টিত হইয়া নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উক্ত সুবর্ণলোম আনয়নে কৃতকার্য্য হন। গ্রীকপুরাণে ইহা Argonautic Expedition নামে বিখ্যাত।

যন্ত্রণামোচনে সহায়তা করিতে হইবে ; অন্যস্থানে বিধবাদিগের কষ্ট-অপসারণে যত্নবান হইতে হইবে ; দেহের পুরাতন বাতব্যাধির ন্যায় শিরস্থান হইতে তাড়িত হইয়া ইহা অঙ্গ আশ্রয় করিতেছে ; অঙ্গ হইতে পাদদেশ অধিকার করিতেছে। কেহ কেহ বা অপরাপেক্ষা ধনশালী হইয়াছেন—বিদ্যা, সম্পদ ও জ্ঞানানুশীলন কেবল তাঁহাদেরই সম্পত্তি হইয়াছে। জ্ঞান কি মহত্তর ও মনোহর, জ্ঞানানুশীলন কি সুন্দর! ইহা কেবল কতিপয়ের করায়ত্ত! এ চিন্তা ভয়ানক। সংস্কারক আসিলেন এবং সাধারণের মধ্যে এই জ্ঞান বিস্তার করিলেন। ইহাতে জনসাধারণ এক হিসাবে কতকটা সুখী হইল বটে, কিন্তু জ্ঞানানুশীলন যতই অধিক হইতে লাগিল, হয়ত শারীরিক সুখ ততই অন্তর্হিত হইতে লাগিল। এখন কোন্ পথ অবলম্বন করা যাইবে? সুখের জ্ঞান হইতে অসুখের জ্ঞান যে আসিতেছে! আমরা যে যৎসামান্য সুখ ভোগ করিতেছি, অন্য কোথাও তাহা সেই পরিমাণে অসুখ উৎপাদন করিতেছে। সকল বস্তুরই এই অবস্থা। যুবকেরা হয়ত ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন না। কিন্তু যাঁহারা বহুদিন জীবিত আছেন, অনেক যন্ত্রণা উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারা ইহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ইহাই মায়া। দিবারাত্র এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, কিন্তু ইহার সুমীমাংসা অসম্ভব। এইরূপ হইবার কারণ কি? এ বিষয়ের ন্যায়সঙ্গত কোন প্রশ্নই হইতে পারে না; এজন্য এ প্রশ্নের উত্তরও অসম্ভব। ইহার কারণাবধারণ হইতে পারে না। উত্তর করিবার পূর্ব্বে ইহার তাৎপর্য্যবোধই হইবে না—ইহা কি, তাহা জানিতেই পারিব না। আমরা ইহাকে এক

মুহূর্তও স্থির রাখিতে পারি না—প্রতি মুহূর্তেই আমাদের হস্ত-বহির্ভূত হইতেছে। আমরা অন্ধযন্ত্রবৎ পরিচালিত হইতেছি। আমরা যে কখন কখন নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিয়াছি, পরোপকার-চেষ্টা করিয়াছি, সেইগুলি স্মরণ করিয়া ভাবিতে পারি—কেন, ঐ কার্য্যগুলি ত আমরা বুঝিয়া-শুঝিয়া, ভাবিয়া-চিন্তিয়া করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা উহা না করিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়াই ঐরূপ করিয়াছিলাম। আমাকে এই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া আপনাদিগকে বক্তৃতা দ্বারা উপদেশ দিতে হইতেছে এবং আপনাদিগকে উপবেশনপূর্ব্বক উহা শ্রবণ করিতে হইতেছে—ইহাও আমরা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না বলিয়া করিতেছি। আপনারা গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন, হয়ত কেহ ইহা হইতে যৎসামান্য শিক্ষালাভ করিবেন, অপরে হয়ত মনে করিবেন লোকটা অনর্থক বকিতেছে; আমি বাটী যাইয়া ভাবিব, আমি বক্তৃতা দিয়াছি—ইহাই মায়া।

অতএব, এই সংসারগতি-বর্ণনার নামই মায়া। সাধারণতঃ লোকে এ কথা শ্রবণ করিলে ভীত হয়। আমাদিগকে সাহসী হইতে হইবে। অবস্থার বিষয় গোপন করিলে রোগ-প্রতিকার হইবে না। শশক যেরূপ কুকুর কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া নিম্নে মস্তক গোপনকরতঃ আপনাকে নিরাপদ জ্ঞান করে, আমরা সুখাশা-বাদী (optimist) হইয়া অবিকল সেই শশকের ন্যায় কার্য্য করিতেছি। ইহা রোগমুক্তির ঔষধ নহে।

অপর পক্ষে, ইহ-জীবনের প্রাচুর্য্য, সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য-ভোগিগণ এই মায়াবাদ সম্বন্ধে বিস্তর আপত্তি উত্থাপিত করেন। এদেশে—

ইংলণ্ডে নিরাশাবাদী হওয়া সুকঠিন। সকলেই আমাকে বলিতেছেন—জগৎকার্য্য কি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে! ইহা কিরূপ উন্নতিশীল! কিন্তু তাঁহারা স্বকীয় জীবনকেই তাঁহাদের জগৎ বলিয়া জানেন। পুরাতন প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—খ্রীষ্টধর্ম্মই পৃথিবীমধ্যে একমাত্র ধর্ম্ম, কারণ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী জাতিমাত্রেই সমৃদ্ধিশালী। এইরূপ হেতুবাদ দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয় সিদ্ধান্তের ভ্রমই প্রমাণিত হইতেছে; যেহেতু অখ্রীষ্টান জাতিদিগের দুর্ভাগ্যই খ্রীষ্টানজাতির সৌভাগ্যশালিতার কারণ। একের সৌভাগ্য-বর্দ্ধন অপরের শোণিতশোষণ অপেক্ষা করে। সমস্ত পৃথিবী খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী হইলে, অন্নস্বরূপ অখ্রীষ্টান জাতির অনস্তিত্বনিবন্ধন খ্রীষ্টানজাতি স্বতঃই দরিদ্র হইবে। সুতরাং এ যুক্তি আপনাকেই খণ্ডন করিয়াছে। উদ্ভিজ্জ পশ্বাদির অন্নস্বরূপ, মনুষ্য পশ্বাদির ভোক্তা, এবং সর্ব্বাপেক্ষা গর্হিত ব্যাপার—মনুষ্য পরস্পরের, দুর্ব্বল বলবানের ভক্ষ্য হইয়া রহিয়াছে। এইরূপ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। ইহাই মায়া। এ রহস্যের তুমি কি মীমাংসা কর? আমরা প্রত্যহই অভিনব যুক্তি শ্রবণ করি। কেহ বলিতেছেন, চরমে কেবল মঙ্গলই থাকিবে। এরূপ সম্ভাবনা অত্যন্ত সন্দেহ-স্থল হইলেও আমরা স্বীকার করিয়া লইলাম। কিন্তু এইরূপ পৈশাচিক উপায়ে মঙ্গল হইবার কারণ কি? পৈশাচিক রীতি-অবলম্বন ব্যতীত মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গলসাধন হয় না? বর্ত্তমান মানবগণের বংশোদ্ভবেরা সুখী হইবে; কিন্তু তাহাতে আমার কি ফললাভ হইতেছে? আমি যে এখন এ ভয়ানক যন্ত্রণা উপভোগ করিতেছি! ইহাই মায়া। ইহার মীমাংসা নাই। এরূপ শ্রবণ করা যায়, দোষাংশের

ক্রমপরিহার ক্রমবিকাশবাদের ( Darwin's Evolution ) একটি বিশেষত্ব ; সংসার হইতে এইরূপ দোষভাগ ক্রমাগত পরিত্যক্ত হইলে অবশেষে কেবল মঙ্গলই বিদ্যমান থাকিবে। ইহা শুনিতে অতি সুন্দর। এ সংসারে যাঁহাদের প্রাচুর্য্য বিদ্যমান আছে, যাঁহাদের প্রত্যহ কঠোর যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না, যাঁহাদিগকে ক্রমবিকাশের চক্রে নিষ্পেষিত হইতে হয় না, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের দাম্ভিকতা বর্দ্ধন করিতে পারে। সত্যই ইহা তাঁহাদের পক্ষে অতিশয় হিতকর ও শান্তিপ্রদ। সাধারণ লোকসমূহ যন্ত্রণা ভোগ করুক—তাঁহাদের ক্ষতি কি? তাহারা মারা যায়—সেজন্য তাঁহাদের ভাবিবার কি দরকার? বেশ কথা, কিন্তু এ যুক্তি আদ্যন্ত ভ্রমপূর্ণ। প্রথমতঃ, ইহারা বিনা প্রমাণে অবধারণ করিয়াছেন যে, জগতে অভিব্যক্ত মঙ্গল ও অমঙ্গলের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্বিতীয়তঃ, এতদপেক্ষা দোষাবহ নির্দ্ধারণ এই যে, মঙ্গলের পরিমাণ ক্রমবৃদ্ধিশীল, এবং অমঙ্গল নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান রহিয়াছে। অতএব এমন সময় উপস্থিত হইবে, যখন অমঙ্গলভাগ এইরূপে ক্রমবিকাশ দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে নিঃশেষিত হইবে এবং মঙ্গলই কেবল বিরাজিত থাকিবে—ইহা অতি সহজ উক্তি। কিন্তু অমঙ্গলের পরিমাণ যে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, ইহা কি প্রমাণ করা যায়? ইহা কি ক্রমশঃই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে না? একজন অরণ্যবাসী মানব, যে মনোবৃত্তি-পরিচলনায় অনভিজ্ঞ, একখানি পুস্তকপাঠেও অসমর্থ, হস্তলিপি কাহাকে বলে শ্রবণই করে নাই, অদ্য রাত্রে তাহাকে বিশ খণ্ডে বিভক্ত কর, কল্য সে সুস্থ হইয়া উঠিবে। শাণিত অস্ত্র তাহার শরীরমধ্যে প্রবেশ

করাইয়া দিয়া বাহির করিয়া আন, তথাপি সে আরোগ্যলাভ করিবে; কিন্তু আমরা অধিক সভ্য হইলেও পথে যাইতে আঁচড় লাগিলে মরিয়া যাই। শিল্পযন্ত্র দ্রব্যাদি সুলভ করিতেছে, উন্নতি ও ক্রমবিকাশ বর্দ্ধন করিতেছে, কিন্তু একজন ধনী হইবে বলিয়া লক্ষ লোককে নিষ্পেষিত করিতেছে, একজনকে ধনশালী করিয়া সহস্রকে দরিদ্র হইতে দরিদ্রতর করিতেছে, সংখ্যাতীত মানবকুলকে ক্রীতদাস করিয়াছে। জগতেব ধারাই এই। পাশব-প্রকৃতি ~~মানুষের সুখভোগ ইন্দ্রিয়ে~~ আবদ্ধ; তাহার দুঃখ ও সুখ ইন্দ্রিয়মধ্যেই সন্নিবিষ্ট আছে। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, কিংবা যদি তাহার শারীরিক অসুস্থতা ঘটে, সে আপনাকে দুর্ভাগা মনে করে। ইন্দ্রিয়ে তাহার সুখ-দুঃখেব উত্থান ও পর্য্যবসান হয়। যখন এরূপ ব্যক্তির উন্নতি হইতে থাকে, সুখের সীমারেখার বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার অসুখেরও বৃদ্ধি সমপরিমাণে হয়। অরণ্যবাসী মানব ঈর্ষাপরবশ হইতে জানে না, বিচারালয়ে যাইতে জানে না, নিয়মিত কর দিতে জানে না, সমাজকর্তৃক নিন্দিত হইতে জানে না, পৈশাচিক মানব-প্রকৃতি-সম্ভূত যে ভীষণ অত্যাচার পরস্পরের হৃদয়ের গুহ্যতম ভাব-অন্বেষণে নিযুক্ত রহিয়াছে, তদ্দ্বারা সে দিবারাত্র পর্য্যবেক্ষিত হইতে জানে না। সে জানে না—ভ্রান্তজ্ঞানসম্পন্ন গর্ব্বিত মানব কিরূপে পশু অপেক্ষাও সহস্রগুণে পৈশাচিকস্বভাব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমরা যখনই ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা হইতে উন্মুক্ত হইতে থাকি, আমাদের সুখানুভবের উচ্চতর শক্তির উন্মেষের সহিত যন্ত্রণানুভব-শক্তিরও পুষ্টি হয়। স্নায়ুমণ্ডল সূক্ষ্মতর হইয়া অধিক যন্ত্রণানুভবক্ষম হয়। সকল

সমাজেই ইহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ হইতেছে যে, মূঢ় সাধারণ মানব তিরস্কৃত হইলে অধিক দুঃখ অনুভব করে না, কিন্তু প্রহারের আতিশয্য হইলে ক্লিষ্ট হইয়া থাকে। ভদ্রলোক একটি কথার তিরস্কারও সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহার স্নায়ুমণ্ডল এত সূক্ষ্মভাবগ্রাহী হইয়াছে! তাঁহার সুখানুভূতি সহজ হইয়াছে বলিয়া তাঁহার দুঃখেরও বৃদ্ধি হইয়াছে। দার্শনিক পণ্ডিতগণের ক্রমবিকাশবাদ ইহার দ্বারা অধিক সমর্থিত হয় না। আমাদের সুখী হইবার শক্তি যতই বর্দ্ধিত করি, যন্ত্রণাভোগের শক্তি সেই পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমার বিনীত অভিমত এই, আমাদের সুখী হইবার শক্তি যদি সমযুক্তান্তর শ্রেণীর (যোগখড়ি —arithmetical progression) নিয়মে অগ্রসর হয়, অপর দিকে অসুখী হইবার শক্তি সমগুণিতান্তর শ্রেণীর (গুণখড়ি —geometrical progression)[1] নিয়মে বর্দ্ধিত হইবে। অরণ্যবাসী মানব সমাজসম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞ নহে। কিন্তু উন্নতিশীল আমরা জানিতেছি, আমরা যতই উন্নত হইব ততই আমাদের সুখদুঃখানুভবশক্তি তীব্র হইবে। আমাদের তিন-চতুর্থাংশ লোক যে আজন্ম উন্মাদগ্রস্ত, তাহা বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। ইহাই মায়া।

অতএব আমরা দেখিতেছি, মায়া সংসার-রহস্যের ব্যাখ্যার

---

[1] যোগখড়ি ও গুণখড়ি। যোগখড়ি—৩। ৫। ৭। ৯। ইত্যাদি, এখানে এই শ্রেণীটির মধ্যে প্রত্যেক পরবর্ত্তী অঙ্ক প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্ক হইতে দুই দুই করিয়া অধিক। গুণখড়ি যেমন—৩। ৬। ১২। ২৪ ইত্যাদি, এখানে প্রত্যেক পরবর্ত্তী অঙ্ক প্রত্যেক পূর্ব্ববর্ত্তী অঙ্কের দ্বিগুণ।

নিমিত্ত মতবাদবিশেষ নহে। সংসারের ঘটনা যেভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহা তাহারই বর্ণনামাত্র। বিরুদ্ধভাবই আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তি; সর্ব্বত্র এই ভয়ানক বিরুদ্ধভাবের মধ্য দিয়া আমরা যাইতেছি। যেখানে মঙ্গল, সেইখানেই অমঙ্গল রহিয়াছে। যেখানে অমঙ্গল, সেইখানেই মঙ্গল। যেখানে জীবন, মৃত্যু সেইখানেই ছায়ার মত তাহার অনুসরণ করিতেছে। যে হাসিতেছে, তাহাকেই কাঁদিতে হইবে; যে কাঁদিতেছে, সেও হাসিবে। এ ব্যাপার পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। আমরা অবশ্য এমন স্থান কল্পনা করিতে পারি, যেখানে কেবল মঙ্গলই থাকিবে, অমঙ্গল থাকিবে না; যেখানে আমরা কেবল হাসিব, কাঁদিব না। কিন্তু যখন এই সকল কারণ সমভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, তখন এরূপ সংঘটন স্বতঃই অসম্ভব। যেখানে আমাদিগকে হাসাইবার শক্তি বিদ্যমান, কাঁদাইবার শক্তিও সেইখানেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। যেখানে সুখোদ্দীপক শক্তি বর্ত্তমান, দুঃখদায়িকা শক্তিও সেইখানে লুক্কায়িত।

অতএব বেদান্তদর্শন সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। ইহা উভয়বাদই প্রচার করিতেছে; ঘটনাসকল যেভাবে বর্ত্তমান, ইহা তাহাই গ্রহণ করিতেছে; অর্থাৎ ইহার মতে এ সংসার মঙ্গল ও অমঙ্গল, সুখ ও দুঃখের মিশ্রণ; একটিকে বর্দ্ধিত কর, অপরটিও সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। কেবল সুখের সংসার বা কেবল দুঃখের সংসার হইতে পারে না। এরূপ ধারণাই স্ববিরোধী। কিন্তু এরূপ মত ব্যক্ত করিয়া ও ঈদৃশ বিশ্লেষণ দ্বারা বেদান্ত এই একটি মহারহস্যের মর্ম্মাবধারণ করিয়াছেন

যে, মঙ্গল ও অমঙ্গল দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন সত্তা নহে। এই সংসারে এমন একটি বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ মঙ্গলজনক বা সম্পূর্ণ অমঙ্গলজনক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। একই ঘটনা, যাহা অদ্য শুভজনক বলিয়া বোধ হইতেছে, কল্য তাহাই আবার অশুভ বোধ হইতে পারে। একই বস্তু, যাহা এক জনকে অসুখী করিতেছে, তাহাই আবার অপরের সুখ উৎপাদন করিতে পারে। যে অগ্নি শিশুকে দগ্ধ করে, তাহা অনশনক্লিষ্ট ব্যক্তির উত্তম ভক্ষ্যান্নও রন্ধন করিতে পারে। যে স্নায়ুমণ্ডলীর দ্বারা দুঃখবোধ অন্তরে প্রবাহিত হয়, সুখবোধও তাহারই দ্বারা অন্তরে নীত হয়। অমঙ্গল নিবারণ করিতে হইলে মঙ্গলনিবারণই তাহার একমাত্র উপায়; ইহার আর উপায়ান্তর নাই, ইহা নিশ্চিত। মৃত্যু বারণ করিতে হইলে, জীবনও বারণ করিতে হইবে। মৃত্যুহীন জীবন ও অসুখহীন সুখ স্ববিরোধী বাক্য, উভয়ের কোনটিই সত্য নহে। কারণ, উভয়ই একই বস্তুর বিকাশ। গতকল্য যাহা শুভদায়ক মনে করিয়াছিলাম, অদ্য তাহা করি না। যখন আমরা বিগত জীবন পর্যালোচনা করি, বিভিন্ন সময়ের আদর্শসকল আলোচনা করি, তখনই ইহার সত্যতা উপলব্ধ হয়। এক সময়ে তেজস্বী অশ্বযুগল চালনা করাই আমার আদর্শ ছিল। এখন এরূপ ভাবনা হয় না। শৈশবাবস্থায় মনে করিতাম, মিষ্টান্ন-বিশেষ প্রস্তুত করিতে পারিলে আমি সম্পূর্ণ সুখী হই। অপর সময়ে মনে হইত, স্ত্রীপুত্রপরিবৃত ও প্রচুর-অর্থসম্পন্ন হইলে সম্পূর্ণ সুখী হইব। এখন এসকল বালোচিত বুদ্ধিহীনতা জানিয়া হাস্য করি। বেদান্ত বলেন, যে-সকল আদর্শ অবলম্বন করিতে, আমাদিগের দৈহিক

ব্যক্তিত্ব পরিহার করিতে ভয়ের উদ্রেক হয়, সময়ে তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা হাস্য করিব। সকলেই স্ব স্ব দেহ রক্ষণ করিতে ব্যগ্র, কেহই ইহা পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না। এই দেহ যথেচ্ছ কাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিলে অত্যন্ত সুখী হইব, আমরা এইরূপই ভাবিয়া থাকি। কিন্তু সময়ে এ বিষয়ও স্মরণ করিয়া আমরা হাস্য করিব। অতএব, যদি আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা সৎও নয়, অসৎও নয় কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ, অসুখও নয়, সুখও নয় কিন্তু উভয়ের সংমিশ্রণ—এইরূপ বিষমবিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইল, তবে বেদান্তের আবশ্যকতা কি? অন্যান্য দর্শনশাস্ত্র ও ধর্ম্মমতসকলেরই বা আবশ্যকতা কি? বিশেষতঃ, শুভকর্ম্মাদি করিবারই বা প্রয়োজন কি? এই প্রশ্ন মনে উদিত হয়, কারণ লোকে ইহাই জিজ্ঞাসা করিবে—যদি শুভকর্ম্ম-সম্পাদনে যত্নবান হইলে সেই একই অমঙ্গল বর্ত্তমান থাকে এবং সুখোৎপাদনে যত্নবান হইলে পর্ব্বতসদৃশ অসুখরাশি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে এ সকলের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে বলা যায়—প্রথমতঃ, দুঃখমোচনের উদ্দেশ্যে তোমাকে কর্ম্ম করিতে হইবে, কারণ স্বয়ং সুখী হইবার ইহাই একমাত্র উপায়। আমরা প্রত্যেকে স্ব স্ব জীবনে, শীঘ্র বা বিলম্বে হউক, ইহার যথার্থতা বুঝিয়া থাকি। তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোকে কিছু সত্বরে, মলিনবুদ্ধি কিছু বিলম্বে ইহা বুঝিতে পারেন। মলিনবুদ্ধি লোকে উৎকট যন্ত্রণা ভোগ করিয়া, তীক্ষ্ণবুদ্ধি অল্প যন্ত্রণা পাইয়া ইহা আবিষ্কার করেন। দ্বিতীয়তঃ, যদিও আমরা জানি, এ জগৎ কেবল সুখপূর্ণ হইবে, দুঃখ থাকিবে না—এরূপ সময় কখন আসিবে না, তথাপি আমাদিগকে এই কার্য্যই

করিতে হইবে। যদি দুঃখ বর্দ্ধিত হইতে থাকে, তথাপি আমরা সে সময়ে আমাদের কার্য্য করিব। এই উভয় শক্তিই জগৎকে জীবন্ত রাখিবে; অবশেষে এমন একদিন আসিবে, যেদিন আমরা স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইব• এবং এই মৃৎপুত্তলিকানির্ম্মাণ পরিত্যাগ করিব। সত্যই আমরা চিরকাল মৃৎপুত্তলিকানির্ম্মাণ করিতেছি। আমাদের এ শিক্ষালাভ করিতে হইবে; আর ইহা শিক্ষা করিতে দীর্ঘকাল যাইবে।

বেদান্ত বলিতেছেন—অনন্তই সান্ত হইয়াছেন। জার্ম্মাণীতে এই ভিত্তির উপর দর্শনশাস্ত্রপ্রণয়নের চেষ্টা হইয়াছিল। এরূপ চেষ্টা এখনও ইংলণ্ডে হইতেছে। কিন্তু এই সকল দার্শনিকের মত বিশ্লেষণ করিলে এই পাওয়া যায় যে, অনন্তস্বরূপ ( Hegel's Absolute Mind ) আপনাকে জগতে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ইহা সত্য হইলে, অনন্ত যথাকালে আপনাকে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব, নিরপেক্ষাবস্থা বিকশিতাবস্থা অপেক্ষা নিম্নতর; কারণ, বিকশিতাবস্থায় নিরপেক্ষস্বরূপ আপনাকে ব্যক্ত করিতেছেন। যতকাল অনন্তস্বরূপ আপনাকে সম্পূর্ণ বহির্নিক্ষেপ করিতে না পারিতেছেন, আমাদিগকে ততকাল এই অভিব্যক্তির উত্তরোত্তর সাহায্য করিতে হইবে। ইহা অতি শ্রুতিমধুর এবং আমরা অনন্ত, বিকাশ, ব্যক্তি প্রভৃতি দার্শনিক শব্দও ব্যবহার করিলাম। কিন্তু সান্ত কিরূপে অনন্ত হইতে পারে, এক কিরূপে দুই কোটী হইতে পারে—এ সিদ্ধান্তের ন্যায়ানুগত মূলভিত্তি কি, তাহা দার্শনিক পণ্ডিতেরা স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা সোপাধিক হইয়াই এই জগৎরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। এস্থলে

সকলই সীমাবদ্ধ থাকিবেই। যাহা কিছু ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির মধ্য দিয়া আসিবে তাহাকে স্বতঃই সীমাবদ্ধ হইতে হইবে; অতএব সসীমের অসীমত্ব-প্রাপ্তি নিতান্ত মিথ্যা। ইহা হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে, বেদান্ত বলিতেছেন, সত্য বটে নিরপেক্ষ ও অনন্ত সত্তা আপনাকে সান্তস্বরূপে ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এরূপ সময় আসিবে, যখন এই উদ্যোগ অসম্ভব বুঝিয়া ইহাকে পশ্চাৎপদ হইতে হইবে। এই পশ্চাৎপদ হওয়াই যথার্থ ধর্ম্মের আরম্ভ। বৈরাগ্যই ধর্ম্মের সূচনা। আধুনিক ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্যবিষয়ে কথা কহা অত্যন্ত কঠিন। আমেরিকাতে আমাকে বলিত, আমি যেন পাঁচ সহস্র বৎসর পূর্ব্বের কোন অতীত ও বিলুপ্ত গ্রহ হইতে আগমনপূর্ব্বক বৈরাগ্যবিষয়ে উপদেশ দিতেছি। ইংলণ্ডীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ এইরূপই হয় ত বলিবেন। কিন্তু বৈরাগ্য ও ত্যাগই কেবল এ জীবনের একমাত্র সত্য বস্তু। প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া দেখ যদি উপায়ান্তর প্রাপ্ত হইতে পার। তাহা কখনই হইতে পারে না। এমন সময় আসিবে, যখন অন্তরাত্মা জাগরিত হইবেন—এই দীর্ঘ বিষাদময় স্বপ্নদর্শন হইতে জাগরিত হইয়া উঠিবেন; শিশু খেলা পরিত্যাগ করিয়া তাহার জননীর নিকট ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইবে। বুঝিবে—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥"

—কাম্যবস্তুর উপভোগে কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয় না, ঘৃতাহুতির দ্বারা অগ্নির ন্যায় ইহাতে বরং বাসনা বর্দ্ধিতই হইতে থাকে। এইরূপ কি ইন্দ্রিয়বিলাস, কি বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাজনিত আনন্দ,

কি মানবাত্মার উপভোগ্য সর্ব্ববিধ সুখ—সমস্তই মিথ্যা, সকলই মায়াধীন। সকলই এই সংসারপাশের অন্তর্গত, আমরা উহাকে অতিক্রম করিতে পারি না। আমরা উহার মধ্য দিয়া অনন্তকাল ধাবিত হইতে পারি, কিন্তু শেষ পাইব না; এবং যখনই সুখকণা পাইবার জন্য চেষ্টা করিব, তখনই দুঃখরাশি আমাদিগকে চাপিয়া ধরিবে। ইহা কি ভয়ানক অবস্থা! যখন আমি ইহা ভাবিতে চেষ্টা করি, আমার নিঃসংশয় অনুভূতি হয়, এই মায়াবাদ—সকলই মায়া—এই বাক্যই ইহার একমাত্র সমীচীন ব্যাখ্যা। এ সংসারে কি দুঃখরাশিই না বর্ত্তমান রহিয়াছে! যদি আপনারা বিবিধ জাতির মধ্যে পরিভ্রমণ করেন, আপনারা বুঝিতে পারিবেন যে, এক জাতি তাহার দোষভাগ এক উপায়ে প্রতিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছে, অপরে স্বতন্ত্র উপায় অবলম্বন করিয়াছে। সেই একই দোষ বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন উপায়ে প্রতিরোধ করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। যদ্যপি ইহাকে ক্রমশঃ স্বল্প করিয়া একাংশে নিবদ্ধ করা যায়, অপরাংশে রাশি রাশি অশুভ সঞ্চিত হইতে থাকে। ইহার এইরূপই গতি। হিন্দুগণ জাতীয় জীবনে কথঞ্চিৎ সতীত্বধর্ম্ম-উৎপাদনার্থ তাঁহাদের সন্তানগণকে এবং ক্রমে সমগ্র জাতিকে বাল্যবিবাহ দ্বারা অধোগামী করিয়াছেন। কিন্তু এ কথাও আমি অস্বীকার করিতে পারি না যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুজাতিকে সতীত্বধর্ম্মে ভূষিত করিয়াছে। তুমি কি ইচ্ছা কর? যদ্যপি জাতিকে সতীত্বধর্ম্মে সমধিক ভূষিত করিতে চাও, তাহা হইলে এই ভয়ানক বাল্যবিবাহ দ্বারা সমস্ত স্ত্রী-পুরুষকে শরীর-সম্বন্ধে অধোগামী করিতে হইবে। অপরদিকে, তুমিও কি নিরাপদে

বিপদশূন্য? কখনই না। কারণ, সতীত্বই জাতির জীবনী-শক্তি। তুমি কি ইতিহাস দেখ নাই যে, জাতির মৃত্যুচিহ্ন অসতীত্বের মধ্য দিয়া আসিয়াছে—যখন ইহা কোনও জাতির ভিতর প্রবেশ করে, তখনই উহার বিনাশ আসন্ন হইয়া থাকে? এইসকল দুঃখজনক প্রশ্নের মীমাংসা কোথায় পাইব? যদি পিতা-মাতা নিজ সন্তানের জন্য পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করেন, তাহা হইলে এই তথাকথিত প্রেমের দোষ নিবারিত হয়। ভারতের দুহিতৃগণ ভাবপ্রবণা অপেক্ষা অধিক কার্য্যকুশলা। তাহাদের জীবনে কল্পনাপ্রিয়তা অধিক স্থান পায় না। কিন্তু যদি লোকে আপনারা স্বামী ও স্ত্রী নির্ব্বাচন করে, তাহাতে অধিক সুখ আনয়ন করে না। ভারতীয় নারীগণ বেশ সুখী। স্ত্রী ও স্বামী—পরস্পরের মধ্যে কলহ প্রায়ই হয় না। পক্ষান্তরে যুক্তরাজ্যে, যেখানে স্বাধীনতার আতিশয্য বিরাজমান, সুখী পরিবার প্রায় নাই। অল্পসংখ্যক সুখী পরিবার হয় ত বিদ্যমান থাকিতে পারে, কিন্তু অসুখী পরিবার ও অসুখকর বিবাহের সংখ্যা এত অধিক যে, তাহা বর্ণনাতীত। আমি যে-কোন সভায় গমন করিয়াছি, তথায়ই শুনিয়াছি—তথায় উপস্থিত এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক তাহাদের পতি-পুত্রকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছে। এইরূপই সর্ব্বত্র। ইহা কি প্রকাশ করিতেছে? প্রকাশ করিতেছে যে, এইসকল আদর্শ দ্বারা অধিক সুখ উপার্জ্জিত হয় নাই। আমরা সকলেই সুখের জন্য উৎকট চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু একদিকে কিছু প্রাপ্ত না হইতেই অপর দিকে দুঃখ উপস্থিত হইতেছে।

তবে কি আমরা শুভকর কর্ম্ম করিব না? করিব বই কি—

পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক উৎসাহান্বিত হইয়া আমাদিগকে কার্য্য করিতে হইবে। কিন্তু এই জ্ঞান-শিক্ষা আযাদের উদ্ধত বাড়াবাড়ি ও একঘেয়েমি (fanaticism) দূর করিবে। ইংরেজ আর উত্তেজিত হইয়া হিন্দুকে 'ওঃ পৈশাচিক হিন্দু! নারীগণের প্রতি কি অসৎ ব্যবহার করে!' বলিয়া অভিশপ্ত করিবেন না। তিনি বিভিন্ন জাতির প্রথাসকল মান্য করিতে শিক্ষা করিবেন। একঘেয়েমি অল্প হইবে। কার্য্য অধিক হইবে। একঘেয়ে লোকেরা কার্য্য করিতে পারে না। তাহারা শক্তির তিন-চতুর্থাংশ বৃথা ব্যয়িত করে। যাঁহাকে ধীর প্রশান্তচিত্ত 'কাজের লোক' বলিয়া অভিহিত করা যায়, তিনিই কর্ম্ম করেন; নিরর্থক বাক্যপটু একঘেয়ে লোকেরা কিছুই করিতে পারে না। অতএব, এই জ্ঞান দ্বারা কার্য্যকারিণী শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। ঘটনাচক্র এইরূপই জানিয়া তিতিক্ষা অধিক হইবে। দুঃখ ও অমঙ্গলের দৃশ্য আমাদিগকে সমতা হইতে বিচ্যুত করিতে পারিবে না এবং ছায়ার পশ্চাদ্ধাবিত করাইবে না। সুতরাং সংসারগতি এইরূপ জানিয়া আমরা সহিষ্ণু হইব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাউক, সকল মনুষ্যই দোষশূন্য হইবে, তারপর পশুকুল ক্রমে মানবত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং সেই সমস্ত অবস্থার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে থাকিবে; উদ্ভিদ্‌দিগেরও গতি ঐরূপ। ইহাই কেবল কিন্তু সুনিশ্চিত—এই মহতী নদী সমুদ্রাভিমুখে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে, তৃণ ও পত্রখণ্ডসকল স্রোতে ভাসমান রহিয়াছে এবং হয়ত বিপরীত দিকে ফিরিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু এমন সময় আসিবে, যখন প্রত্যেক খণ্ড সেই অনন্ত বারিধিবক্ষে সঙ্কর্ষিত হইবে। অতএব জীবন, সমস্ত

দুঃখ ও ক্লেশ, আনন্দ, হাস্য ও ক্রন্দনের সহিত যে সেই অনন্ত সমুদ্রাভিমুখে প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতেছে ইহা নিশ্চিত এবং ইহা কেবল সময়সাপেক্ষ যখন তুমি, আমি, জীব, উদ্ভিদ ও সামান্য জীবাণুকণা পর্য্যন্ত যে যেখানে বর্ত্তমান রহিয়াছে সকলেই সেই অনন্ত জীবনসমুদ্রে—মুক্তি ও ঈশ্বরে আসিয়া পড়িবে।

আমি পুনরায় বলিতেছি, বেদান্ত সুখাশাবাদী বা নিরাশাবাদী নহে। এ সংসার কেবল মঙ্গলময় বা কেবলই অমঙ্গলময়—এইরূপ মত ইহা ব্যক্ত করে না। ইহা বলিতেছে, আমাদের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়েরই সমান মূল্য। ইহারা এইরূপে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। সংসার এইরূপ জানিয়া তুমি সহিষ্ণুতার সহিত কর্ম্ম কর। কি জন্য কর্ম্ম করিব? যদি ঘটনাচক্রই এইরূপ, আমরা কি করিব? অজ্ঞেয়বাদী হই না কেন? বর্ত্তমান অজ্ঞেয়বাদীরাও জানেন, এ রহস্যের মীমাংসা নাই, বেদান্তেব ভাষায় বলিতে গেলে—এই মায়াপাশ হইতে অব্যাহতি নাই। অতএব সন্তুষ্ট হইয়া সকল উপভোগ কর। এস্থলেও অতি অসঙ্গত মহাভ্রম রহিয়াছে। তুমি যে জীবন দ্বারা পরিবৃত হইয়া রহিয়াছ, তোমার সেই জীবনবিষয়ক জ্ঞান কিরূপ? তুমি কি জীবন বলিতে কেবল পঞ্চেন্দ্রিয়াবদ্ধ জীবন বুঝ? ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানে আমরা পশু হইতে সামান্যই ভিন্ন। কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এ স্থানে উপস্থিত কাহারও আত্মা সম্পূর্ণভাবে কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ নহে। অতএব আমাদের বর্ত্তমান জীবন বলিতে ইন্দ্রিয়াত্মজ্ঞানাপেক্ষা আরও কিছু অধিক বুঝায়। আমাদের সুখদুঃখানুভাবক মনোবৃত্তি ও চিন্তাশক্তিও ত আমাদের জীবনের প্রধান অঙ্গস্বরূপ; আর সেই মহাদর্শ ও পূর্ণতার

দিকে অগ্রসর হইবার কঠোর চেষ্টাও কি আমাদিগের জীবনের উপাদান নহে? অজ্ঞেয়বাদীদিগের (Spencer's Agnosticism) মতে আমাদের বর্ত্তমান জীবনরক্ষায় যত্নবান থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু জীবন বলিলে, আমাদিগের সামান্য সুখদুঃখের সহিত আমাদিগের জীবনের অস্থিমজ্জাস্বরূপ এই আদর্শ-অন্বেষণের, এই পূর্ণতাভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রবল চেষ্টাও বুঝায়। আমাদিগের ইহাই প্রাপ্ত হইতে হইবে। অতএব আমরা অজ্ঞেয়বাদী হইতে পারি না এবং অজ্ঞেয়বাদীর প্রত্যক্ষ সংসার লইতে পারি না। অজ্ঞেয়বাদী জীবনের শেষোক্ত উপাদান পরিত্যাগপূর্ব্বক অবশিষ্টাংশই সর্ব্বস্ব বলিয়া গ্রহণ করেন। তিনি এই আদর্শ জ্ঞানের অগোচর জানিয়া ইহার অন্বেষণ পরিত্যাগ করেন। এই স্বভাব, এই জগৎ—ইহাকেই মায়া বলে। বেদান্তমতে ইহাই প্রকৃতি। কিন্তু কি দেবোপাসনা, প্রতীকোপাসনা বা দার্শনিক চিন্তা অবলম্বনপূর্ব্বক আচরিত, অথবা কি দেবচরিত, পিশাচচরিত, প্রেতচরিত, সাধুচরিত, ঋষিচরিত মহাত্মাচরিত বা অবতারচরিতের সাহায্যে অনুষ্ঠিত, অপরিণত বা উন্নত ধর্ম্মমতসকলের একই উদ্দেশ্য। সকল ধর্ম্মই ইহাকে—এই বন্ধনকে অতিক্রম করিতে অল্পবিস্তর চেষ্টা করিতেছে। এক কথায় সকলেই স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হইতে কঠোর চেষ্টা করিতেছে। জ্ঞানপূর্ব্বক বা অজ্ঞানপূর্ব্বক মানব জানিয়াছেন, তিনি বন্দী। তিনি যাহা হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা নন। যে সময়ে, যে মুহূর্ত্তে তিনি চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, সেই কালেই তিনি ইহা শিক্ষা করিয়াছেন। তখনই তিনি অনুভব করিয়াছেন—তিনি বন্দী। তিনি আরও বুঝিয়াছেন, এই সীমাশৃঙ্খলিত হইয়া তাঁহার অন্তরে

কে যেন রহিয়াছেন, যিনি দেহেরও অগম্য স্থানে উড়িয়া যাইতে চাহিতেছেন। দুর্দ্দান্ত, নৃশংস, আত্মীয়-গৃহসমীপে গুপ্তাবস্থিত, হত্যা ও তীব্র সুরাপ্রিয় মৃত পিতৃ বা অন্য ভূত-যোনিতে শ্রদ্ধাবান অতি নিম্নতম ধর্ম্মমতসকলেও আমরা সেই একরূপ স্বাধীনতার ভাব দেখিতে পাই। যাঁহারা দেবতার উপাসনা-প্রিয়, তাঁহারা সেই সকল দেবতাতে আপনাপেক্ষা সমধিক স্বাধীনতা দেখিতে পান—দ্বার রুদ্ধ থাকিলেও, দেবতারা গৃহপ্রাচীর মধ্য দিয়া আসিতে পারেন; প্রাচীর তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে না। এই স্বাধীনতা-ভাব ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া অবশেষে সগুণ ঈশ্বরাদর্শে উপনীত হয়। ঈশ্বর মায়াতীত—ইহাই আদর্শের কেন্দ্রস্বরূপ। আমি যেন সম্মুখে কোন স্বর উত্থিত হইতে শুনিতেছি, যেন অনুভব করিতেছি ভারতের সেই প্রাচীন আচার্য্যগণ অরণ্যাশ্রমে এই সকল প্রশ্ন বিচার করিতেছেন, বৃদ্ধ ও পবিত্রতম ঋষিশ্রেষ্ঠগণ উহার মীমাংসা করিতে অক্ষম হইয়াছেন—কিন্তু একটি বালক সেই সভামধ্যে দাঁড়াইয়া বলিতেছে, "হে দিব্যধামবাসী অমৃতের পুত্রগণ! শ্রবণ কর, আমি পথ পাইয়াছি; তিনি অন্ধকারের অতীত, তাঁহাকে জানিলে অন্ধকারের বাহিরে যাইবার পথ পাওয়া যায়।"

শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।
আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ॥

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ

তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥
—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ, ২।৫ ও ৩।৮

ঐ উপনিষদ্ হইতে আমরা এই উক্তিও পাইতেছি যে, মায়া আমাদের চারিদিকে ঘিরিয়া রহিয়াছে এবং উহা অতি ভয়ঙ্কর। মায়ার মধ্য দিয়া কার্য করা অসম্ভব। যিনি বলেন, আমি এই নদীতীরে বসিয়া থাকি, যখন সমস্ত জল সমুদ্রে মিশিবে তখন আমি নদী পার হইব—তাঁহার বাক্য যেমন মিথ্যা, যিনি বলেন যতদিন না পৃথিবী পূর্ণমঙ্গলময় হয় ততদিন কার্য করিয়া অনন্তর পৃথিবী সম্ভোগ করিব, তাঁহার কথাও তদ্রূপ মিথ্যা। উভয়ের কোনটিই হইবে না। মায়ার মধ্য দিয়া পথ নাই, মায়ার বিরুদ্ধ-গমনই পথ—এ কথাও শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা প্রকৃতির সাহায্যকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করি নাই, কিন্তু তাহার প্রতিবাদী হইয়াই জন্মিয়াছি। আমরা বন্ধনের কর্তা হইয়াও আপনাদিগকে বন্দী করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই বাটী কোথা হইতে আসিল? প্রকৃতি ইহা প্রদান করে নাই। প্রকৃতি বলিতেছে—'যাও, বনে গিয়া বাস কর।' মানব বলিতেছে—'আমি বাটী নির্মাণ করিব, প্রকৃতির সহিত যুদ্ধ করিব।' সে তাহাই করিতেছে। মানব-জাতির ইতিহাস প্রাকৃতিক নিয়মের সহিত যুদ্ধই প্রদর্শন করে এবং মনুষ্যই অবশেষে বিজয়ী হয়। অন্তর্জগতে আসিয়া দেখ, সেখানেও সেই যুদ্ধ চলিয়াছে, ইহা পাশব-মানব ও আধ্যাত্মিক-মানবের সংগ্রাম, আলোক ও অন্ধকারের সংগ্রাম; মানব এখানেও বিজেতা। মানব এই স্বাধীনতা-পদবী প্রাপ্ত হইতে

প্রকৃতির মধ্য দিয়া আপনার গন্তব্য পথ পরিষ্কার করেন। আমরা এতদূর মায়ার বর্ণনাই দেখিয়াছি। এই মায়া অতিক্রম করিয়া বেদান্তবিৎ পণ্ডিতেরা এমন কিছু জানিয়াছেন, যাহা মায়াধীন নহে এবং যদ্যপি আমরা তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারি, আমরাও মায়াপারে যাইব। ঈশ্বরবাদী সমস্ত ধর্ম্মেরই ইহা সাধারণ সম্পত্তি। কিন্তু বেদান্তমতে ইহা ধর্ম্মের আরম্ভ, পর্য্যবসান নহে। যিনি বিশ্বের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা, যিনি মায়াধিষ্ঠিত, মায়া বা প্রকৃতির কর্ত্তা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, সেই সগুণ-ঈশ্বর-বিজ্ঞান এই বেদান্তমতের শেষ নহে। এই জ্ঞান ক্রমাগত বর্দ্ধিত হইয়াছে; অবশেষে বেদান্ত দেখিয়াছেন, যাঁহাকে বহিঃস্থিত বলিয়া বোধ হইয়াছিল তিনি নিজেই সেই, তিনি প্রকৃতপক্ষে অন্তরেই ছিলেন। যিনি আপনাকে বদ্ধভাবাপন্ন মনে করিয়াছিলেন, তিনিই সেই মুক্তস্বরূপ।

# মানুষের যথার্থ স্বরূপ

## ( লণ্ডনে প্রদত্ত বক্তৃতা )

মানুষ এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে এতদূর আসক্ত যে, সে সহজে উহা ছাড়িতে চাহে না। কিন্তু সে এই বাহ্য জগৎকে যতদূর সত্য ও সার বলিয়া বোধ করুক না কেন, প্রত্যেক ব্যক্তি এবং প্রত্যেক জাতির জীবনেই এমন সময় আসে, যখন তাহাদিগকে অনিচ্ছা-সত্ত্বেও জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য? যে ব্যক্তি তাঁহার পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যে অবিশ্বাস করিবার বিন্দুমাত্রও সময় পান না, যাঁহার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই কোন-না-কোনরূপ বিষয়-ভোগে নিযুক্ত, মৃত্যু তাঁহারও নিকট আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে হয়—জগৎ কি সত্য? এই প্রশ্নেই ধর্ম্মের আরম্ভ এবং উহার উত্তরেই ধর্ম্মের পর্য্যাপ্তি। এমন কি, সুদূর অতীত কালে, যথায় প্রণালীবদ্ধ ইতিহাসের অনধিকার, সেই রহস্যময় পৌরাণিক যুগেও, সেই সভ্যতার অস্ফুট উষাকালেও আমরা দেখিতে পাই এই একই প্রশ্ন তখনও জিজ্ঞাসিত হইয়াছে—"জগৎ কি সত্য?"

কবিত্বময় কঠোপনিষদের প্রারম্ভে আমরা এই প্রশ্ন দেখিতে পাই, "মানুষ মরিয়া গেলে, কেহ কেহ বলেন তাহার আর অস্তিত্ব থাকে না; কেহ কেহ আবার বলেন, না তখনও তাহার অস্তিত্ব

থাকে; ইহার মধ্যে কোন্‌টি সত্য? (যেয়ম্ প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে, অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে)।" জগতে এ সম্বন্ধে অনেক প্রকার উত্তর বিদ্যমান আছে। জগতে যতপ্রকার দর্শন বা ধর্ম্ম আছে, তাহারা বাস্তবিক এই প্রশ্নেরই বিভিন্নরূপ উত্তরে পরিপূর্ণ। অনেকে আবার এই প্রশ্নকে, প্রাণের এই গভীর আকাঙ্ক্ষাকে, এই জগদতীত পরমার্থসত্তার অন্বেষণকে বৃথা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যতদিন মৃত্যু বলিয়া জগতে কিছু থাকিবে, ততদিন এই সকল উড়াইয়া দিবার চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল হইবে। আমরা মুখে খুব সহজে বলিতে পারি—জগতের অতীত সত্তার অন্বেষণ করিব না, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তেই আমাদের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা আবদ্ধ রাখিব; আমরা ইহার জন্য খুব চেষ্টা করিতে পারি, আর বহির্জগতের সকল বস্তুই আমাদিগকে ইন্দ্রিয়ের সীমার ভিতরে বদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে, সমুদয় জগৎ মিলিয়া বর্ত্তমানের ক্ষুদ্র সীমার বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিতে নিবারণ করিতে পারে; কিন্তু যতদিন জগতে মৃত্যু থাকিবে ততদিন এই প্রশ্ন পুনঃ পুনঃ আসিবে—আমরা এই যে সকল বস্তুকে সত্যের সত্য, সারের সার বলিয়া তাহাতে ভয়ানক আসক্ত, মৃত্যুই কি ইহাদের চরম পরিণাম? জগৎ ত এক মুহূর্ত্তেই ধ্বংস হইয়া কোথায় চলিয়া যায়। অত্যুচ্চ গগনস্পর্শী পর্ব্বত—নিম্নে গভীর গহ্বর, যেন মুখব্যাদান করিয়া জীবকে গ্রাস করিতে আসিতেছে। এই পর্ব্বতের পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, যত কঠোর অন্তঃকরণই হউক, নিশ্চয়ই শিহরিয়া উঠিবে আর জিজ্ঞাসা করিবে—এ সব কি সত্য? কোন তেজস্বী হৃদয় সারা জীবন ধরিয়া মহান আগ্রহের সহিত হৃদয়ে

যে আশা পোষণ করিলেন, এক মুহূর্ত্তে তাহা উড়িয়া গেল। তবে কি ঐ সকল আশাকে সত্য বলিব? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে। কালে কখনও প্রাণের এই আকাঙ্ক্ষার, হৃদয়ের এই গভীর প্রশ্নের শক্তিহ্রাস হইবে না, বরং যতই কালস্রোত চলিবে, ততই উহার শক্তিবৃদ্ধি হইবে, ততই উহা হৃদয়ের উপর গভীর বেগে আঘাত করিবে। মানুষের সুখী হইবার ইচ্ছা। আপনাকে সুখী করিবার জন্য মানুষ সর্ব্বত্রই ধাবমান হয়—ইন্দ্রিয়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িয়া থাকে—উন্মত্তের ন্যায় বহির্জগতে কার্য্য করিয়া যায়। যে যুবা-পুরুষ জীবন-সংগ্রামে কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাঁহাকে যদি জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন এই জগৎ সত্য—তাঁহার সমস্তই সত্য বলিয়া প্রতীত হয়। হয়ত সেই ব্যক্তিই যখন বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইবেন, যখন সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বঞ্চনা করিতে থাকিবেন—সেই ব্যক্তিই হয়ত জিজ্ঞাসিত হইলে বলিবেন, 'সবই অদৃষ্ট।' তিনি এতদিনে দেখিতে পাইলেন—বাসনার পূরণ হয় না। তিনি যেখানেই যান, তথায়ই যেন এক বজ্রদৃঢ় প্রাচীর দেখিতে পান; তাহা অতিক্রম করিয়া যাইবার তাঁহার সাধ্য নাই। ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য-মাত্রেরই প্রতিক্রিয়া হইয়া থাকে। সুখ-দুঃখ উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। বিলাস, বিভব, শক্তি, দারিদ্র্য, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

এই প্রশ্নের দুইটি উত্তর আছে। একটি—শূন্যবাদীদের মত বিশ্বাস কর যে, সবই শূন্য, আমরা কিছুই জানিতে পারি না, আমরা ভূত-ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান সম্বন্ধেও কিছু জানিতে পারি না। কারণ, যে ব্যক্তি ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিয়া কেবল বর্ত্তমানের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া উহাতে দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিতে চাহে,

সে ব্যক্তি বাতুল। তাহা হইলে সে পিতামাতাকে অস্বীকার করিয়া সন্তানের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে পারে। উহাও তাহা হইলে যুক্তিসঙ্গত হইয়া পড়ে। ভূত-ভবিষ্যৎ অস্বীকার করিলে বর্ত্তমানও অস্বীকার করিতে হইবে। এই এক ভাব—ইহা শূন্যবাদীদের মত। কিন্তু আমি এমন লোক দেখিলাম না, যে এক মুহূর্ত্তও শূন্যবাদী হইতে পারে—মুখে বলা অবশ্য খুব সহজ।

দ্বিতীয় উত্তর এই—এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তরের অন্বেষণ কর, সত্যের অন্বেষণ কর, এই নিত্যপরিণামশীল নশ্বর জগতের মধ্যে কি সত্য আছে, অন্বেষণ কর। এই দেহ, যাহা কতকগুলি ভৌতিক অণুর সমষ্টিমাত্র, ইহার মধ্যে কি কিছু সত্য আছে? মানবজীবনের ইতিহাসে সর্ব্বদাই এই তত্ত্ব অন্বেষিত হইয়াছে, দেখা যায়। আমরা দেখিতে পাই, অতি প্রাচীন কালেই মানবের মনে এই তত্ত্বের অস্ফুট আলোক প্রতিভাত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। আমরা দেখিতে পাই, তখন হইতেই মানুষ স্থূলদেহের অতীত আর একটি দেহের জ্ঞানলাভ করিয়াছে—উহা অনেকাংশে ঐ দেহেরই মত বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ নহে; উহা স্থূল দেহ হইতে শ্রেষ্ঠ—শরীর-ধ্বংস হইয়া গেলেও উহার ধ্বংস হইবে না। আমরা ঋগ্বেদের সূক্তে মৃতশরীরবিশেষ-দাহনকারী অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত স্তব দেখিতে পাই—"হে অগ্নি, তুমি ইহাকে তোমার হস্তে করিয়া মৃদুভাবে লইয়া যাও—ইহাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর জ্যোতির্ম্ময় দেহসম্পন্ন কর—ইহাকে সেই স্থানে লইয়া যাও, যেখানে পিতৃগণ বাস করেন, যেখানে দুঃখ নাই, যেখানে মৃত্যু নাই।" তুমি দেখিবে, সকল ধর্ম্মেই এই একরূপ ভাব বিদ্যমান, আর তাহার সহিত আমরা আর

একটি তত্ত্বও পাইয়া থাকি। আশ্চর্য্যের বিষয়, সকল ধর্ম্মই সমস্বরে ঘোষণা করেন, মানুষ প্রথমে পবিত্র ও নিষ্পাপ ছিলেন, এক্ষণে তিনি অবনত হইয়া পড়িয়াছেন—এ ভাব তাঁহারা রূপকের ভাষায়, কিম্বা দর্শনের সুস্পষ্ট ভাষায়, অথবা সুন্দর কবিত্বের ভাষায় আবৃত করিয়া প্রকাশ করুন না কেন, তাঁহারা সকলেই কিন্তু ঐ এক তত্ত্ব ঘোষণা করিয়া থাকেন। সকল শাস্ত্র এবং সকল পুরাণ হইতেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্ব্বে যাহা ছিলেন, এক্ষণে তাহা হইতে অবনতভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। য়াহুদীদের শাস্ত্র বাইবেলের পুরাতন ভাগে আদমের পতনের যে গল্প আছে, তাহার মধ্যে সার কথা এই। হিন্দুশাস্ত্রে ইহা পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সত্যযুগ বলিয়া যে যুগের বর্ণনা করিয়াছেন, যখন মানুষ ইচ্ছামৃত্যু ছিলেন, যখন মানুষ যতদিন ইচ্ছা শরীর রক্ষা করিতে পারিতেন, যখন লোকের মন শুদ্ধ ও দৃঢ় ছিল, তাহাতেও এই সার্ব্বভৌম সত্যের ইঙ্গিত দেখা যায়। তাঁহারা বলেন, তখন মৃত্যু ছিল না এবং কোনরূপ অশুভ বা দুঃখ ছিল না, আর বর্ত্তমান যুগ সেই উন্নত অবস্থার অবনতভাব মাত্র। এই বর্ণনার সহিত আমরা সর্ব্বত্রই জলপ্লাবনের বর্ণনা দেখিতে পাই। এই জলপ্লাবনের গল্পেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সকল ধর্ম্মই বর্ত্তমান যুগকে প্রাচীন যুগের অবনত অবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জগৎ ক্রমশঃ মন্দ হইতে মন্দতর হইতে লাগিল। অবশেষে জলপ্লাবনে অধিকাংশ লোকই জলমগ্ন হইল। আবার উন্নতি আরম্ভ হইল। আবার উহা সেই পূর্ব্ব পবিত্র অবস্থালাভের জন্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। আপনারা সকলেই ওল্ড টেষ্টামেণ্টের

জলপ্লাবনের গল্প জানেন। ঐ একইপ্রকার গল্প প্রাচীন বাবিল, মিশর, চীন এবং হিন্দুদিগের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্রে জলপ্লাবনের এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়—মহর্ষি মনু একদিন গঙ্গা-তীরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ক্ষুদ্র মৎস্য আসিয়া বলিল, 'আপনি আমাকে আশ্রয় দিন।' মনু তৎক্ষণাৎ উহাকে সন্নিহিত একটি জলপাত্রে স্থাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি চাও ?' মৎস্যটি বলিল, 'এক বৃহৎ মৎস্য আমার বিনাশাভিপ্রায়ে আমার অনুসরণ করিতেছে, আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' মনু উহাকে গৃহে লইয়া গেলেন, প্রাতঃকালে দেখেন, সে ঐ পাত্রপ্রমাণ হইয়াছে। সে বলিল, 'আমি এ পাত্রে আর থাকিতে পারি না।' মনু তখন তাহাকে এক চৌবাচ্চায় স্থাপন করিলেন। পরদিন সে ঐ চৌবাচ্চাপ্রমাণ হইল, আর বলিল, 'আমি এখানেও থাকিতে পারিতেছি না।' তখন মনু তাহাকে নদীতে স্থাপন করিলেন। প্রাতে যখন দেখিলেন, তাহার কলেবর নদীপূর্ণ হইয়াছে, তখন তিনি উহাকে সমুদ্রে স্থাপন করিলেন। তখন মৎস্য বলিতে লাগিল, 'মনু, আমি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমি জলপ্লাবন দ্বারা জগৎ ধ্বংস করিব ; তোমাকে সাবধান করিবার জন্য আমি এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছি। তুমি একখানি সুবৃহৎ নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে সর্ব্বপ্রকার প্রাণী এক এক জোড়া করিয়া রক্ষা কর এবং স্বয়ং সপরিবারে উহাতে প্রবেশ কর। সকল স্থান জলে প্লাবিত হইলে, তাহার মধ্যে তুমি আমার শৃঙ্গ দেখিতে পাইবে। তাহাতে নৌকাখানি বাঁধিবে। তাহার পর, জল কমিয়া আসিলে নৌকা হইতে

নামিয়া আসিয়া প্রজাবৃদ্ধি কর।' এইরূপে ভগবানের কথানুসারে জলপ্লাবন হইল এবং মনু নিজ পরিবার এবং সর্ব্বপ্রকার জন্তুর এক এক জোড়া এবং সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদের বীজ জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিলেন এবং উহার অবসানে তিনি ঐ নৌকা হইতে অবতরণ করিয়া জগতে প্রজা উৎপন্ন করিতে লাগিলেন—আর আমরা মনুর বংশধর বলিয়া মানব নামে অভিহিত (মন্ ধাতু হইতে মনু শব্দ সিদ্ধ; মন্ ধাতুর অর্থ মনন অর্থাৎ চিন্তা করা)। এক্ষণে দেখ, মানবভাষা সেই আভ্যন্তরীণ সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টামাত্র। আমার স্থির বিশ্বাস—এই সকল গল্প আর কিছু নয়, একটি ছোট বালক—অস্পষ্ট অস্ফুট শব্দরাশিই যাহার একমাত্র ভাষা—সে যেন সেই ভাষায় গভীরতম দার্শনিক সত্য প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে; কেবল শিশুর উহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ইন্দ্রিয় অথবা অথবা অন্য কোনরূপ উপায় নাই। উচ্চতম দার্শনিক এবং শিশুর ভাষায় কোন প্রকারগত ভেদ নাই, কেবল গ্রামগত ভেদ আছে মাত্র। আজকালকার বিশুদ্ধ, প্রণালীবদ্ধ গণিতের তুল্য সঠিক কাটাছাঁটা ভাষা, আর প্রাচীনদিগের অস্ফুট রহস্যময় পৌরাণিক ভাষার মধ্যে প্রভেদ কেবল গ্রামের উচ্চতা-নিম্নতা। এইসকল গল্পের পশ্চাতে এক মহৎ সত্য আছে, প্রাচীনেরা উহা যেন প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। অনেক সময় এইসকল প্রাচীন পৌরাণিক গল্পগুলিরই ভিতরে মহামূল্য সত্য থাকে, আর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আধুনিকদিগের চাঁচাছোলা ভাষার ভিতরে অনেক সময় কেবল ভূষিমাল পাওয়া যায়। অতএব রূপকের আবরণে আবৃত বলিয়া আর আধুনিক

কালের রাম-শ্যামের মনে লাগে না বলিয়া প্রাচীন সব জিনিসই একেবারে ফেলিয়া দিতে হইবে, তাহারও কোন অর্থ নাই। 'অমুক মহাপুরুষ এই কথা বলিয়াছেন, অতএব ইহা বিশ্বাস কর'—ধর্ম্মসকল এইরূপ বলাতে যদি তাহারা উপহাসের যোগ্য হয়, তবে আধুনিকগণ অধিক উপহাসের যোগ্য। এখনকার কালে যদি কেহ মুশা, বুদ্ধ বা ঈশার উক্তি উদ্ধৃত করে, সে হাস্যাস্পদ হয়; কিন্তু হাক্সলি ( Huxley ), টিণ্ডাল ( Tyndal ) বা ডারুইনের ( Darwin ) নাম করিলেই লোক সে কথা একেবারে অকাট্য বলিয়া গ্রাহ্য করিয়া লয়। 'হাক্সলি এই কথা বলিয়াছেন'—অনেকের পক্ষে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট! আমরা কুসংস্কার হইতে মুক্ত হইয়াছি বটে! আগে ছিল ধর্ম্মের কুসংস্কার, এখন হইয়াছে বিজ্ঞানের কুসংস্কার; তবে আগেকার কুসংস্কারের ভিতর দিয়া জীবনপ্রদ আধ্যাত্মিক ভাব আসিত, এই আধুনিক কুসংস্কারের ভিতর দিয়া কেবল কাম ও লোভ আসিতেছে। সে কুসংস্কার ছিল ঈশ্বরের উপাসনা লইয়া, আর আধুনিক কুসংস্কার—অতি ঘৃণিত ধন, যশ বা শক্তির উপাসনা। ইহাই প্রভেদ। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক গল্পগুলির সম্বন্ধে আবার আলোচনা করা যাউক। এই সমুদয় গল্পগুলির ভিতরেই এই এক প্রধান ভাব দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানুষ পূর্ব্বে যাহা ছিলেন তাহা হইতে এক্ষণে অবনত হইয়া পড়িয়াছেন। আধুনিক কালের তত্ত্বান্বেষিগণ বোধ হয় যেন এই তত্ত্ব একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণ বোধ হয় যেন এই সত্য একেবারে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের

( mollusc ) ক্রমবিকাশমাত্র, অতএব পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক সিদ্ধান্ত সত্য হইতে পারে না। ভারতীয় পুরাণ কিন্তু উভয় মতেরই সমন্বয় করিতে সমর্থ। ভারতীয় পুরাণ মতে, সকল উন্নতিই তরঙ্গাকারে হইয়া থাকে। প্রত্যেক তরঙ্গই একবার উঠিয়া আবার পড়ে, পড়িয়া আবার উঠে, আবার পড়ে—এইরূপ ক্রমাগত চলিতে থাকে। প্রত্যেক গতিই চক্রাকারে হইয়া থাকে। আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখিলেও দেখা যাইবে, মানুষ কেবল ক্রমবিকাশে উৎপন্ন—এ প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। ক্রমবিকাশ বলিলেই তাহার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াকেও ধরিতে হইবে। বিজ্ঞানবিদ্‌ই তোমায় বলিবেন, কোন যন্ত্রে তুমি যে পরিমাণ শক্তিপ্রয়োগ করিবে, উহা হইতে সেই পরিমাণ শক্তিই পাইতে পার। অসৎ ( কিছু না ) হইতে সৎ ( কিছু ) কখন হইতে পারে না। যদি মানব, পূর্ণ মানব, বুদ্ধ-মানব, খ্রীষ্ট-মানব ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষের ক্রমবিকাশ হয়, তবে ঐ জন্তুকেও ক্রমসঙ্কুচিত বুদ্ধ বলিতে হইবে। যদি তাহা না হয় তবে ঐ মহাপুরুষগণ কোথা হইতে উৎপন্ন হইলেন? অসৎ হইতে ত কখন সৎ-এর উদ্ভব হয় না। এইরূপে আমরা শাস্ত্রের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের সমন্বয় করিতে পারি। যে শক্তি ধীরে ধীরে নানা সোপানের মধ্য দিয়া পূর্ণ মনুষ্যরূপে পরিণত হয়, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। উহা কোথাও না কোথাও বর্ত্তমান ছিল; আর যদি তোমরা বিশ্লেষণ করিতে গিয়া ঐরূপ ক্ষুদ্র মাংসল জন্তুবিশেষ বা জীবাণু ( protoplasm ) পর্য্যন্ত গিয়া উহাকেই আদিকারণ স্থির করিয়া থাক, তবে ইহা নিশ্চিত যে ঐ জীবাণুতে ঐ শক্তি কোন-না-কোনরূপে অবস্থিত ছিল।

বর্ত্তমান কালে এই এক মহা বিচার চলিতেছে যে, এই ভূতসমষ্টি দেহই কি আত্মা, চিন্তা প্রভৃতি বলিয়া পরিচিত শক্তির বিকাশের কারণ, অথবা চিন্তাশক্তিই দেহোৎপত্তির কারণ? অবশ্য জগতের সকল ধর্ম্মই বলেন, চিন্তা বলিয়া পবিচিত শক্তিই শরীরের প্রকাশক—তাঁহারা ইহার বিপরীত মতে আস্থা প্রকাশ করেন না। কিন্তু আধুনিক অনেক সম্প্রদায়ের মত (Comte's Positivism)—চিন্তাশক্তি কেবল শরীর নামক যন্ত্রের বিভিন্ন অংশগুলির কোন বিশেষরূপ সন্নিবেশে উৎপন্ন। যদি এই দ্বিতীয় মতটি স্বীকার করিয়া লইয়া বলা যায়—এই আত্মা বা মন বা উহাকে যে আখ্যাই দাও না কেন, উহা এই জড়দেহরূপ যন্ত্রেরই ফলস্বরূপ, যে সকল জড়পরমাণু মস্তিষ্ক ও শরীর গঠন করিতেছে তাহাদেরই রাসায়নিক বা ভৌতিক যোগে উৎপন্ন, তাহাতে এই প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়া যায়—শরীরগঠন কে করে? কোন্ শক্তি এই ভৌতিক অণুগুলিকে শরীররূপে পরিণত করে? কোন্ শক্তি প্রকৃতিস্থ জড়বস্তুরাশি হইতে কিয়দংশ লইয়া তোমার শরীর একরূপে, আমার শরীর আর একরূপে গঠন করে? এই সকল বিভিন্নতা কিসে হয়? আত্মা নামক শক্তি শরীরস্থ ভৌতিক পরমাণুগুলির বিভিন্ন সন্নিবেশে উৎপন্ন বলিলে, 'গাড়ীর পেছনে ঘোড়াযোতা'র ন্যায় হয়। কিরূপে এই সন্নিবেশ উৎপন্ন হইল? কোন্ শক্তি উহা করিল? যদি তুমি বল, অন্য কোন শক্তি এই সংযোগসাধন করিয়াছে, আর আত্মা—যাহা এক্ষণে জড়রাশিবিশেষের সহিত সংযুক্তরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছে—তাহাই আবার ঐ জড়পরমাণুসকলের সংযোগের ফলরূপ, তাহা হইলে কোন উত্তর হইল না। যে মত অন্যান্য মতকে খণ্ডন না করিয়া, সমুদয় না

হউক, অধিকাংশ ঘটনা—অধিকাংশ বিষয় ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাই গ্রহণীয়। সুতরাং ইহাই বেশী যুক্তিসঙ্গত যে, যে শক্তি জড়রাশি গ্রহণ করিয়া তাহা হইতে শরীরগঠন করে, আর যে শক্তি শরীরের ভিতরে প্রকাশিত রহিয়াছে, ইহারা উভয়ে অভেদ। অতএব, 'যে চিন্তাশক্তি আমাদেব দেহে প্রকাশিত হইতেছে, উহা কেবল জড়াণুর সংযোগোৎপন্ন, সুতরাং তাহার দেহনিরপেক্ষ অস্তিত্ব নাই—এই কথার কোন অর্থ নাই। আর শক্তি কখন জড় হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। বরং ইহা প্রমাণ করা অধিক সম্ভব যে, যাহাকে আমরা জড় বলি, তাহার অস্তিত্ব নাই। উহা কেবল শক্তির এক বিশেষ অবস্থামাত্র। কাঠিন্য প্রভৃতি জড়ের গুণসকল বিভিন্নরূপ স্পন্দনের ফল, প্রমাণ করা যাইতে পারে। জড়পরমাণুর ভিতর প্রবল কম্পন উৎপাদন করিলে, উহা কঠিন হইয়া যাইবে। খানিকটা বায়ুরাশিতে যদি অতিশয় প্রবল গতি উৎপাদন করা যায়, তবে উহাকে টেবিল অপেক্ষাও কঠিন বোধ হইবে। অদৃশ্য বায়ুরাশি যদি প্রবল ঝটিকার বেগে গতিশীল হয়, তবে উহাতে ইস্পাতের ডাণ্ডাকে বাঁকাইয়া দিবে ও ভাঙিয়া ফেলিবে—কেবল গতিশীলতা দ্বারা উহাতে এমন কাঠিন্যের ন্যায় ধর্ম্ম জন্মাইবে। এই দৃষ্টান্ত হইতে ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে, অনন্যভাব্য ও অজড় ইথারকে যদি প্রবল চক্রগতিবিশিষ্ট করা যায়, তবে উহাতে জড়পদার্থের গুণসমূহের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যাইবে। এইরূপভাবে বিচার করিলে ইহা বরং প্রমাণ করা সহজ হইবে যে, আমরা যাহাকে ভূত বলি, তাহার কোন অস্তিত্ব নাই, কিন্তু অপর মতটি প্রমাণ করা যায় না।

শরীরের ;ভিতর এই যে শক্তির বিকাশ দেখা যাইতেছে, ইহা কি? আমরা সকলেই ইহা সহজে বুঝিতে পারি—ঐ শক্তি যাহাই হউক, উহা জড়পরমাণুগুলি লইয়া তাহা হইতে আকৃতি-বিশেষ—মনুষ্য-দেহ গঠন করিতেছে। আর কেহ আসিয়া তোমার আমার জন্য শরীর গঠন করে না। অপরে আমার হইয়া খাইতেছে, এরূপ আমি কখনও দেখি নাই। আমাকেই ঐ খাদ্যের সার শরীরে গ্রহণ করিয়া, তাহা হইতে রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃতি সমুদায়ই গঠন করিতে হয়। এই অদ্ভুত শক্তিটি কি? ভূত-ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোনরূপ সিদ্ধান্ত মানুষের পক্ষে ভয়াবহ বোধ হয়; অনেকের পক্ষে উহা কেবলমাত্র আনুমানিক ব্যাপার বলিয়া প্রতীত হয়। সুতরাং বর্ত্তমানে কি হয়, আমরা সেইটিই বুঝিতে চেষ্টা করিব। আমরা বর্ত্তমান বিষয়টি গ্রহণ করিব। সে শক্তিটি কি, যাহা এক্ষণে আমার মধ্য দিয়া কার্য্য করিতেছে? আমরা দেখিয়াছি, সকল প্রাচীন শাস্ত্রেই এই শক্তিকে লোকে এই শরীরের মত শরীরসম্পন্ন একটি জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ বলিয়া মনে করিত, তাহারা বিশ্বাস করিত উহা এই শরীর যাইলেও থাকিবে। ক্রমশঃ আমরা দেখিতে পাই ঐ জ্যোতির্ম্ময় দেহমাত্র বলিয়া সন্তোষ হইতেছে না, আর একটি উচ্চতর ভাব লোকের মন অধিকার করিতেছে—তাহা এই যে, কোনরূপ শরীর শক্তির স্থলাভিষিক্ত হইতে পারে না। যাহারই আকৃতি আছে, তাহাই কতকগুলি পরমাণুর সংহতিমাত্র, সুতরাং উহাকে পরিচালিত করিতে আর কিছুর প্রয়োজন। যদি এই শরীরকে গঠন ও পরিচালন করিতে এই শরীরাতিরিক্ত

কিছুর প্রয়োজন হয়, তবে সেই কারণেই জ্যোতির্ম্ময় দেহের গঠন ও পরিচালনে তদ্দেহাতিরিক্ত আর কিছুর প্রয়োজন হইবে। এই 'আর কিছুই' আত্মা শব্দে অভিহিত হইল। আত্মাই ঐ জ্যোতির্ম্ময় দেহের মধ্য দিয়া যেন স্থূল শরীরের উপর কার্য্য করিতেছেন। ঐ জ্যোতির্ম্ময় দেহই মনের আধার বলিয়া বিবেচিত হয়, আর আত্মা উহার অতীত। আত্মা মন নহেন, তিনি মনের উপর কায্য করেন এবং মনেব মধ্য দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করেন। তোমার একটি আত্মা আছে, আমার একটি আত্মা আছে, প্রত্যেকেরই পৃথক্ একটি একটি আত্মা আছে এবং একটি একটি সূক্ষ্ম শরীরও আছে; ঐ সূক্ষ্ম শরীরের সাহায্যে আমরা স্থূল দেহের উপর কায্য করিয়া থাকি। এক্ষণে এই আত্মা ও উহার স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। শরীর ও মন হইতে পৃথক এই আত্মাব স্বরূপ কি? অনেক বাদ-প্রতিবাদ হইতে লাগিল, নানাবিধ সিদ্ধান্ত ও অনুমান হইতে লাগিল, নানাপ্রকার দার্শনিক অনুসন্ধান চলিতে লাগিল,—আমি আপনাদের সমক্ষে এই আত্মা সম্বন্ধে তাঁহারা যে কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা বর্ণনা করিতে চেষ্টা করিব। ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের এই এক বিষয়ে মতৈক্য দেখা যায় যে, আত্মার স্বরূপ যাহাই হউক, উহার কোন আকৃতি নাই, আর যাহার আকৃতি নাই তাহা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। কাল মনের অন্তর্গত,— দেশও মনের অন্তর্গত। কালব্যতীত কার্য্যকারণভাব থাকিতে পারে না। ক্রমবর্ত্তিতার ভাব ব্যতীত কার্য্যকারণভাবও থাকিতে পারে না। অতএব দেশকালনিমিত্ত মনের অন্তর্গত, আর এই

আত্মা মনের অতীত ও নিরাকার বলিয়া, উহাও অবশ্য দেশকাল-নিমিত্তের অতীত। আর যদি উহা দেশকালনিমিত্তের অতীত হয়, তাহা হইলে উহা অবশ্য অনন্ত হইবে। এইবার হিন্দুদর্শনের চূড়ান্ত বিচার আসিল। অনন্ত কখন দুইটি হইতে পারে না। যদি আত্মা অনন্ত হয়, তবে কেবল একটি মাত্র আত্মাই থাকিতে পারে, আর এই যে অনেক আত্মা বলিয়া বিভিন্ন ধারণা রহিয়াছে—তোমার এক আত্মা, আমারা আর এক আত্মা—ইহা সত্য নহে। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ একমাত্র, অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী, আর এই ব্যবহারিক জীব মানুষের এই প্রকৃত স্বরূপের সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র। এই হিসাবে পূর্ব্বোক্ত পৌরাণিক তত্ত্বগুলিও সত্য হইতে পারে যে, ব্যবহারিক জীব তিনি যতদূর বড় হউন না কেন, মানুষের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রকৃত স্বরূপের অস্ফুট প্রতিবিম্বমাত্র। অতএব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ আত্মা—কার্য্যকারণের অতীত বলিয়া, দেশকালের অতীত বলিয়া, অবশ্যই মুক্তস্বভাব। তিনি কখনও বদ্ধ ছিলেন না, তাঁহাকে বদ্ধ করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। এই ব্যবহারিক জীব, এই প্রতিবিম্ব দেশকালনিমিত্তের দ্বারা সীমাবদ্ধ, সুতরাং তিনি বদ্ধ। অথবা আমাদের কোন কোন দার্শনিকের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, 'বোধ হয় তিনি যেন বদ্ধ হইয়া রহিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি বদ্ধ নন।' আমাদের আত্মার ভিতরে যথার্থ সত্য এইটুকু—এই সর্ব্বব্যাপী, অনন্ত, চৈতন্যস্বভাব; আমরা স্বভাবতঃই উহা—চেষ্টা করিয়া আর আমাদিগকে উহা হইতে হয় না। প্রত্যেক আত্মাই অনন্ত—সুতরাং জন্মমৃত্যুর প্রশ্ন আসিতেই পারে না। কতকগুলি বালক পরীক্ষা

দিতেছিল। পরীক্ষক কঠিন কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন, তাহার মধ্যে এই প্রশ্ন ছিল—'পৃথিবী কেন পড়িয়া যায় না?' তিনি মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম প্রভৃতি উত্তর পাইতে ইচ্ছা করিতেছিলেন! অধিকাংশ বালক-বালিকাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। কেহ কেহ মাধ্যাকর্ষণ বা আর কিছু বলিয়া উত্তর দিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দিল—'কোথায় উহা পড়িবে?' এই প্রশ্নই যে ভুল। পৃথিবী পড়িবে কোথায়? পৃথিবীর পক্ষে পতন বা উত্থান কিছুই নাই। অনন্ত দেশের উপর-নীচু বলিয়া কিছুই নাই। উহা কেবলমাত্র আপেক্ষিকের অন্তর্গত। অনন্ত কোথায়ই বা যাইবে, কোথা হইতেই বা আসিবে? (যখন মানুষ ভূত-ভবিষ্যতের চিন্তা—তাহার কি কি হইবে এই চিন্তা—ত্যাগ করিতে পারে, যখন সে দেহকে সীমাবদ্ধ সুতরাং উৎপত্তি-বিনাশশীল জানিয়া দেহাভিমান ত্যাগ করিতে পারে, তখনই সে এক উচ্চতর অবস্থায় উপনীত হয়।) আত্মা দেহও নহেন, মনও নহেন, কারণ উহাদের হ্রাস-বৃদ্ধি আছে। কেবল জড় জগতের অতীত আত্মাই অনন্তকাল ধরিয়া থাকিতে পারেন। শরীর ও মন প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল। ইহারা পরিবর্ত্তনশীল কতকগুলি ঘটনা-শ্রেণীর নামমাত্র। ইহারা যেন নদীস্বরূপ, উহার প্রত্যেক জলপরমাণুই নিয়ত চঞ্চলভাবাপন্ন। তথাপি আমরা দেখিতেছি, উহা সেই একই নদী। এই দেহের প্রত্যেক পরমাণুই নিয়তপরিণামশীল; কোন ব্যক্তিরই কয়েক মুহূর্ত্ত ধরিয়াও একইরূপ শরীর থাকে না। তথাপি মনের উপর একপ্রকার সংস্কারবশতঃ আমরা উহাকে এক শরীর বলিয়াই

বিবেচনা করি। মনের সম্বন্ধেও এইরূপ; ক্ষণে সুখী, ক্ষণে দুঃখী; ক্ষণে সবল, ক্ষণে দুর্ব্বল! নিয়ত পরিণামশীল ঘূর্ণিবিশেষ! উহাও সুতরাং আত্মা হইতে পারে না, আত্মা অনন্ত। পরিবর্ত্তন কেবল সসীম বস্তুতেই সম্ভব। অনন্তের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয়, উহা অসম্ভব কথা। তাহা কখন হইতে পারে না। শরীরহিসাবে তুমি আমি একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাইতে পারি, জগতের প্রত্যেক অণুপরমাণুই নিত্য-পরিণামশীল; কিন্তু জগৎকে সমষ্টিরূপে ধরিলে, উহাতে গতি বা পরিবর্ত্তন অসম্ভব। গতি সর্ব্বত্রই আপেক্ষিক। আমি যখন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে যাই, তাহা একটি টেবিলের অথবা অপর একটি বস্তুর সহিত তুলনায় বুঝিতে হইবে, জগতের কোন পরমাণু অপর একটি পরমাণুর সহিত তুলনায় পরিণামপ্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু সমুদয় জগৎকে সমষ্টিভাবে ধরিলে কাহার সহিত তুলনায় উহা স্থান পরিবর্ত্তন করিবে? ঐ সমষ্টির অতিরিক্ত ত আর কিছু নাই। অতএব এই অনন্ত একমেবাদ্বিতীয়ম্, অপরিণামী, অচল ও পূর্ণ এবং উহাই পারমার্থিক সত্তা। সুতরাং সর্ব্বব্যাপীর ভিতরেই সত্য আছে, সান্তের ভিতর নহে। যতই আরামপ্রদ হউক না কেন, আমরা ক্ষুদ্র সান্ত সদাপরিণামী জীব—এই ধারণা প্রাচীন ভ্রমজ্ঞানমাত্র। যদি লোককে বলা যায় তুমি সর্ব্বব্যাপী অনন্ত পুরুষ, তাহারা ভয় পাইয়া থাকে। সকলের ভিতর দিয়া তুমি কার্য্য করিতেছ, সকল চরণের দ্বারা তুমি চলিতেছ, সকল মুখের দ্বারা তুমি কথা কহিতেছ, সকল নাসিকা দ্বারাই তুমি শ্বাসপ্রশ্বাস-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছ—লোককে ইহা বলিলে তাহারা ভয় পাইয়া থাকে। তাহারা

তোমায় পুনঃ পুনঃ বলিবে, এই 'অহং'-জ্ঞান কখনও যাইবে না। লোকের এই 'আমিত্ব' কোন্‌টি তাহা ত আমি দেখিতে পাই না। দেখিতে পাইলে সুখী হই।

ছোট শিশুর গোঁপ নাই, বড় হইলে তাহার গোঁপ-দাড়ী হয়। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে ত বালকের 'আমিত্ব' নষ্ট হইয়া গেল। যদি 'আমিত্ব' শরীরগত হয়, তবে আমার একটি চক্ষু বা হস্ত নষ্ট হইলে 'আমিত্ব'ও নষ্ট হইয়া গেল। মাতালের মদ ছাড়া উচিত নয়, তাহা হইলে তাহার 'আমিত্ব' যাইবে! চোরের সাধু হওয়া উচিত নয়, তাহা হইলে সে তাহার 'আমিত্ব' হারাইবে! কাহারও তাহা হইলে এই ভয়ে নিজ অভ্যাস ত্যাগ করা উচিত নয়। অনন্ত ব্যতীত আর 'আমিত্ব' কিছুতেই নাই। এই অনন্তেরই কেবল পরিণাম হয় না আর সবই ক্রমাগত পরিণামশীল। 'আমিত্ব' স্মৃতিতেও নাই। 'আমিত্ব' যদি স্মৃতিতে থাকিত, তবে মস্তকে প্রবল আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া অতীত স্মৃতি লুপ্ত হইয়া গেলে আমার 'আমিত্ব' নষ্ট হইত, আমি একেবারে লোপ পাইতাম! ছেলেবেলার দুই-তিন বৎসর আমার স্মরণ নাই; যদি স্মৃতির উপর আমার অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে ঐ দুই-তিন বৎসর আমার অস্তিত্ব ছিল না—বলিতেই হইবে। তাহা হইলে আমার জীবনের যে অংশ আমার স্মরণ নাই, সেই সময়ে আমি জীবিত ছিলাম না বলিতে হইবে। ইহা অবশ্য 'আমিত্ব'-সম্বন্ধীয় খুব সঙ্কীর্ণ ধারণা। আমরা এখনও 'আমি' নহি! আমরা এই 'আমিত্ব'-লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি—উহা অনন্ত; উহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। যাঁহার জীবন সমুদয়জগদ্ব্যাপী, তিনিই

জীবিত, আর যতই আমরা আমাদের জীবনকে শরীররূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সান্ত পদার্থে বদ্ধ করিয়া রাখি, ততই আমরা মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হই। আমাদের জীবন যে মুহূর্তে সমুদয় জগতে ব্যাপ্ত থাকে, যে মুহূর্তে উহা অপরে ব্যাপ্ত থাকে, সেই মুহূর্তেই আমরা জীবিত, আর যে সময় আমরা এই ক্ষুদ্র জীবনে আপনাকে বদ্ধ করিয়া রাখি, সেই মুহূর্তেই মৃত্যু এবং এই জন্যই আমাদের মৃত্যুভয় আসে। মৃত্যুভয় তখনই জয় করা যাইতে পারে, যখন মানুষ উপলব্ধি করে যে, যতদিন এই জগতে একটি জীবনও রহিয়াছে ততদিন সেও জীবিত। এরূপ লোক উপলব্ধি করিয়া থাকেন— 'আমি সকল বস্তুতে, সকল দেহে বর্তমান; সকল জন্তুর মধ্যেই আমি বর্তমান। আমিই এই জগৎ, সমুদয় জগৎই আমার শরীর! যতদিন একটি পরমাণু পর্যন্ত রহিয়াছে, ততদিন আমার মৃত্যুর সম্ভাবনা কি? কে বলে, আমার মৃত্যু হইবে?' তখন এরূপ ব্যক্তি নির্ভয় হইয়া যান, তখনই নির্ভীক অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। নিয়ত পরিণামশীল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর মধ্যে অবিনাশিত্ব আছে বলা বাতুলতা মাত্র। একজন প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক বলিয়াছেন, আত্মা অনন্ত, সুতরাং আত্মাই 'আমি' হইতে পারেন। অনন্তকে ভাগ করা যাইতে পারে না—অনন্তকে খণ্ড খণ্ড করা যাইতে পারে না। এই এক অবিভক্ত সমষ্টিস্বরূপ অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন, তিনিই মানুষের যথার্থ 'আমি', তিনিই 'প্রকৃত মানুষ'। মানুষ বলিয়া যাহা বোধ হইতেছে, তাহা কেবলমাত্র ঐ 'আমি'কে ব্যক্ত জগতের ভিতর প্রকাশ করিবার চেষ্টার ফল মাত্র; আর আত্মাতে কখন 'ক্রমবিকাশ' থাকিতে পারে না। এই যে সকল

পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, অসাধু সাধু হইতেছে, পশু মানুষ হইতেছে—এ সকল কখন আত্মাতে হয় না। মনে কর, যেন একটি যবনিকা রহিয়াছে; আর উহার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র রহিয়াছে, উহার ভিতর দিয়া আমার সম্মুখস্থ কতকগুলি—কেবল কতকগুলি মুখমাত্র দেখিতে পাইতেছি। এই ছিদ্র যতই বড় হইতে থাকে, ততই সম্মুখের দৃশ্য আমার নিকট অধিকতর প্রকাশিত হইতে থাকে, আর যখন ঐ ছিদ্রটি সমুদয় যবনিকা ব্যাপিয়া যায়, তখন আমি তোমাদিগকে স্পষ্ট দেখিতে পাইয়া থাকি। এস্থলে তোমার কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই—তুমি যাহা, তাহাই ছিলে। ছিদ্রেরই ক্রমবিকাশ হইতেছিল, আর তৎ সঙ্গে সঙ্গে তোমার প্রকাশ হইতেছিল। আত্মা সম্বন্ধেও এইরূপ। তুমি মুক্তস্বভাব ও পূর্ণই আছ। উহা চেষ্টা করিয়া পাইতে হয় না। ধর্ম্ম, ঈশ্বর বা পরকালের এই সকল ধারণা কোথা হইতে আসিল? মানুষ 'ঈশ্বর ঈশ্বর' করিয়া বেড়ায় কেন? কেন সকল জাতির ভিতরে, সকল সমাজেই মানুষ পূর্ণ আদর্শের অন্বেষণ করে—তাহা মনুষ্যে, ঈশ্বরে বা অন্য যে কিছুতেই হউক? তাহার কারণ—উহা তোমার মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। তোমার নিজের হৃদয়ই ধক্ ধক্ করিতেছে, তুমি মনে করিতেছ বাহিরের কোন বস্তু এইরূপ শব্দ করিতেছে, তোমার নিজের অভ্যন্তরস্থ ঈশ্বরই তোমাকে তাঁহার অনুসন্ধান করিতে, তাঁহার উপলব্ধি করিতে প্রেরণা দিতেছেন। এখানে সেখানে, মন্দিরে গির্জ্জায়, স্বর্গে মর্ত্ত্যে, নানা স্থানে এবং নানা উপায়ে অন্বেষণ করিবার পর অবশেষে আমরা যেখান হইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম—অর্থাৎ আমাদের আত্মাতেই, বৃত্তাকারে ঘুরিয়া

আসি এবং দেখিতে পাই—যাঁহার জন্য আমরা সমুদয় জগতে অন্বেষণ করিতেছিলাম, যাঁহার জন্য আমরা মন্দির গির্জ্জা প্রভৃতিতে কাতর হইয়া প্রার্থনা এবং অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলাম, যাঁহাকে আমরা সুদূর আকাশে মেঘরাশির পশ্চাতে লুক্কায়িত অব্যক্ত রহস্যময় বলিয়া মনে করিতেছিলাম, তিনি আমাদের নিকট হইতেও নিকটতম, প্রাণের প্রাণ, তিনিই আমার দেহ, তিনিই আমার আত্মা—তুমিই আমি—আমিই তুমি। ইহাই তোমার স্বরূপ--উহাকে প্রকাশ কর। তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে না—তুমি পবিত্রস্বরূপই আছ। তোমাকে পূর্ণস্বরূপ হইতে হইবে না, তুমি পূর্ণস্বরূপই আছ। সমুদয় প্রকৃতিই যবনিকার ন্যায় তাঁহার অন্তরালবর্ত্তী সত্যকে ঢাকিয়া রহিয়াছেন। তুমি যে-কোন সৎচিন্তা বা সৎকার্য্য কর, তাহা কেবলমাত্র যেন আবরণকে ধীরে ধীরে ছিন্ন করিতেছে, আর সেই প্রকৃতির অন্তরালস্থ শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত ঈশ্বর প্রকাশিত হইতেছেন। ইহাই মানুষের সমগ্র ইতিহাস। ঐ আবরণ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, তখন প্রকৃতির অন্তরালস্থ আলোক নিজ স্বভাববশতঃই ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে দীপ্তি পাইতে থাকেন, কারণ তাঁহার স্বভাবই এইরূপ ভাবে দীপ্তি পাওয়া। উঁহাকে জানা যায় না, আমরা উঁহাকে জানিতে বৃথাই চেষ্টা করিয়া থাকি। যদি উনি জ্ঞেয় হইতেন, তাহা হইলে উঁহার স্বভাবের বিলোপ হইত, কারণ উনি নিত্য জ্ঞাতা। জ্ঞান ত সসীম; কোন বস্তুর জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, উহাকে জ্ঞেয়বস্তুরূপে, বিষয়রূপে চিন্তা করিতে হইবে। তিনি ত সকল বস্তুর জ্ঞাতা-স্বরূপ, সকল বিষয়ের বিষয়িস্বরূপ, এই বিশ্ব-

ব্রহ্মাণ্ডের সাক্ষিস্বরূপ, তোমারই আত্মাস্বরূপ। জ্ঞান যেন একটি নিম্ন অবস্থা—অবনত ভাবমাত্র। আমরাই সেই আত্মা, উঁহাকে আবার জানিব কিরূপে? প্রত্যেক ব্যক্তি সেই আত্মা এবং সকলেই বিভিন্ন উপায়ে ঐ আত্মাকে জীবনে প্রকাশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে; তাহা না হইলে এত নীতিপ্রণালী কোথা হইতে আসিল? সমুদয় নীতিপ্রণালীর তাৎপর্য্য কি? সকল নীতিপ্রণালীতে একটি ভাবই ভিন্ন ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়া বর্ত্তমান—অপরের উপকার করা। মানবজাতির সমুদয় সৎকর্ম্মের মূল অভিসন্ধি—মানুষ, জন্তু সকলের প্রতি দয়া। কিন্তু এই সকলগুলিই 'আমিই জগৎ'; এই জগৎ এক অখণ্ডস্বরূপ, এই সনাতন সত্যের বিভিন্ন ভাবমাত্র। তাহা না হইলে, অপরের হিত করিবার যুক্তি কি? কেন আমি অপরের উপকার করিব? কিসে আমাকে অপরের উপকার করিতে বাধ্য করে? এই সর্ব্বত্র সমদর্শনজনিত সহানুভূতির ভাব হইতেই ইহা হইয়া থাকে। অতি কঠোর অন্তঃকরণও কখন কখন অপরের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া থাকে। এমন কি, যে ব্যক্তি এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং' প্রকৃতপক্ষে ভ্রমমাত্র, এই ভ্রমাত্মক 'অহং'-এ আসক্ত থাকা অতি নীচ কার্য্য—এই সকল কথা শুনিলে ভয় পায়, সেই ব্যক্তিই তোমাকে বলিবে, সম্পূর্ণ আত্মত্যাগই সমস্ত নীতির ভিত্তি। কিন্তু পূর্ণ আত্মত্যাগ কি? সম্পূর্ণ আত্মত্যাগ হইলে কি অবশিষ্ট থাকে? আত্মত্যাগ অর্থে এই আপাতপ্রতীয়মান 'অহং'-এর ত্যাগ, সর্ব্বপ্রকার স্বার্থপরতার পরিত্যাগ। এই অহঙ্কার ও মমতা পূর্ব্ব কুসংস্কারের ফলস্বরূপ, আর যতই এই 'অহং' ত্যাগ হইতে থাকে, ততই আত্মা

নিত্যস্বরূপে, নিজ পূর্ণ মহিমায় প্রকাশিত হন। ইহাই প্রকৃত আত্মত্যাগ—ইহাই সমুদয় নীতিশিক্ষার ভিত্তিস্বরূপ—কেন্দ্রস্বরূপ। মানুষ উহা জানুক আর নাই জানুক, সমুদয় জগৎ সেই দিকে ধীরে ধীরে চলিয়াছে, অল্পাধিক পরিমাণে তাহাই অভ্যাস করিতেছে। কেবল অধিকাংশ লোক উহা অজ্ঞাতভাবে করিয়া থাকে মাত্র। তাহারা উহা জ্ঞাতসারে করুক। ইহা প্রকৃত আত্মা নহে জানিয়া তাহারা এই ত্যাগযজ্ঞ আচরণ করুক। এই ব্যবহারিক জীব সসীম জগতের ভিতরে আবদ্ধ। এক্ষণে যাহাকে মানুষ বলা যাইতেছে, তাহা সেই জগতের অতীত অনন্ত সত্তার সামান্য আভাস মাত্র, সেই সর্ব্বস্বরূপ অনন্ত অনলের এক কণামাত্র। কিন্তু সেই অনন্তই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ।

এই জ্ঞানের ফল—এই জ্ঞানের উপকারিতা কি? আজকাল সব বিষয়ই এই ফল—এই উপকার—দেখিয়াই পরিমাণ করা হয়। অর্থাৎ মোট কথাই এই, উহাতে কত টাকা, কত আনা, কত পয়সা হয়। লোকের এরূপ জিজ্ঞাসা করিবার কি অধিকার আছে? সত্য কি উপকার বা অর্থের মাপকাঠি লইয়া বিচারিত হইবে? মনে কর, উহাতে কোন উপকার নাই, উহা কি কম সত্য হইয়া যাইবে? উপকার বা প্রয়োজন সত্যের নির্ণায়ক হইতে পারে না (Bentham's Utilitarianism and James' Pragmatism)। যাহা হউক, এই জ্ঞানে মহৎ উপকার ও প্রয়োজনও আছে। আমরা দেখিতেছি সকলেই সুখের অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোকে নশ্বর মিথ্যা বস্তুতে উহা অন্বেষণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়ে কেহ কখনও সুখ পায় নাই। সুখ আত্মাতেই কেবল পাওয়া যায়। অতএব এই

আত্মাতে সুখলাভ করাই মানুষের সর্ব্বোচ্চ প্রয়োজন। আর এক কথা এই যে, অজ্ঞানই সকল দুঃখের জনক এবং মূল অজ্ঞান এই যে, আমরা মনে করি সেই অনন্তস্বরূপ যিনি, তিনি আপনাকে সান্ত মনে করিয়া কাঁদিতেছেন; সমস্ত অজ্ঞানের মূলভিত্তি এই যে, অবিনাশী নিত্যশুদ্ধ পূর্ণ আত্মা হইয়াও আমরা ভাবি যে, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেহমাত্র; ইহাই সমুদয় স্বার্থপরতার মূল। যখনই আমি আপনাকে একটি ক্ষুদ্র দেহ বলিয়া বিবেচনা করি, তখনই আমি উহাকে—জগতের অন্যান্য শরীরের সুখদুঃখের দিকে দৃষ্টি না করিয়াই—রক্ষা করিতে এবং উহার সৌন্দর্য্য সম্পাদন করিতে ইচ্ছা করি। তখন তুমি আমি ভিন্ন হইয়া যাই। যখনই এই ভেদজ্ঞান আসে, তখনই উহা সর্ব্বপ্রকার অমঙ্গলের দ্বার খুলিয়া দেয় এবং সর্ব্বপ্রকার দুঃখ প্রসব করে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানলাভে এই উপকার হইবে যে, যদি বর্ত্তমান কালের মনুষ্যজাতির খুব সামান্য অংশও ক্ষুদ্রভাব ত্যাগ করিতে পারে, তবে কালই এই জগৎ স্বর্গরূপে পরিণত হইবে, কিন্তু নানাবিধ যন্ত্র এবং বাহ্য-জগৎসম্বন্ধীয় জ্ঞানের উন্নতিতে উহা কখনও হইবে না। যেমন অগ্নির উপর তৈল প্রক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা আরও বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ উহাতে দুঃখই বৃদ্ধি হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত যতই ভৌতিক জ্ঞান উপার্জ্জিত হইতে থাকে, তাহা কেবল অগ্নিতে ঘৃতাহুতি মাত্র। উহাতে কেবল স্বার্থপর লোকের হস্তে অপরের কিছু লইবার জন্য, অপরের জন্য নিজের জীবন না দিয়া অপরের স্কন্ধে বসিয়া খাইবার জন্য আর একটি যন্ত্র—আর একটি সুবিধা দেওয়া হয় মাত্র।

আর এক প্রশ্ন—ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব? বর্ত্তমান সমাজে ইহা কি কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে? তাহার উত্তর এই, সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান প্রদর্শন করে না। সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক, কিছুই ক্ষতি নাই। সত্যই সকল প্রাণী এবং সকল সমাজের মূল ভিত্তিস্বরূপ; সুতরাং সত্য কখনও সমাজের মত আপনাকে গঠিত করিবে না। যদি নিঃস্বার্থপরতার ন্যায় মহৎ সত্য সমাজে কার্য্যে পরিণত না করা যায়, তবে বরং সমাজ ত্যাগ করিয়া বনে গিয়া বাস কর। তাহা হইলেই সাহসীর মত কার্য্য করিলে। সাহস দুই প্রকারের আছে—এক প্রকারের সাহস কামানের মুখে যাওয়া! ইহা যদি প্রকৃত সাহস হয়, তাহা হইলে ত ব্যাঘ্রগণ মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়া পড়ে। কিন্তু আর এক রকম সাহস আছে, তাহাকে সাত্বিক সাহস বলা যাইতে পারে। একজন দিগ্বিজয়ী সম্রাট একবার ভারতবর্ষে আগমন করেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে ভারতীয় সাধুদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়াছিলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তিনি দেখিলেন, এক বৃদ্ধ সাধু এক প্রস্তরখণ্ডের উপর উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সম্রাট তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন। সুতরাং তিনি ঐ সাধুকে সঙ্গে করিয়া নিজ দেশে লইয়া যাইতে চাহিলেন। সাধু তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন, বলিলেন, "আমি এই বনে বেশ আনন্দে আছি।" সম্রাট বলিলেন, "আমি সমুদয় পৃথিবীর সম্রাট। আমি আপনাকে অসীম ঐশ্বর্য্য ও উচ্চ পদমর্য্যাদা প্রদান করিব।" সাধু বলিলেন, "ঐশ্বর্য্য

পদমর্য্যাদা প্রভৃতি কিছুতেই আমার আকাঙ্ক্ষা নাই।” তখন সম্রাট বলিলেন, “আপনি যদি আমার সহিত না যান, তবে আমি আপনার বিনাশসাধন করিব।” সাধু তখন উচ্চ হাস্য করিয়া বলিলেন, “মহারাজ, তুমি যত কথা বলিলে তন্মধ্যে ইহাই দেখিতেছি মহা অজ্ঞানের মত কথা। তুমি আমাকে সংহার কর সাধ্য কি? সূর্য্য আমায় শুষ্ক করিতে পারে না, অগ্নি আমায় পোড়াইতে পারে না, কোন যন্ত্রও আমাকে সংহার করিতে পারে না; কারণ আমি জন্মরহিত, অবিনাশী, নিত্যবিদ্যমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বশক্তিমান আত্মা।” ইহা আর এক প্রকারের সাহসিকতা। ১৮৫৭ সালের সিপাহীবিদ্রোহের সময় একটি মুসলমান সৈনিক একজন মহাত্মা সন্ন্যাসীকে অস্ত্রাঘাত করিয়া প্রায় হত্যা করিয়াছিল। হিন্দু বিদ্রোহিগণ ঐ মুসলমানকে স্বামীজীর নিকট ধরিয়া আনিয়া বলিল, ‘বলেন ত, ইহাকে হত্যা করি।’ কিন্তু স্বামীজী তাহার দিকে ফিরিয়া, ‘ভাই, তুমিই সেই, তুমিই সেই’—এই বলিতে বলিতে তৎক্ষণাৎ দেহত্যাগ করিলেন। এও একপ্রকার সাহসিকতা। যদি তোমরা সত্যের আদর্শে সমাজ গঠন না করিতে পার, যদি এমনভাবে সমাজ গঠন না করিতে পার যাহাতে সেই সর্ব্বোচ্চ সত্য স্থান পাইতে পারে, তাহা হইলে তোমরা আর বাহুবলের কি গৌরব কর? তাহা হইলে তোমরা তোমাদের পাশ্চাত্ত্য মণ্ডলী-সকলের কি গৌরব কর? তোমাদের মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে কি গৌরব কর, যদি তোমরা কেবল দিবারাত্র বলিতে থাক—ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব? পয়সা-কড়ি ছাড়া আর কিছুই কি কার্য্যকর নহে? যদি

তাই হয়, তবে তোমাদের সমাজের এত অহঙ্কার কর কেন? সেই সমাজই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, যেখানে সর্ব্বোচ্চ সত্য কার্য্যে পরিণত করা যাইতে পারে—ইহাই আমার মত। আর যদি সমাজ এক্ষণে উচ্চতম সত্যকে স্থান দিতে অপারগ হয়, তবে উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও। উহাকে উপযুক্ত করিয়া লও, আর যত শীঘ্র তুমি উহাতে কৃতকার্য্য হইবে, ততই মঙ্গল। হে নরনারীগণ, আত্মাতে জাগ্রত হইয়া উঠ, সত্যে বিশ্বাসী হইতে সাহসী হও, সত্যের অভ্যাসে সাহসী হও। জগতে কতকগুলি সাহসী নরনারীর প্রয়োজন। সাহসী হওয়া বড় কঠিন। শারীরিক সাহস বিষয়ে ব্যাঘ্র মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ। উহাদের স্বভাবতঃই ঐরূপ সাহসিকতা আছে। এ বিষয়ে বরং পিপীলিকা অন্য জন্তু হইতে শ্রেষ্ঠ। এই শারীরিক সাহসিকতার কথা কেন বল? সেই সাহসিকতা অভ্যাস কর, যাহা মৃত্যুর সমক্ষেও ভয় পায় না, যাহা মৃত্যুকে স্বাগত বলিতে পারে, যাহাতে মানুষ জানিতে পারে সে আত্মা, আর সমুদয় জগতের মধ্যে কোন অস্ত্রেরই সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, সমুদয় বজ্র মিলিলেও তাহাদের সাধ্য নাই তাহাকে সংহার করে, জগতের সমুদয় অগ্নির সাধ্য নাই তাহাকে দগ্ধ করিতে পারে—যে সাহসিকতা সত্যকে জানিতে সাহসী হয় এবং জীবনে সেই সত্য দেখাইতে পারে; তবেই তুমি মুক্ত পুরুষ, তবেই তুমি তোমার প্রকৃত স্বরূপ জানিয়াছ। ইহা এই সমাজে প্রত্যেক সমাজেই অভ্যাস করিতে হইবে। 'আত্মা সম্বন্ধে প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।'

আজকালকার সমাজে একটা গতি দেখা দিয়াছে—কার্য্যের

দিকে বেশী ঝোঁক দেওয়া এবং সর্ব্বপ্রকার মনন, ধ্যান-ধারণা প্রভৃতিকে একেবারে উড়াইয়া দেওয়া। কার্য্য খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসূত। মনের ভিতর যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তির বিকাশ হয়, তাহাই যখন শরীরের ভিতর দিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই কার্য্য বলে। চিন্তা ব্যতীত কোন কার্য্য হইতে পারে না। মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তা—উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ঐগুলিকে দিবারাত্র মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাখ, তাহা হইলে উহা হইতেই মহৎ মহৎ কার্য্য হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বল—আমরা শুদ্ধ পবিত্রস্বরূপ। আমরা ক্ষুদ্র, আমরা জন্মিয়াছি, আমরা মরিব—এই চিন্তায় আমরা আপনাদিগকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছি এবং তজ্জন্য সর্ব্বদাই একরূপ ভয়ে জড়সড় হইয়া রহিয়াছি।

একটি আসন্নপ্রসবা সিংহী একবার নিজ শিকার-অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিল। সে দূরে একদল মেষ বিচরণ করিতেছে দেখিয়াই যেমন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য লাফ দিল অমনি তাহার প্রাণত্যাগ হইল, একটি মাতৃহীন সিংহশাবক জন্মগ্রহণ করিল। মেষদল ঐ সিংহশাবকটির রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল, সেও মেষগণের সহিত একত্র বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, মেষগণের ন্যায় ঘাস খাইয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল; যদিও সে একটি রীতিমত সিংহ হইয়া দাঁড়াইল, তথাপি সে নিজেকে মেষ বলিয়া ভাবিতে লাগিল। এইরূপে দিন যায়, এমন সময়ে আর একটি প্রকাণ্ডকায় সিংহ শিকার-অন্বেষণে তথায় উপস্থিত হইল, কিন্তু সে দেখিয়াই আশ্চর্য্য

হইল যে, উক্ত মেষদলের মধ্যে একটি সিংহ রহিয়াছে, আর সে মেষধর্ম্মী হইয়া বিপদের আগমন-সম্ভাবনামাত্রেই পলাইয়া যাইতেছে। সে উহার নিকট গিয়া 'সে যে সিংহ, মেষ নহে' বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিল; কিন্তু যেই সে অগ্রসর হইতে গেল, অমনি মেষপাল পলাইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে মেষ-সিংহটিও পলাইল। যাহা হউক, ঐ সিংহটি উক্ত মেষ-সিংহটিকে তাহার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইয়া দিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিল না। সে ঐ মেষ-সিংহটি কোথায় থাকে, কি করে, লক্ষ্য করিতে লাগিল। একদিন দেখিল, সে এক জায়গায় পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সে দেখিয়াই তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়া বলিল, 'ওহে, তুমি মেষপালের সঙ্গে থাকিয়া আপন স্বভাব ভুলিলে কেন? তুমি ত মেষ নহ, তুমি যে সিংহ।' মেষ-সিংহটি বলিয়া উঠিল, 'কি বলিতেছ, আমি যে মেষ, সিংহ কিরূপে হইব?' সে কোনমতে বিশ্বাস করিবে না যে সে সিংহ, বরং সে মেষের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল। সিংহ তাহাকে টানিয়া একটা হ্রদের দিকে লইয়া গেল, বলিল, 'এই দেখ তোমার প্রতিবিম্ব, এই দেখ আমার প্রতিবিম্ব।' তখন সে সেই দুইটিরই তুলনা করিতে লাগিল। সে একবার সেই সিংহের দিকে, একবার নিজের প্রতিবিম্বের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। তখন মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার এই জ্ঞানোদয় হইল যে, সত্য আমি সিংহই ত বটে। তখন সে সিংহগর্জ্জন করিতে লাগিল, তাহার মেষবৎ চীৎকার কোথায় চলিয়া গেল! তোমরা সিংহ-স্বরূপ—তোমরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। "হে সখে, কেন রোদন করিতেছ? জন্ম-মৃত্যু

তোমারও নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগ-দুঃখ কিছুই নাই, তুমি অনন্ত-আকাশস্বরূপ, নানাবর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীলবর্ণই রহিয়াছে।" এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে। আমরা জগতে পাপ-তাপ দেখি কেন? কারণ আমরা নিজেরাই অসৎ। পথের ধারে একটি স্থাণু রহিয়াছে। একটা চোর সেই পথ দিয়া যাইতেছিল, সে ভাবিল—এ একজন পাহারাওয়ালা। নায়ক উহাকে তাহার নায়িকা ভাবিল। একটি শিশু উহাকে দেখিয়া ভূত মনে করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি এইরূপে উহাকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখিলেও, উহা সেই স্থাণু ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না।

আমরা নিজেরা যেমন, জগৎকেও তদ্রূপ দেখিয়া থাকি। একটি টেবিলের উপর এক থলে মোহর রাখিয়া দাও আর মনে কর, সেখানে যেন একজন শিশু রহিয়াছে। একজন চোর আসিয়া এ স্বর্ণমুদ্রাগুলি গ্রহণ করিল। শিশুটি কি বুঝিতে পারিবে—উহা অপহৃত হইল? আমাদের ভিতরে যাহা, বাহিরেও তাহা দেখিয়া থাকি। শিশুটির মনে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। সকল জ্ঞানসম্বন্ধে তদ্রূপ। জগতের পাপ-অত্যাচারের কথা বলিও না। বরং তোমাকে যে জগতে এখনও পাপ দেখিতে হইতেছে, তজ্জন্য রোদন কর। নিজে কাঁদ যে, তোমাকে এখনও সর্ব্বত্র পাপ দেখিতে হইতেছে। আর যদি তুমি জগতের উপকার করিতে চাও, তবে আর জগতের

উপর দোষারোপ করিও না। উহাকে আরও অধিক দুর্ব্বল করিও না। এই সকল পাপ দুঃখ প্রভৃতি আর কি?—এগুলি ত দুর্ব্বলতারই ফল। লোক ছেলেবেলা হইতে শিক্ষা পায় যে, সে দুর্ব্বল ও পাপী। জগৎ এতদ্রূপ শিক্ষা দ্বারা দিন দিন দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর হইয়াছে। তাহাদিগকে শিখাও যে, তাহারা সকলেই সেই অমৃতের সন্তান—এমন কি যাহাদের ভিতরে আত্মার প্রকাশ অতি ক্ষীণ, তাহাদিগকেও উহা শিখাও। বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহা তাহাদিগকে যথার্থ সাহায্য করিবে, যাহা তাহাদিগকে সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের একটা যথার্থ হিত হইবে। দুর্ব্বলতা ও অবসাদকারক চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে। সৎ চিন্তার স্রোতে ঢালিয়া দাও, আপনার মনকে সর্ব্বদা বল—'আমিই সেই, আমিই সেই'; তোমার মনে দিনরাত্রি ইহা সঙ্গীতের মত বাজিতে থাকুক, আর মৃত্যুর সময়েও 'সোঽহং' 'সোঽহং' বলিয়া মর। ইহাই সত্য—জগতের অনন্ত শক্তি তোমার ভিতরে। যে কুসংস্কার তোমার মনকে আবৃত রাখিয়াছে, তাহাকে তাড়াইয়া দাও। সাহসী হও। সত্যকে জানিয়া তাহা জীবনে পরিণত কর। চরম লক্ষ্য অনেক দূর হইতে পারে, কিন্তু 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।'

# মানুষের যথার্থ স্বরূপ

## ( নিউইয়র্কে প্রদত্ত বক্তৃতা )

আমরা এখানে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, কিন্তু আমাদের চক্ষু দূরে, অতি দূরে—অনেক সময় অনেক ক্রোশ দূরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে। মানুষও যতদিন চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে ততদিন এইরূপ করিতেছে। মানুষ সর্ব্বদাই বর্ত্তমানের বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিতেছে, মানুষ জানিতে চাহে—এই শরীর-ধ্বংসের পর সে কোথায় যায়। এই রহস্য-উদ্ভেদের জন্য অনেক মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে, শত শত মত স্থাপিত হইয়াছে, আবার শত শত মত খণ্ডিত হইয়া পরিত্যক্ত হইয়াছে; আর যতদিন মানুষ এই জগতে বাস করিবে, যতদিন সে চিন্তা করিবে, ততদিন এইরূপ চলিবে। এইসকল মতগুলিতেই কিছু না কিছু সত্য আছে। আবার ঐগুলিতে অনেক অসত্যও আছে। এই সম্বন্ধে ভারতে যে-সকল অনুসন্ধান হইয়াছে তাহারই সার, তাহারই ফল আমি আপনাদের নিকট বলিতে চেষ্টা করিব। ভারতীয় দার্শনিকগণের এইসকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় করিতে এবং যদি সম্ভব হয় তাহাদের সহিত আধুনিক বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্ত দর্শনের এক উদ্দেশ্য—একত্বের অনুসন্ধান। হিন্দুগণ বিশেষের প্রতি বড় দৃষ্টি করেন না; তাঁহারা সর্ব্বদাই সামান্যের

—শুধু তাহাই নহে, সর্ব্বব্যাপী সার্ব্বভৌম বস্তুর অন্বেষণ করিয়াছেন। দেখা যায়, তাঁহারা 'এমন কি পদার্থ আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয়ই জানা হয়'—এই সত্যেরই পুনঃপুনঃ অনুসন্ধান করিয়াছেন। যেমন একতাল মৃত্তিকাকে জানিতে পারিলে জগতের সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারা যায়, সেইরূপ এমন কি বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে সমুদয় জগতের জ্ঞানলাভ হইবে? এই তাঁহাদের একমাত্র অনুসন্ধান, এই তাঁহাদের একমাত্র জিজ্ঞাসা। তাঁহাদের মতে সমুদয় জগৎকে বিশ্লেষণ করিয়া একমাত্র 'আকাশ' পদার্থে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে। আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে যাহা কিছু দেখিতে পাই, স্পর্শ করিতে পারি বা আস্বাদ করি, এমন কি, আমরা যাহা কিছু অনুভব করিতে পারি—সবই কেবলমাত্র এই আকাশেরই বিভিন্ন বিকাশমাত্র। এই আকাশ সূক্ষ্ম ও সর্ব্বব্যাপী। কঠিন, তরল, বাষ্পীয় সকল পদার্থ, সর্ব্বপ্রকার আকৃতি, শরীর, পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা—সবই এই আকাশ হইতে উৎপন্ন।

এই আকাশের উপর কোন্ শক্তি কার্য্য করিয়া তাহা হইতে জগৎ সৃজন করিল? আকাশের সঙ্গে একটি সর্ব্বব্যাপী শক্তি রহিয়াছে। জগতের মধ্যে যত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে—আকর্ষণ, বিকর্ষণ, এমন কি, চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত প্রাণ নামক এক মহাশক্তির বিকাশ। এই প্রাণ আকাশের উপর কার্য্য করিয়া এই জগৎপ্রপঞ্চ রচনা করিয়াছে। কল্পপ্রারম্ভে এই প্রাণ যেন অনন্ত আকাশ-সমুদ্রে প্রসুপ্ত থাকে। আদিতে এই আকাশ গতিহীনরূপে অবস্থিত ছিল। পরে প্রাণের প্রভাবে এই আকাশ-সমুদ্রে

গতি উৎপন্ন হয়। আর এই প্রাণের যেমন গতি হইতে থাকে, তেমনই এই আকাশ-সমুদ্র হইতে নানা ব্রহ্মাণ্ড, নানা জগৎ, কত সূর্য্য, কত চন্দ্র, কত তারা, পৃথিবী, মানুষ, জন্তু, উদ্ভিদ্ এবং নানা শক্তি উৎপন্ন হইতে থাকে। অতএব হিন্দুদের মতে সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রাণের এবং সর্ব্বপ্রকার ভূত আকাশের বিভিন্ন রূপমাত্র। কল্পান্তে সমুদয় কঠিন পদার্থ দ্রব হইয়া যাইবে, তখন সেই তরল পদার্থটি বাষ্পীয় আকারে পরিণত হইবে। তাহা আবার তেজরূপ ধারণ করিবে। অবশেষে সমুদয় যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই আকাশে লীন হইবে। আর আকর্ষণ, বিকর্ষণ, গতি প্রভৃতি সমুদয় শক্তি ধীরে ধীরে মূল প্রাণে পরিণত হইবে। তারপর যতদিন না পুনরায় কল্পারম্ভ হয়, ততদিন এই প্রাণ যেন নিদ্রিত অবস্থায় থাকিবে। কল্পারম্ভ হইলে আবার জাগ্রত হইয়া নানাবিধ রূপ প্রকাশ করিবে, আবার কল্পাবসানে সমুদয়ই লয় হইবে। এইরূপে আসিতেছে, যাইতেছে—একবার পশ্চাতে, আবার সম্মুখদিকে যেন দুলিতেছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, একবার স্থিতিশীল, আবার গতিশীল হইতেছে; একবার প্রসুপ্ত, আর একবার ক্রিয়াশীল হইতেছে। এইরূপ অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে।

কিন্তু এই বিশ্লেষণও আংশিক হইল। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানও এই পর্য্যন্ত জানিয়াছে। ইহার উপরে ভৌতিক বিজ্ঞানের অনুসন্ধান আর যাইতে পারে না। কিন্তু এই অনুসন্ধানের এখানেই শেষ হইয়া যায় না। আমরা এখনও এমন জিনিস পাইলাম না, যাহাকে জানিলে সমুদয় জানা হইল। আমরা

সমুদয় জগৎকে ভূত ও শক্তিতে, অথবা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিকদের ভাষায় বলিতে গেলে আকাশ ও প্রাণে পর্য্যবসিত করিয়াছি। এক্ষণে আকাশ ও প্রাণকে আর কিছুতে পর্য্যবসিত করিতে হইবে। উহাদিগকে মন নামক উচ্চতর ক্রিয়াশক্তিতে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে; মহৎ অর্থাৎ সমষ্টি চিন্তাশক্তি হইতে প্রাণ ও আকাশ—উভয়ের উৎপত্তি। চিন্তাশক্তিই এই দুইটি শক্তিরূপে বিভক্ত হইয়া যায়। আদিতে এই সর্ব্বব্যাপী মন ছিলেন। ইনিই পরিণত হইয়া আকাশ ও প্রাণরূপ ধারণ করিলেন, আর এই দুইটির সমবায়ে সমুদয় জগৎ নির্ম্মিত হইয়াছে।

এক্ষণে মনস্তত্ত্ব আলোচনা করা যাউক। আমি তোমাকে দেখিতেছি। চক্ষু দ্বারা বিষয় গৃহীত হইতেছে, উহা অনুভূতিজনক স্নায়ু দ্বারা মস্তিষ্কে প্রেরিত হইতেছে। এই চক্ষু দর্শনের সাধন নহে, উহা বাহিরের যন্ত্রমাত্র; কারণ দর্শনের প্রকৃত সাধন —যাহা মস্তিষ্কে বিষয়-জ্ঞানের সংবাদ বহন করে, তাহা যদি নষ্ট করিয়া দেওয়া যায়, তবে আমার বিশটি চক্ষু থাকিলেও তোমাদের কাহাকেও দেখিতে পাইব না। অক্ষিজালের ( retina ) উপর সম্পূর্ণ ছবি পড়িতে পারে, তথাপি আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। সুতরাং প্রকৃত দর্শনেন্দ্রিয় এই চক্ষু হইতে পৃথক; প্রকৃত চক্ষুরিন্দ্রিয় অবশ্য চক্ষুযন্ত্রের পশ্চাতে অবস্থিত। সকল প্রকার বিষয়ানুভূতি সম্বন্ধেই ইহা বুঝিতে হইবে। নাসিকা ঘ্রাণেন্দ্রিয় নহে; উহা যন্ত্রমাত্র, উহার পশ্চাতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, প্রথমে এই স্থূল শরীরে বাহ্যযন্ত্রগুলি অবস্থিত। তৎপশ্চাতে কিন্তু ঐ স্থূল শরীরেই

ইন্দ্রিয়গণও অবস্থিত। কিন্তু তথাপি পর্য্যাপ্ত হইল না। মনে কর আমি তোমার সহিত কথা কহিতেছি, আর তুমি অতিশয় মনোযোগপূর্ব্বক আমার কথা শুনিতেছ, এমন সময় এখানে একটি ঘণ্টা বাজিল, তুমি হয়ত সেই ঘণ্টাধ্বনি শুনিতে পাইবে না। ঐ শব্দতরঙ্গ তোমার কর্ণে উপনীত হইয়া কর্ণপটহে লাগিল, স্নায়ুর দ্বারা ঐ সংবাদ মস্তিষ্কে পঁহুছিল, কিন্তু তথাপি তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? যদি মস্তিষ্কে সংবাদবহন পর্য্যন্ত সমস্ত শ্রবণ-প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হইয়া থাকে, তবে তুমি শুনিতে পাইলে না কেন? তাহা হইলে দেখা গেল, এই শ্রবণ-প্রক্রিয়ার জন্য আরো কিছুর আবশ্যক —মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত ছিল না। যখন মন ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক থাকে, ইন্দ্রিয় উহাকে যে-কোন সংবাদ আনিয়া দিতে পারে, মন তাহা গ্রহণ করিবে না। যখন মন উহাতে যুক্ত হয়, তখনই কেবল উহার পক্ষে কোন সংবাদগ্রহণ সম্ভব। কিন্তু উহাতেও বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। বাহিরের যন্ত্র সংবাদ বহন করিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে উহা বহন করিতে পারে, মন ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তথাপি বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইবে না। আর একটি জিনিস আবশ্যক। ভিতর হইতে প্রতিক্রিয়া আবশ্যক। প্রতিক্রিয়া হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইবে। বাহিরের বস্তু যেন আমার অন্তরে সংবাদ-প্রবাহ প্রেরণ করিল। আমার মন উহা গ্রহণ করিয়া বুদ্ধির নিকট উহা প্রেরণ করিল, বুদ্ধি পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত মনের সংস্কার অনুসারে উহাকে সাজাইল এবং বাহিরে প্রতিক্রিয়াপ্রবাহ প্রেরণ করিল, ঐ প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়ানুভূতি হইয়া থাকে। মনে যে শক্তি এই প্রতিক্রিয়া প্রেরণ করে,

তাহাকে বুদ্ধি বলে। তথাপি এই বিষয়ানুভূতি সম্পূর্ণ হইল না। মনে কর একটি ক্যামেরা ( camera ) রহিয়াছে, আর একটি বস্ত্রখণ্ড রহিয়াছে। আমি ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর একটি চিত্র ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি। আমি কি করিতেছি? আমি ক্যামেরা হইতে নানাপ্রকার আলোক-কিরণ ঐ বস্ত্রখণ্ডের উপর ফেলিতে এবং ঐ স্থানে একত্রিত করিতে চেষ্টা করিতেছি। একটি অচল বস্তুর আবশ্যক, যাহার উপর চিত্র ফেলা যাইতে পারে। কোন সচল বস্তুর উপর চিত্র ফেলা অসম্ভব—কোন স্থির বস্তুর প্রয়োজন। কারণ আমি যে আলোককিরণগুলি ফেলিবার চেষ্টা করিতেছি, সেগুলি সচল; এই সচল আলোককিরণগুলিকে কোন অচল বস্তুর উপর একত্রীভূত, একীভূত করিয়া মিলিত করিতে হইবে। ইন্দ্রিয়গণ ভিতরে যে-সকল অনুভূতি লইয়া মনের নিকট এবং মন বুদ্ধির নিকট সমর্পণ করিতেছে, তাহাদের সম্বন্ধেও এইরূপ। যতক্ষণ না এমন কোন বস্তু পাওয়া যায়, যাহার উপর এই চিত্র ফেলিতে পারা যায়, যাহাতে এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি একত্রীভূত, মিলিত হইতে পারে, ততক্ষণ এই বিষয়ানুভূতিও সম্পূর্ণ হইতেছে না। কি সে বস্তু, যাহা সমুদয়কে একটি একত্বের ভাব প্রদান করে? কি সে বস্তু, যাহা বিভিন্ন গতির ভিতরেও প্রতি মুহূর্তে একত্ব রক্ষা করিয়া থাকে? কি সে বস্তু, যাহার উপর ভিন্ন ভিন্ন ভাবগুলি যেন একত্র গ্রথিত থাকে, যাহার উপর বিষয়গুলি আসিয়া যেন একত্র বাস করে এবং এক অখণ্ড ভাব ধারণ করে? আমরা দেখিলাম এরূপ কিছু আবশ্যক, আর সেই কিছু শরীর-মনের তুলনায় অচল হওয়া আবশ্যক। যে বস্ত্রখণ্ডের উপর ঐ ক্যামেরা

চিত্রপ্রক্ষেপ করিতেছে, তাহা ঐ আলোককিরণগুলির তুলনায় অচল, তাহা না হইলে কোন চিত্র হইবে না। অর্থাৎ ইহার একটি ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক। এই কিছু, যাহার উপর মন এই সকল চিত্রাঙ্কন করিতেছে—এই কিছু, যাহার উপর মন ও বুদ্ধি দ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের বিষয়ানুভূতিসকল স্থাপিত, শ্রেণীবদ্ধ ও একত্রীভূত হয়, তাহাকেই মানুষের আত্মা বলে।

আমরা দেখিলাম, সমষ্টি-মন বা মহৎ, আকাশ ও প্রাণ এই দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। আর মনের পশ্চাতে আত্মা রহিয়াছেন। সমষ্টি-মনের পশ্চাতে যে আত্মা, তাঁহাকে ঈশ্বর বলে। ব্যষ্টিতে ইহা মানবের আত্মা মাত্র। যেমন জগতে সমষ্টি-মন আকাশ ও প্রাণরূপে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ সমষ্টি-আত্মাও মনরূপে পরিণত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—ব্যষ্টি-মানব সম্বন্ধেও কি তদ্রূপ? মানুষেরও মন কি তাঁহার শরীরের স্রষ্টা, আর তাঁহার আত্মা তাঁহার মনের স্রষ্টা—অর্থাৎ মানুষের শরীর, মন ও আত্মা—তিনটি বিভিন্ন বস্তু, অথবা ইহারা একের ভিতরেই তিন, অথবা ইহারা এক পদার্থেরই বিভিন্ন অবস্থামাত্র? আমরা ক্রমশঃ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব। যাহা হউক, আমরা এতক্ষণে এই পাইলাম—প্রথমতঃ এই স্থূলদেহ, তৎপশ্চাতে ইন্দ্রিয়গণ, মন, বুদ্ধি এবং বুদ্ধিরও পশ্চাতে আত্মা। প্রথম যেন আমরা পাইলাম, আত্মা শরীর হইতে পৃথক, মন হইতেও পৃথক। এই স্থান হইতেই ধর্ম্মজগতের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। দ্বৈতবাদী বলেন—আত্মা সগুণ অর্থাৎ ভোগ, সুখ, দুঃখ সবই যথার্থতঃ আত্মার ধর্ম্ম; অদ্বৈতবাদী বলেন—ইহা নির্গুণ।

আমরা প্রথমে দ্বৈতবাদীদের মত—আত্মা ও উহার গতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মত বর্ণনা করিয়া, তাহার পর যে মত উহা সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করে, তাহা বর্ণনা করিব। অবশেষে অদ্বৈতবাদের দ্বারা উভয় মতের সামঞ্জস্যসাধন করিতে চেষ্টা কবিব। এই মানবাত্মা শরীর-মন হইতে পৃথক বলিয়া এবং আকাশপ্রাণে গঠিত নয় বলিয়া অমর। কেন? মরত্বের বা বিনশ্বরত্বের অর্থ কি? যাহা বিশ্লিষ্ট হইয়া যায় তাহাই বিনশ্বর। আর যে দ্রব্য কতকগুলি পদার্থের সংযোগলব্ধ, তাহাই বিশ্লিষ্ট হইবে। কেবল যে পদার্থ অপর পদার্থের সংযোগোৎপন্ন নয় তাহা কখন বিশ্লিষ্ট হয় না, সুতরাং তাহার বিনাশ কখন হইতে পারে না, তাহা অবিনাশী। তাহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, তাহার কখনও সৃষ্টি হয় নাই। সৃষ্টি কেবল সংযোগমাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি কেহ কখন দেখে নাই। সৃষ্টি সম্বন্ধে আমরা কেবল এইমাত্র জানি যে, উহা পূর্ব্ব হইতে অবস্থিত কতকগুলি বস্তুর নূতন নূতন রূপে একত্র মিলনমাত্র। তাহা যদি হইল, তবে এই মানবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগোৎপন্ন নয় বলিয়া অবশ্য অনন্তকাল ধরিয়া ছিল এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। এই শরীর-পাত হইলেও আত্মা থাকিবেন। বেদান্তবাদীদের মতে—যখন এই শরীর-পতন হয়, তখন মানবের ইন্দ্রিয়গণ মনে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়, প্রাণ আত্মায় প্রবেশ করে, আর তখন সেই মানবাত্মা যেন সূক্ষ্মশরীর বা লিঙ্গশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া যান। এই সূক্ষ্মশরীরেই মানুষের সমুদয় সংস্কার বাস করে। সংস্কার কি? মন যেন হ্রদের তুল্য, আর আমাদের প্রত্যেক চিন্তা যেন সেই হ্রদে তরঙ্গতুল্য। যেমন হ্রদে তরঙ্গ উঠে, আবার পড়ে, পড়িয়া অন্তর্হিত

হইয়া যায়, সেইরূপ মনে এই চিন্তাতরঙ্গগুলি ক্রমাগত উঠিতেছে, আবার অন্তর্হিত হইতেছে। কিন্তু উহারা একেবারে অন্তর্হিত হয় না। উহারা ক্রমশঃ সূক্ষ্মতর হইয়া যায়, কিন্তু বর্ত্তমান থাকে। প্রয়োজন হইলে আবার উদিত হয়। যে চিন্তাগুলি সূক্ষ্মতর রূপ ধারণ করিয়াছে, তাহারই কতকগুলিকে আবার তরঙ্গাকারে আনয়ন করাকেই স্মৃতি বলে। এইরূপে আমরা যাহা কিছু চিন্তা করিয়াছি, যে কোন কার্য্য আমরা করিয়াছি, সবই মনের মধ্যে অবস্থিত আছে। সবগুলিই সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে এবং মানুষ মরিলেও এই সংস্কারগুলি তাহার মনে বর্ত্তমান থাকে—উহারা আবার সূক্ষ্মশরীরের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। আত্মা এই সকল সংস্কার এবং সূক্ষ্মশরীররূপ বসন পরিধান করিয়া চলিয়া যান এবং এই বিভিন্নসংস্কাররূপ বিভিন্ন শক্তির সমবেত ফলই আত্মার গতি নিয়মিত করে। তাঁহাদের মতে আত্মার ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে।

যাঁহারা অত্যন্ত ধার্ম্মিক, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা সূর্য্যরশ্মির অনুসরণ করেন; সূর্য্যরশ্মি অনুসরণ করিয়া তাঁহারা সূর্য্যলোকে উপনীত হন, তথা হইতে চন্দ্রলোক এবং চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে উপস্থিত হন; তথায় তাঁহাদের সহিত আর একজন মুক্তাত্মার সাক্ষাৎ হয়; তিনি ঐ জীবাত্মাগণকে সর্ব্বোচ্চ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। এইস্থানে তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করেন; তাঁহাদের শক্তি ও জ্ঞান প্রায় ঈশ্বরের তুল্য হয়; আর দ্বৈতবাদীদের মতে—তাঁহারা তথায় অনন্তকাল বাস করেন, অথবা অদ্বৈতবাদীদের মতে—কল্পাবসানে ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভ করেন। যাঁহারা সকামভাবে সৎকার্য্য করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর

চন্দ্রলোকে গমন করেন। এখানে নানাবিধ স্বর্গ আছে। তাঁহারা এখানে সূক্ষ্মশরীরে—দেবশরীর লাভ করেন। তাঁহারা দেবতা হইয়া এখানে বাস করেন ও দীর্ঘকাল ধরিয়া স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। এই ভোগের অবসানে আবার তাঁহাদের প্রাচীন কর্ম্ম বলবান হয়, সুতরাং পুনরায় তাঁহাদের মর্ত্ত্যলোকে পতন হয়। তাঁহারা বায়ুলোক, মেঘলোক প্রভৃতি লোকের ভিতর দিয়া আসিয়া অবশেষে বৃষ্টিধারার সহিত পৃথিবীতে পতিত হন। বৃষ্টির সহিত পতিত হইয়া তাঁহারা কোন শস্যকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তৎপরে সেই শস্য কোন ব্যক্তি ভোজন করিলে, তাহার ঔরসে সে জীবাত্মা পুনরায় কলেবর পরিগ্রহ করে। যাহারা অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা ভূত বা দানব হয় এবং চন্দ্রলোক ও পৃথিবীর মাঝামাঝি কোন স্থানে বাস করে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ মনুষ্যগণের উপর নানাবিধ অত্যাচার করিয়া থাকে, কেহ কেহ আবার মনুষ্যগণের প্রতি মিত্রভাবাপন্ন হয়। তাহারা কিছুকাল ঐস্থানে থাকিয়া পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া পশুজন্ম গ্রহণ করে। কিছুদিন পশুদেহে নিবাস করিয়া তাহারা আবার মানুষ হয়—আর একবার মুক্তিলাভ করিবার উপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয়। তাহা হইলে আমরা দেখিলাম, যাঁহারা মুক্তির নিকটতম সোপানে পঁহুছিয়াছেন, যাঁহাদের ভিতরে খুব অল্পপরিমাণে অপবিত্রতা অবশিষ্ট আছে, তাঁহারাই সূর্য্যকিরণ ধরিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যাঁহারা মাঝারি রকমের লোক, যাঁহারা স্বর্গে যাইবার কামনা রাখিয়া কিছু সৎকার্য্য করেন, চন্দ্রলোকে গমন করিয়া সেইসকল ব্যক্তি সেইস্থানস্থ স্বর্গে বাস করেন, তথায় তাঁহারা দেবদেহ প্রাপ্ত

হন, কিন্তু তাঁহাদিগকে মুক্তিলাভ করিবার জন্য আবার মনুষ্যদেহ ধারণ করিতে হয়। আর যাহারা অত্যন্ত অসৎ, তাহারা ভূত, দানব প্রভৃতি রূপে পরিণত হয়, তাহার পর তাহারা পশু হয়; তৎপরে মুক্তিলাভের জন্য তাহাদিগকে আবার মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিতে হয়। এই পৃথিবীকে কর্ম্মভূমি বলে। ভাল-মন্দ কর্ম্ম সবই এখানে করিতে হয়। মানুষ স্বর্গকাম হইয়া সৎকার্য্য করিলে তিনি স্বর্গে গিয়া দেবতা হন। এই অবস্থায় তিনি আর নূতন কর্ম্ম করেন না, কেবল পৃথিবীতে তাঁহাকর্ত্তৃক কৃত সৎকর্ম্মের ফলভোগ করেন। আর এই সৎকর্ম্ম যেই শেষ হইয়া যায় অমনি তিনি জীবনে যেসকল অসৎ কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাহার সমবেত ফল তাঁহাব উপর বেগে আসে, তাহাতে তাঁহাকে পুনর্ব্বার এই পৃথিবীতে টানিয়া আনে। এইরূপে যাহারা ভূত হয়, তাহারা সেই অবস্থায় কোনরূপ নূতন কর্ম্ম না করিয়াই কেবল ভূতকর্ম্মের ফলভোগ করে, তাহার পর পশুজন্ম গ্রহণ করিয়া তথায়ও কোন নূতন কর্ম্ম করে না, তাহার পর তাহারা আবার মানুষ হয়।

মনে কর কোন ব্যক্তি সারা জীবন অনেক মন্দ কাজ করিল, কিন্তু একটি খুব ভাল কাজও করিল, তাহা হইলে সেই সৎকার্য্যের ফল তৎক্ষণাৎ প্রকাশ পাইবে, আর ঐ কার্য্যের ফল শেষ হইয়া যাইবামাত্রই অসৎ কর্ম্মগুলিও তাহাদের ফল প্রদান করিবে। যে-সব লোক কতকগুলি ভাল ভাল বড় বড় কাজ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের সারা জীবনের গতিটা ভাল নহে, তাহারা দেবতা হইবে। দেবদেহসম্পন্ন হইয়া দেবতাদের শক্তি কিছুকাল সম্ভোগ করিয়া আবার তাহাদিগকে মানুষ হইতে হইবে। যখন সৎকর্ম্মের শক্তি

ক্ষয় হইয়া যাইবে, তখন আবার সেই পুরাতন অসৎকার্যাগুলির ফল হইতে থাকিবে। যাহারা অতিশয় অসৎকর্ম্ম করে তাহাদিগকে ভূতযোনি, দানবযোনি গ্রহণ করিতে হইবে, আর যখন ঐ অসৎকার্য্যগুলির ফল শেষ হইয়া যায়, তখন যে সৎকর্ম্মটুকু অবশিষ্ট থাকে তাহাতে তাহাদিগকে আবার মানুষ করিবে। যে পথে ব্রহ্মলোকে যাওয়া যায়, যথা হইতে পতন বা প্রত্যাবর্ত্তনের সম্ভাবনা নাই, তাহাকে দেবযান বলে আর চন্দ্রলোকের পথকে পিতৃযান বলে।

অতএব বেদান্তদর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর এই পৃথিবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এইখানেই মুক্ত হইবার একমাত্র সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানবজন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানবজন্মই মুক্তির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।

এক্ষণে এই মতের বিরোধী মতের আলোচনা করা যাউক। বৌদ্ধগণ এই আত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করেন। বৌদ্ধগণ বলেন, এই শরীর-মনের পশ্চাতে আত্মা বলিয়া একটি পদার্থ আছে—মানিবার আবশ্যকতা কি? ইহা মানিবার আবশ্যকতা কি? এই শরীর ও মনোরূপ যন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ বলিলেই কি যথেষ্ট ব্যাখ্যা হইল না? আবার একটি তৃতীয় পদার্থ কল্পনার প্রয়োজন কি? এই যুক্তিগুলি খুব প্রবল। যতদূর পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলে ততদূর বোধ হয়, এই শরীর ও মনোযন্ত্র স্বতঃসিদ্ধ, অন্ততঃ আমরা অনেকে এই তত্ত্বটি এই ভাবেই দেখিয়া থাকি। তবে শরীর ও মনের অতিরিক্ত, অথচ শরীর-মনের আশ্রয়ভূমিস্বরূপ আত্মা নামক একটি পদার্থের অস্তিত্ব-কল্পনায় আবশ্যকতা কি? শুধু শরীর-মন বলিলেই ত যথেষ্ট

হয়; নিয়ত পরিণামশীল জড়স্রোতের নাম শরীর, আর নিয়ত-পরিণামশীল চিন্তাস্রোতের নাম মন। তবে এই যে একত্বের প্রতীতি হইতেছে, তাহা কিসে? বৌদ্ধ বলেন—এই একত্ব বাস্তবিক নাই। একটি জ্বলন্ত মশাল লইয়া ঘুরাইতে থাক, ঘুরাইলে একটি অগ্নির বৃত্তস্বরূপ হইবে। বাস্তবিক কোন বৃত্ত হয় নাই, কিন্তু মশালের নিয়ত ঘূর্ণনে উহা ঐ বৃত্তের আকার ধারণ করিয়াছে। এইরূপ আমাদের জীবনেও একত্ব নাই; জড়ের রাশি ক্রমাগত চলিয়াছে। সমুদয় জড়রাশিকে এক বলিতে ইচ্ছা হয় বল, কিন্তু তদতিরিক্ত বাস্তবিক কোন একত্ব নাই। মনের সম্বন্ধেও তদ্রূপ; প্রত্যেক চিন্তা অপর চিন্তা হইতে পৃথক। এই প্রবল চিন্তাস্রোতেই এই ভ্রমাত্মক একত্বের ভাব রাখিয়া যাইতেছে; সুতরাং তৃতীয় পদার্থের আর আবশ্যকতা কি? এই যাহা কিছু দেখা যাইতেছে, এই জড়স্রোত ও এই চিন্তাস্রোত—কেবল ইহাদেরই অস্তিত্ব আছে; ইহাদের পশ্চাতে আর কিছু ভাবিবার আবশ্যকতা কি? আধুনিক অনেক সম্প্রদায় বৌদ্ধদের এই মত গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা সকলেই এই মতকে তাঁহাদের নিজ আবিষ্কার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে ইচ্ছা করেন। অধিকাংশ বৌদ্ধদর্শনেরই মোট কথাটা এই যে, এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পর্য্যাপ্ত; ইহার পশ্চাতে আর কিছু আছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎই সর্ব্বস্ব—কোন বস্তুকে এই জগতের আশ্রয়রূপে কল্পনা করিবার আবশ্যক কি? সমুদয়ই গুণসমষ্টি। এমন আনুমানিক পদার্থ কল্পনা করিবার কি আবশ্যকতা আছে, যাহাতে সেগুলি লাগিয়া থাকিবে?

পদার্থের জ্ঞান আসে কেবল গুণরাশির বেগে স্থানপরিবর্তনবশতঃ, কোন অপরিণামী পদার্থ বাস্তবিক উহাদের পশ্চাতে আছে বলিয়া নয়। আমরা দেখিলাম এই যুক্তিগুলি অতি প্রবল, আর উহা সাধারণ মানবের অনুভূতির স্বপক্ষে খুব সাক্ষ্য দিয়া থাকে। বাস্তবিকও লক্ষে একজনও এই দৃশ্যজগতের অতীত কিছুর ধারণা করিতে পারে কি না, সন্দেহ। অধিকাংশ লোকের পক্ষে প্রকৃতি নিত্যপরিণামশীল মাত্র। আমাদের মধ্যে খুব অল্প লোকই আমাদের পশ্চাদ্দেশস্থ সেই স্থির সমুদ্রের অত্যল্প আভাসও পাইয়াছেন। আমাদের পক্ষে এই জগৎ কেবল তরঙ্গপূর্ণ মাত্র। তাহা হইলে আমরা দুইটি মত পাইলাম। একটি এই—এই শরীর মনের পশ্চাতে এক অপরিণামী সত্তা রহিয়াছে; আর একটি মত এই—এই জগতে নিশ্চলত্ব বলিয়া কিছুই নাই, সবই চঞ্চল, সবই কেবল পরিণাম। যাহা হউক, অদ্বৈতবাদেই এই দুই মতের সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

অদ্বৈতবাদী বলেন, 'জগতের একটি অপরিণামী আশ্রয় আছে—দ্বৈতবাদীর এই বাক্য সত্য; অপরিণামী কোন পদার্থ কল্পনা না করিলে, আমরা পরিণামই কল্পনা করিতে পারি না। কোন অপেক্ষাকৃত অল্পপরিণামী পদার্থের তুলনায় কোন পদার্থকে পরিণামিরূপে চিন্তা করা যাইতে পারে, আবার তাহা অপেক্ষাও অল্পপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় উহাকে আবার পরিণামিরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারে, যতক্ষণ না একটি পূর্ণ অপরিণামী পদার্থ বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। এই জগৎপ্রপঞ্চ অবশ্য এমন এক অবস্থায় ছিল, যখন উহা স্থির শান্ত ছিল, যখন উহা শক্তিদ্বয়ের সামঞ্জস্যস্বরূপ ছিল, অর্থাৎ যখন প্রকৃতপক্ষে কোন

শক্তিরই অস্তিত্ব ছিল না; কারণ বৈষম্য না হইলে শক্তির বিকাশ হয় না। এই ব্রহ্মাণ্ড আবার সেই সাম্যাবস্থা-প্রাপ্তিব জন্য চলিয়াছে। যদি আমাদের কোন বিষয় সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান থাকে, তাহা এই। দ্বৈতবাদীরা যখন বলেন কোন অপরিণামী পদার্থ আছে, তখন তাঁহারা ঠিকই বলেন কিন্তু উহা যে শরীর-মনের সম্পূর্ণ অতীত, শরীর-মন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক, এ কথা বলা ভুল। বৌদ্ধেরা যে বলেন সমুদয় জগৎ কেবল পরিণামপ্রবাহ-মাত্র—এ কথাও সত্য; কারণ যতদিন আমি জগৎ হইতে পৃথক, যতদিন আমি আমার অতিরিক্ত আর কিছুকে দেখি, মোট কথা যতদিন দ্বৈতভাব থাকে, ততদিন এই জগৎ পরিণামশীল বলিয়াই প্রতীত হইবে। কিন্তু প্রকৃত কথা—এই জগৎ পরিণামীও বটে, আবার অপরিণামীও বটে। আত্মা, মন ও শরীর—তিনটি পৃথক বস্তু নহে, উহারা একই। একই বস্তু কখন দেহ, কখন মন, কখন বা দেহমনের অতীত আত্মা বলিয়া প্রতীত হয়। যিনি শরীরের দিকে দেখেন, তিনি মন পর্য্যন্ত দেখিতে পান না; যিনি মন দেখেন, তিনি আত্মা দেখিতে পান না; আর যিনি আত্মা দেখেন, তাঁহার পক্ষে শরীর ও মন উভয়েই কোথায় চলিয়া যায়! যিনি কেবল গতি দেখেন, তিনি সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখিতে পান না; আর যিনি সেই সম্পূর্ণ স্থিরভাব দেখেন, তাঁহার পক্ষে গতি কোথায় চলিয়া যায়! সর্পে রজ্জুভ্রম হইল। যে ব্যক্তি রজ্জুতে সর্প দেখিতেছে, তাহার পক্ষে রজ্জু কোথায় চলিয়া যায়, আর যখন ভ্রান্তি দূর হইয়া সে ব্যক্তি রজ্জুই দেখিতে থাকে, তাহার পক্ষে সর্প আর থাকে না।

তাহা হইলে দেখা গেল, একটিমাত্র বস্তুই আছে—তাহাই নানারূপে প্রতীত হইতেছে। ইহাকে আত্মাই বল, আর বস্তুই বল বা অন্য কিছুই বল, জগতে কেবল একমাত্র ইহারই অস্তিত্ব আছে। অদ্বৈতবাদের ভাষায় বলিতে গেলে এই আত্মাই ব্রহ্ম, কেবল নামরূপ-উপাধিবশতঃ বহু প্রতীত হইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গগুলির দিকে দৃষ্টিপাত কর; একটি তরঙ্গও সমুদ্র হইতে পৃথক নহে। তবে তরঙ্গকে পৃথক দেখাইতেছে কেন? নামরূপ—তরঙ্গের আকৃতি, আর আমরা উহাকে 'তরঙ্গ' এই যে নাম প্রদান করিয়াছি, তাহাতেই উহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে। নামরূপ চলিয়া গেলেই, উহা যে সমুদ্র ছিল সেই সমুদ্রই রহিয়া যায়। তরঙ্গ ও সমুদ্রের মধ্যে কে প্রভেদ করিতে পারে? অতএব এই সমুদয় জগৎ একস্বরূপ হইল। নামরূপই যত পার্থক্য রচনা করিয়াছে। যেমন সূর্য লক্ষ লক্ষ জলকণার উপরে প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যেক জলকণার উপরেই সূর্যের একটি পূর্ণ প্রতিকৃতি সৃষ্টি করে, তদ্রূপ সেই এক আত্মা, সেই এক সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে প্রতিবিম্বিত হইয়া নানারূপে উপলব্ধ হইতেছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা এক। বাস্তবিক 'আমি' বা 'তুমি' বলিয়া কিছুই নাই—সবই এক। হয় বল—সবই আমি, না হয় বল—সবই তুমি। এই দ্বৈতজ্ঞান সম্পূর্ণ মিথ্যা, আর সমুদয় জগৎ এই দ্বৈতজ্ঞানের ফল। যখন বিবেকের উদয়ে মানুষ দেখিতে পায় দুইটি বস্তু নাই, একটি বস্তু আছে, তখন তাহার উপলব্ধি হয়—তিনিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ হইয়াছেন। আমি এই পরিবর্তনশীল জগৎ, আমিই আবার অপরিণামী, নির্গুণ, নিত্যপূর্ণ, নিত্যানন্দময়।

অতএব নিত্যশুদ্ধ, নিত্যপূর্ণ অপরিণামী, অপরিবর্ত্তনীয় এক আত্মা আছেন; তাঁহার কখন পরিণাম হয় নাই, আর এইসকল বিভিন্ন পরিণাম সেই একমাত্র আত্মাতেই প্রতীত হইতেছে মাত্র। উহার উপরে নামরূপ এইসকল বিভিন্ন স্বপ্নচিত্র অঙ্কিত করিয়াছে। আকৃতিই তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে পৃথক করিয়াছে। মনে কর, তরঙ্গটি মিলাইয়া গেল, তখন কি ঐ আকৃতি থাকিবে? না, উহা একেবারে চলিয়া যাইবে। তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে সাগরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে; কিন্তু সাগরের অস্তিত্ব তরঙ্গের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে না। যতক্ষণ তরঙ্গ থাকে, ততক্ষণ রূপ থাকে, কিন্তু তরঙ্গ নিবৃত্ত হইলে ঐ রূপ আর থাকিতে পারে না। এই নাম-রূপকেই মায়া বলে। এই মায়াই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি সৃজন করিয়া একজনকে আর একজন হইতে পৃথক বোধ করাইতেছে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব নাই। মায়ার অস্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না। 'রূপে'র বা আকৃতির অস্তিত্ব আছে বলা যাইতে পারে না। কারণ উহা অপরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে। আবার উহা নাই, তাহাও বলা যাইতে পারে না; কারণ উহাই এইসকল ভেদ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদীর মতে এই মায়া বা অজ্ঞান বা নামরূপ অথবা ইউরোপীয়গণের মতে দেশকালনিমিত্ত, এই এক অনন্ত সত্তা হইতে এই বিভিন্নরূপ জগৎ-সত্তা দেখাইতেছে; পরমার্থতঃ এই জগৎ এক অখণ্ড-স্বরূপ। যতদিন পর্য্যন্ত কেহ দুইটি বস্তুর কল্পনা করেন, ততদিন তিনি ভ্রান্ত। যখন তিনি জানিতে পারেন একমাত্র সত্তা আছে, তখনই তিনি যথার্থ জানিয়াছেন। যতই দিন যাইতেছে, ততই আমাদের নিকট

এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। কি জড়জগতে, কি মনোজগতে কি অধ্যাত্মজগতে, সর্ব্বত্রই এই সত্য প্রমাণিত হইতেছে। এখন প্রমাণিত হইয়াছে যে তুমি, আমি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা—এ সবই এক জড়সমুদ্রের বিভিন্ন অংশের নামমাত্র। এই জড়রাশি ক্রমাগত পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে। যে শক্তিকণা কয়েক মাস পূর্ব্বে সূর্য্যে ছিল তাহা আজ হয়ত মনুষ্যের ভিতর আসিয়াছে, কাল হয়ত উহার পশুর ভিতরে, আবার পরশ্ব হয়ত কোন উদ্ভিদে প্রবেশ করিবে। সর্ব্বদাই আসিতেছে, যাইতেছে। উহা একমাত্র অখণ্ড জড়রাশি—কেবল নামরূপে পৃথক। উহার এক বিন্দুর নাম সূর্য্য, এক বিন্দুর নাম চন্দ্র, এক বিন্দু তারা, এক বিন্দু মানুষ, এক বিন্দু পশু, এক বিন্দু উদ্ভিদ, এইরূপ। আর এই যে বিভিন্ন নাম, ইহা ভ্রমাত্মক; কারণ এই জড়রাশির ক্রমাগত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই জগৎকেই আর এক ভাবে দেখিলে চিন্তাসমুদ্র-রূপে প্রতীয়মান হইবে, উহার এক একটি বিন্দু এক একটি মন; তুমি একটি মন, আমি একটি মন, প্রত্যেকেই এক একটি মনমাত্র। আবার এই জগৎকে জ্ঞানের দৃষ্টি হইতে দেখিলে, অর্থাৎ যখন চক্ষু হইতে মোহাবরণ অপসারিত হইয়া যায়, যখন মন শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন উহাকেই নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী, অবিনাশী, অখণ্ড পূর্ণস্বরূপ পুরুষ বলিয়া প্রতীতি হইবে। তবে দ্বৈতবাদীর পরলোকবাদ—মানুষ মরিলে স্বর্গে যায়, অথবা অমুক অমুক লোকে যায়, অসৎলোকে ভূত হয়, পরে পশু হয়—এসব কথার কি হইল? অদ্বৈতবাদী বলেন—কেহ আসেও না, কেহ যায়ও না—তোমার পক্ষে যাওয়া-আসা কিসে

? তুমি অনন্তস্বরূপ, তোমার পক্ষে যাইবার স্থান আর কোথায় ?

কোন বিদ্যালয়ে কতকগুলি ছোট বালক-বালিকার পরীক্ষা হইতেছিল। পরীক্ষক ঐ ছোট ছেলেগুলিকে নানারূপ কঠিন প্রশ্ন করিতেছিলেন। অন্যায় প্রশ্নের মধ্যে তাঁহার এই প্রশ্নও ছিল—পৃথিবী পড়িয়া যায় না কেন ? অনেকেই প্রশ্নটি বুঝিতে পারে নাই, সুতরাং যাহার যাহা মনে আসিতে লাগিল, সে সেইরূপ উত্তর দিতে লাগিল। একটি বুদ্ধিমতী বালিকা আর একটি প্রশ্ন করিয়া ঐ প্রশ্নটির উত্তর করিল—"কোথায় উহা পড়িবে ?" ঐ প্রশ্নটিই ত ভুল। জগতে উঁচু-নীচু বলিয়া ত কিছুই নাই। উঁচু-নীচু আপেক্ষিক জ্ঞানমাত্র। আত্মা সম্বন্ধেও তদ্রূপ। জন্ম-মৃত্যু সম্বন্ধে প্রশ্নই ভুল। কে যায়, কে আসে ? তুমি কোথায় নাই ? এমন স্বর্গ কোথায় আছে, যেথানে তুমি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত নহ ? মানুষের আত্মা সর্ব্বব্যাপী। তুমি কোথায় যাইবে ? কোথায় যাইবে না ? আত্মা ত সর্ব্বত্র। সুতরাই সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই বালসুলভ স্বপ্ন, এই জন্মমৃত্যুরূপ বালসুলভ ভ্রম, স্বর্গ নরক প্রভৃতি স্বপ্ন—সবই একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়, যাহাদের ভিতর কিঞ্চিৎ অজ্ঞান অবশিষ্ট আছে, তাহাদের পক্ষে উহা ব্রহ্মলোকান্ত নানাবিধ দৃশ্য দেখাইয়া অন্তর্হিত হয়; অজ্ঞানীর পক্ষে উহা থাকিয়া যায়।

সমুদয় জগৎ স্বর্গে যাইবে, মরিবে, জন্মিবে—এ কথা বিশ্বাস করে কেন ? আমি একখানি গ্রন্থ পাঠ করিতেছি, উহার পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পঠিত হইতেছে এবং উল্টান হইতেছে ! আর এক পৃষ্ঠা আসিল ;

উহাও উল্টান হইল। পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছে কে? কে যায়-আসে? আমি নহি—ঐ পুস্তকেরই পাতা উল্টান হইতেছে। সমুদয় প্রকৃতিই আত্মার সম্মুখস্থ একখানি পুস্তকস্বরূপ। উহার অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়া হইয়া যাইতেছে ও উল্টান হইতেছে, নূতন দৃশ্য সম্মুখে আসিতেছে। উহাও পড়া হইয়া গেল ও উল্টান হইল। আবার নূতন অধ্যায় আসিল; কিন্তু আত্মা যেমন, তেমনই—অনন্তস্বরূপ। প্রকৃতিই পরিণামপ্রাপ্ত হইতেছেন, আত্মা নহেন। উহার কখন পরিণাম হয় না। জন্মমৃত্যু প্রকৃতিতে, তোমাতে নহে। তথাপি অজ্ঞেরা ভ্রান্ত হইয়া মনে করে—আমরা জন্মাইতেছি, মরিতেছি, প্রকৃতি নহে; যেমন আমরা ভ্রান্তিবশতঃ মনে করি—সূর্য্যই চলিতেছে, পৃথিবী নহে। সুতরাং এসকল ভ্রান্তিমাত্র, যেমন আমরা ভ্রমবশতঃ রেলগাড়ীর পরিবর্ত্তে মাঠকে সচল বলিয়া মনে করি। জন্ম-মৃত্যু-ভ্রান্তি ঠিক এইরূপ। যখন মানুষ কোন বিশেষরূপভাবে থাকে, তখন সে ইহাকেই পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতি বলিয়া দেখে; আর যাহারা ঐরূপ মনোভাব-সম্পন্ন, তাহারাও ঠিক তাহাই দেখে! তোমার আমার মধ্যে লক্ষ লক্ষ লোক থাকিতে পারে যাহারা বিভিন্নপ্রকৃতিসম্পন্ন। তাহারাও আমাদিগকে কখন দেখিবে না, আমরাও তাহাদিগকে কখন দেখিতে পাইব না। আমরা একরূপ চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন প্রাণীকেই দেখিতে পাই। যে যন্ত্রগুলি একপ্রকার কম্পনবিশিষ্ট সেইগুলির মধ্যে একটি বাজিলেই অপরগুলি বাজিয়া উঠিবে। মনে কর, আমরা এক্ষণে যেরূপ প্রাণকম্পনসম্পন্ন, উহাকে আমরা 'মানব-কম্পন' নাম প্রদান করিতে পারি; যদি উহা পরিবর্ত্তিত হইয়া

যায়, তবে আর মনুষ্য দেখা যাইবে না, উহার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ দৃশ্য আমাদের সমক্ষে আসিবে—হয়ত দেবতা ও দেবজগৎ কিংবা অসৎ লোকের পক্ষে দানব ও দানবজগৎ; কিন্তু ঐ সবগুলিই এই এক জগতেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এই জগৎ মানবদৃষ্টিতে পৃথিবী, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা প্রভৃতিরূপে, আবার দানবের দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাই নরক বা শাস্তিস্থানরূপে প্রতীত হইবে, আবার যাহারা স্বর্গে যাইতে চাহে, তাহারা এই স্থানকে স্বর্গ বলিয়া দেখিবে। যাহারা সারা জীবন ভাবিতেছে, আমরা স্বর্গসিংহাসনারূঢ় ঈশ্বরের নিকট গিয়া সারা জীবন তাঁহার উপাসনা করিব, তাহাদের মৃত্যু হইলে তাহারা তাহাদের চিত্তস্থ ঐ বিষয়ই দেখিবে। এই জগৎই তাহাদের চক্ষে একটি বৃহৎ স্বর্গে পরিণত হইয়া যাইবে; তাহারা দেখিবে—নানাপ্রকার অপ্সরকিন্নর উড়িয়া বেড়াইতেছে, আর দেবতারা সিংহাসনে উপবিষ্ট আছেন। স্বর্গাদি সমুদয়ই মানুষের কৃত। অতএব অদ্বৈতবাদী বলেন—দ্বৈতবাদীর কথা সত্য বটে, কিন্তু ঐ সকল তাহার নিজেরই রচিত। এইসব লোক, এই সব দৈত্য, পুনর্জন্ম প্রভৃতি সবই রূপক, মানবজীবনও তাহাই। ঐগুলি কেবল রূপক, আর মানবজীবন সত্য—ইহা হইতে পারে না। মানুষ সর্ব্বদাই এই ভুল করিতেছে। অন্যান্য জিনিস—যথা স্বর্গ, নরক প্রভৃতিকে রূপক বলিলে তাহারা বেশ বুঝিতে পারে, কিন্তু তাহারা নিজেদের অস্তিত্বকে রূপক বলিয়া কোনমতে স্বীকার করিতে চায় না। এই আপাত-প্রতীয়মান সমুদয়ই রূপকমাত্র আর আমার শরীর—এই জ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যা—আমরা কখনই শরীর নহি, উহা হইতেও পারি না। আমরা কেবল মানুষ—ইহাই

ভয়ানক মিথ্যা কথা। আমরাই জগতের ঈশ্বর। ঈশ্বরের উপাসনা করিতে গিয়া আমরা নিজেদের অব্যক্ত আত্মারই উপাসনা করিয়া আসিতেছি। তুমি জন্ম হইতে পাপী ও অসৎ পুরুষ—এইটি ভাবাই সর্ব্বাপেক্ষা মিথ্যা কথা। যিনি নিজে পাপী, তিনি কেবল অপরকে পাপী দেখিয়া থাকেন। মনে কর, এখানে একটি শিশু রহিয়াছে, আর তুমি টেবিলের উপর এক মোহরের থলি রাখিলে। মনে কর, একজন দস্যু আসিয়া ঐ মোহর লইয়া গেল। শিশুর পক্ষে ঐ মোহরের থলির অবস্থান ও অন্তর্দ্ধান—উভয়ই সমান; তাহার ভিতরে চোর নাই, সুতরাং সে বাহিরেও চোর দেখে না। পাপী ও অসৎ লোকই বাহিরে পাপ দেখিতে পায়, কিন্তু সাধু লোকের পক্ষে তাহা বোধ হয় না। অত্যন্ত অসাধু পুরুষেরা এই জগৎকে নরকস্বরূপে দেখে; যাহারা মাঝামাঝি লোক, তাহারা ইহাকে স্বর্গস্বরূপে দেখে; আর যাঁহারা পূর্ণ সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা ইহাকে সাক্ষাৎ ভগবানস্বরূপে দর্শন করেন, তখনই কেবল তাঁহার চক্ষু হইতে আবরণ চলিয়া যায়, আর তখন সেই ব্যক্তি পবিত্র ও শুদ্ধ হইয়া দেখিতে পান, তাঁহার দৃষ্টি একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। যে-সকল দুঃস্বপ্ন তাঁহাকে লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া উৎপীড়ন করিতেছিল তাহা একেবারে চলিয়া যায়, আর যিনি আপনাকে এতদিন মানুষ, দেবতা, দানব প্রভৃতি বলিয়া মনে করিতেছিলেন, যিনি আপনাকে কখন উর্দ্ধে, কখন অধোতে, কখন পৃথিবীতে, কখন স্বর্গে, কখন বা অন্য স্থানে অবস্থিত বলিয়া ভাবিতেছিলেন, তিনি দেখিতে পান—তিনি বাস্তবিক সর্ব্বব্যাপী, তিনি কালের অধীন নহেন, কাল তাঁহার অধীন,

সমুদয় স্বর্গ তাঁহার ভিতরে, তিনি কোনরূপ স্বর্গে অবস্থিত নহেন —আর মানুষ কোন-না-কোন কালে যে-কোন দেবতার উপাসনা করিয়াছে, সবই তাঁহার ভিতরে, তিনি কোন দেবতায় অবস্থিত নহেন; তিনি দেব, অসুর, মানুষ, পশু, উদ্ভিদ, প্রস্তর প্রভৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা, আর তখন মানুষের প্রকৃত স্বরূপ তাহার নিকট এই জগৎ হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠতর এবং সর্ব্বব্যাপী আকাশ হইতে অধিক সর্ব্বব্যাপিরূপে প্রকাশ পায়। তখনই মানুষ নির্ভয় হইয়া যায়, তখনই মানুষ মুক্ত হইয়া যায়। তখন সব ভ্রান্তি চলিয়া যায়, সব দুঃখ দূর হইয়া যায়, সব ভয় একেবারে চিরকালের জন্য শেষ হইয়া যায়। তখন জন্ম কোথায় চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মৃত্যুও চলিয়া যায়; দুঃখ চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে সুখও চলিয়া যায়। পৃথিবী উড়িয়া যায় তাহার সঙ্গে স্বর্গও উড়িয়া যায়; শরীর চলিয়া যায়, তাহার সঙ্গে মনও চলিয়া যায়। সেই ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় জগৎই যেন অব্যক্ত ভাব ধারণ করে। এই যে শক্তিরাশির নিয়ত সংগ্রাম—নিয়ত সংঘর্ষ, ইহা একেবারে স্থগিত হইয়া যায়, আর যাহা শক্তি ও ভূতরূপে, প্রকৃতির বিভিন্ন চেষ্টারূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বয়ং প্রকৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, যাহা স্বর্গ, পৃথিবী, উদ্ভিদ, পশু, মানুষ, দেবতা প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সমুদয় এক অনন্ত অচ্ছেদ্য অপরিণামী সত্তারূপে পরিণত হইয়া যায়; আর জ্ঞানী পুরুষ দেখিতে পান, তিনি সেই সত্তার সহিত অভেদ। "যেমন আকাশে নানাবর্ণের মেঘ আসিয়া খানিকক্ষণ খেলা করিয়া পরে অন্তর্হিত হইয়া যায়," সেইরূপ এই আত্মার সম্মুখে পৃথিবী, স্বর্গ, চন্দ্রলোক, দেবতা, সুখদুঃখ প্রভৃতি

আসিতেছে, কিন্তু উহারা সেই অনন্ত অপরিণামী নীলবর্ণ আকাশকে আমাদের সম্মুখে রাখিয়া অন্তহিত হয়। আকাশ কখন পরিণামপ্রাপ্ত হয় না, মেঘই কেবল পরিণামপ্রাপ্ত হয়। ভ্রমবশতঃ আমরা মনে করি, আমরা অপবিত্র, আমরা সান্ত। আমরা জগৎ হইতে পৃথক্। প্রকৃত মানুষ এই এক অখণ্ড সত্তাস্বরূপ।

এক্ষণে দুইটি প্রশ্ন আসিতেছে। প্রথমটি এই—অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধি করা কি সম্ভব? এতক্ষণ পর্য্যন্ত ত মতের কথা হইল; অপরোক্ষানুভূতি কি সম্ভব? হাঁ সম্পূর্ণই সম্ভব। এমন অনেক লোক সংসারে এখনও জীবিত, যাঁহাদের পক্ষে অজ্ঞান চিরকালের জন্য চলিয়া গিয়াছে। ইঁহারা কি এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরক্ষণেই মরিয়া যান? আমরা যত শীঘ্র মনে করি, তত শীঘ্র নয়। এক কাষ্ঠখণ্ড সংযোজিত দুইটি চক্র একত্র চলিতেছে। যদি আমি একখানি চক্র ধরিয়া সংযোজক কাষ্ঠখণ্ডটিকে কাটিয়া ফেলি, তবে আমি যে চক্রখানি ধরিয়াছি, তাহা থামিয়া যাইবে; কিন্তু অপর চক্রের উপর পূর্ব্বপ্রদত্ত বেগ রহিয়াছে, সুতরাং উহা কিছুক্ষণ গিয়া তবে পড়িয়া যাইবে। পূর্ণ শুদ্ধস্বরূপ আত্মা যেন একখানি চক্র, আর শরীরমনরূপ ভ্রান্তি আর একটি চক্র কর্ম্মরূপ কাষ্ঠদণ্ড দ্বারা যোজিত। জ্ঞানই সেই কুঠার, যাহা ঐ দুইটির সংযোগদণ্ড ছেদন করিয়া দেয়। যখন আত্মারূপ চক্র স্থগিত হইয়া যাইবে, তখন আত্মা আসিতেছেন, যাইতেছেন অথবা তাঁহার জন্মমৃত্যু হইতেছে—এসকল অজ্ঞানের ভাব পরিত্যাগ করিবেন, আর প্রকৃতির সহিত তাঁহার মিলিতভাব, এবং অভাব, বাসনা—সব চলিয়া যাইবে; তখন আত্মা দেখিতে পাইবেন তিনি

পূর্ণ, বাসনারহিত। কিন্তু শরীরমনরূপ অপর চক্রের প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ থাকিবে। সুতরাং যতদিন না এই প্রাক্তন কর্ম্মের বেগ একেবারে নিবৃত্ত হয়, ততদিন উহারা থাকিবে; ঐ বেগ নিবৃত্ত হইলে শরীরমনের পতন হইবে, তখন আত্মা মুক্ত হইবেন। তখন আর স্বর্গে যাওয়া বা স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে ফিরিয়া আসা, এমন কি ব্রহ্মলোকে গমন পর্য্যন্ত স্থগিত হইয়া যাইবে; কারণ তিনি কোথা হইতে আসিবেন, কোথায়ই বা যাইবেন? যে ব্যক্তি এই জীবনেই এই অবস্থা লাভ করিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে অন্ততঃ এক মিনিটের জন্যও এই সংসারদৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়া সত্য প্রতিভাত হইয়াছে, তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়া কথিত হন। এই জীবন্মুক্ত অবস্থা লাভ করাই বেদান্তীর লক্ষ্য।

এক সময়ে আমি ভারত মহাসাগরের উপকূলে ভারতের পশ্চিমভাগস্থ মরুখণ্ডে ভ্রমণ করিতেছিলাম। আমি অনেক দিন ধরিয়া পদব্রজে মরুতে ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু প্রতিদিন এই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম যে, চতুর্দ্দিকে সুন্দর সুন্দর হ্রদ রহিয়াছে, তাহাদের সকলগুলির চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজি বিরাজিত আর ঐ জলে বৃক্ষসমূহের ছায়া বিপরীতভাবে পড়িয়া নড়িতেছে। কি অদ্ভুত দৃশ্য! ইহাকে আবার লোকে মরুভূমি বলে! আমি একমাস ভ্রমণ করিলাম, ভ্রমণ করিতে করিতে এই অদ্ভুত হ্রদসকল ও বৃক্ষরাজি দেখিতে লাগিলাম। একদিন অতিশয় তৃষ্ণার্ত্ত হওয়ায় আমার একটু জল খাইবার ইচ্ছা হইল, সুতরাং আমি ঐ সুন্দর নির্ম্মল হ্রদসমূহের মধ্যে একটির দিকে অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইবামাত্র হঠাৎ উহা অদৃশ্য হইল, আর আমার মনে তখন

এই জ্ঞানের উদয় হইল, 'যে মরীচিকা সম্বন্ধে সারাজীবন পুস্তকে পড়িয়া আসিতেছি, এ সে মরীচিকা।' আর তাহার সহিত এই জ্ঞানও আসিল—'এই সারা মাসের মধ্যে প্রত্যহই আমি মরীচিকাই দেখিয়া আসিতেছি, কিন্তু জানিতাম না যে, ইহা মরীচিকা।' তারপর দিন আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। পূর্ব্বের মতই হ্রদ দেখা যাইতে লাগিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিতে লাগিল যে, উহা মরীচিকা, সত্য হ্রদ নহে। এই জগৎ সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা প্রতিদিন, প্রতিমাস, প্রতিবৎসর এই জগন্মরুতে ভ্রমণ করিতেছি, কিন্তু মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিতে পারিতেছি না। একদিন এই মরীচিকা অদৃশ্য হইবে, কিন্তু উহা আবার আসিবে। শরীর প্রাক্তন কর্ম্মের অধীন থাকিবে সুতরাং ঐ মরীচিকা ফিরিয়া আসিবে। যতদিন আমরা কর্ম্ম দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন জগৎ আমাদের সম্মুখে আসিবে। নর, নারী, পশু, উদ্ভিদ, আসক্তি, কর্ত্তব্য—সব আসিবে, কিন্তু উহারা পূর্ব্বের ন্যায় আমাদের উপর শক্তিবিস্তারে সমর্থ হইবে না। এই নব জ্ঞানের প্রভাবে কর্ম্মের শক্তি নাশ হইবে, উহার বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া যাইবে; জগৎ আমাদের পক্ষে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে; কারণ যেমন জগৎ দেখা যাইবে, তেমনি উহার সহিত সত্য ও মরীচিকার প্রভেদজ্ঞানও আসিবে।

তখন এই জগৎ আর সেই পূর্ব্বের জগৎ থাকিবে না। তবে এইরূপ জ্ঞানসাধনে একটি বিপদাশঙ্কা আছে। আমরা দেখিতে পাই, প্রতি দেশেই লোকে এই বেদান্তদর্শনের মত গ্রহণ করিয়া বলে, "আমি ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, আমি বিধিনিষেধের অতীত,

সুতরাং আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারি।" এই দেশেই দেখিবে, অনেক অজ্ঞানী বলিয়া থাকে, "আমি বদ্ধ নহি, আমি স্বয়ং ঈশ্বরস্বরূপ; আমি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিব।" ইহা ঠিক নহে, যদিও ইহা সত্য যে, আত্মা ভৌতিক, মানসিক বা নৈতিক—সর্ব্বপ্রকার নিয়মের অতীত। নিয়মের মধ্যে বন্ধন, নিয়মের বাহিরে মুক্তি। ইহাও সত্য যে, মুক্তি আত্মার জন্মগত স্বভাব, উহা তাঁহার জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব, আর আত্মার যথার্থ মুক্তস্বভাব ভৌতিক আবরণের মধ্য দিয়া মানুষের আপাত-প্রতীয়মান মুক্তস্বভাবরূপে প্রতীত হইতেছে। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই তুমি আপনাকে মুক্ত বলিয়া অনুভব করিতেছ। আমরা আপনাকে মুক্ত অনুভব না করিয়া এক মুহূর্ত্তও জীবিত থাকিতে পারি না, কথা কহিতে পারি না, কিংবা শ্বাস-প্রশ্বাসও ফেলিতে পারি না। কিন্তু আবার, অল্প চিন্তায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, আমরা যন্ত্রতুল্য, মুক্ত নহি। তবে কোন্‌টি সত্য? এই যে 'আমি মুক্ত'—এই ধারণাটিই কি ভ্রমাত্মক! একদল বলেন—'আমি মুক্ত-স্বভাব' এই ধারণা ভ্রমাত্মক, আবার অপর দল বলেন—'আমি বদ্ধভাবাপন্ন' এই ধারণাই ভ্রমাত্মক। তবে এই দ্বিবিধ অনুভূতি কোথা হইতে আসিয়া থাকে? মানুষ প্রকৃতপক্ষে মুক্ত। মানুষ পরমার্থতঃ যাহা তাহা মুক্ত ব্যতীত আর কিছুই হইতে পারে না; কিন্তু যখনই তিনি মায়ার জগতে আসেন, যখনই তিনি নামরূপের মধ্যে পড়েন, তখনই তিনি বদ্ধ হইয়া যান। 'স্বাধীন ইচ্ছা'—ইহা বলাই ভুল। ইচ্ছা কখনও স্বাধীন হইতেই পারে না। কি করিয়া হইবে? প্রকৃত মানুষ যিনি, যখন তিনি বদ্ধ হইয়া যান তখনই তাঁহার ইচ্ছার

উদ্ভব হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। মানুষের ইচ্ছা বদ্ধভাবাপন্ন, কিন্তু উহার মূল যাহা, তাহা নিত্যকালের জন্য মুক্ত। সুতরাং বন্ধনের অবস্থাতেও এই মনুষ্যজীবনেই হউক, দেবজীবনেই হউক, স্বর্গে অবস্থানকালেই হউক, আর মর্ত্তে অবস্থানকালেই হউক, আমাদের বিধিদত্ত অধিকারস্বরূপ এই মুক্তির স্মৃতি থাকিয়া যায়। আর জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আমরা সকলেই ঐ মুক্তির দিকেই চলিয়াছি। যখন মানুষ মুক্তিলাভ করেন, তখন তিনি নিয়মের দ্বারা কিরূপে বদ্ধ হইতে পারেন? জগতের কোন নিয়মই তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। কারণ, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁহার। তিনি তখন সমুদয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ। হয় বল—তিনিই সমুদয় জগৎ, না হয় বল—তাঁহার পক্ষে জগতের অস্তিত্বই নাই। তবে তাঁহার লিঙ্গ দেশ ইত্যাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব কিরূপে থাকিবে? তিনি কিরূপে বলিবেন—আমি পুরুষ, আমি স্ত্রী, অথবা আমি বালক? এগুলি কি মিথ্যা কথা নহে? তিনি জানিয়াছেন—সেগুলি মিথ্যা। তখন তিনি এইগুলি পুরুষের অধিকার, এইগুলি স্ত্রীর অধিকার—কিরূপে বলিবেন? কাহারও কিছুই অধিকার নাই, কাহারও স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। পুরুষ নাই, স্ত্রীও নাই; আত্মা লিঙ্গহীন, নিত্যশুদ্ধ। আমি পুরুষ বা স্ত্রী বলা, অথবা আমি অমুক-দেশবাসী বলা মিথ্যাবাদ মাত্র। সমুদয় জগৎই আমার দেশ. সমুদয় জগৎই আমার; কারণ, সমুদয় জগতের দ্বারা যেন আমি আপনাকে আবৃত করিয়াছি। সমুদয় জগৎ যেন আমার শরীর হইয়াছে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি—অনেক লোকে বিচারের সময় এইসব কথা বলিয়া কার্য্যের সময় অপবিত্র কার্য্যসকল করিয়া

থাকে ; আর যদি আমরা তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—কেন তাহারা এইরূপ করিতেছে, তাহারা উত্তর দিবে, 'এ তোমাদের বুঝিবার ভ্রম। আমাদের দ্বারা কোন অন্যায় কার্য্য হওয়া অসম্ভব।' এই-সকল লোককে পরীক্ষা করিবার উপায় কি ? উপায় এই—

যদিও সদসৎ উভয়ই আত্মার খণ্ড প্রকাশমাত্র, তথাপি অসদ্ভাবই আত্মার বাহ্য আবরণ, আর 'সৎ' ভাব মানুষের প্রকৃত স্বরূপ যে আত্মা, তাঁহার অপেক্ষাকৃত নিকটতম আবরণ। যতদিন না মানুষ 'অসৎ'-এর স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি সতের স্তরে পৌছিতেই পারিবেন না ; আর যতদিন না তিনি সদসৎ উভয় স্তর ভেদ করিতে পারিতেছেন, ততদিন তিনি আত্মার নিকট পৌছিতেই পারিবেন না। আত্মার নিকট পৌছিলে তাঁহার কি অবশিষ্ট থাকে ? অতি সামান্য কর্ম্ম, ভূত-জীবনেব কার্য্যের অতি সামান্য বেগই অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু এ বেগ—শুভকর্ম্মেরই বেগ। যতদিন না অসদ্বেগ একেবারে রহিত হইয়া যাইতেছে, যতদিন না পূর্ব্বের অপবিত্রতা একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কোন ব্যক্তির পক্ষে সত্যকে প্রত্যক্ষ এবং উপলব্ধি করা অসম্ভব। সুতরাং, যিনি আত্মার নিকট পৌছিয়াছেন, যিনি সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার কেবল ভূত-জীবনের শুভ সংস্কার, শুভ বেগগুলি অবশিষ্ট থাকে। শরীরে বাস করিলেও এবং অনবরত কর্ম্ম করিলেও তিনি কেবল সৎকর্ম্ম করেন ; তাঁহার মুখ সকলের প্রতি কেবল আশীর্ব্বচন বর্ষণ করে, তাঁহার হস্ত কেবল সৎকার্য্যই করিয়া থাকে, তাঁহার মন কেবল সৎ চিন্তা করিতেই সমর্থ, তাঁহার উপস্থিতিই, তিনি যেখানেই যান না কেন, সর্ব্বত্রই মানবজাতির

মহাকল্যাণকর। এরূপ ব্যক্তির দ্বারা কোন অসৎ কর্ম্ম কি সম্ভব? তোমাদের স্মরণ রাখা উচিত 'প্রত্যক্ষানুভূতি' এবং 'শুধু মুখে বলা'র ভিতর বিস্তর প্রভেদ। অজ্ঞান ব্যক্তিও নানা জ্ঞানের কথা কহিয়া থাকে। তোতাপাখীও এইরূপ বকিয়া থাকে। মুখে বলা এক, উপলব্ধি আর এক। দর্শন, মতামত, বিচার, শাস্ত্র, মন্দির, সম্প্রদায় প্রভৃতি কিছু মন্দ নয়, কিন্তু এই প্রত্যক্ষানুভূতি হইলে ওসব আর থাকে না। মানচিত্র অবশ্য উপকারী কিন্তু মানচিত্রে অঙ্কিত দেশ স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়া তারপর আবার সেই মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তখন তুমি কত প্রভেদ দেখিতে পাইবে! সুতরাং যাহারা সত্য উপলব্ধি করিয়াছে তাহাদিগকে আর উহা বুঝিবার জন্য ন্যায়-যুক্তি তর্কবিতর্ক প্রভৃতির আশ্রয় লইতে হয় না। তাহাদের পক্ষে উহা তাহাদের অন্তরাত্মার মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছে—প্রত্যক্ষেরও প্রত্যক্ষ হইয়াছে। বেদান্তবাদীদের ভাষায় বলিতে গেলে বলিতে হয়, উহা যেন তাহার করামলকবৎ হইয়াছে। প্রত্যক্ষ উপলব্ধিকারীরা অসঙ্কুচিতচিত্তে বলিতে পারেন, এই যে আত্মা রহিয়াছে। তুমি তাঁহাদের সহিত যতই তর্ক কর না কেন, তাঁহারা তোমার কথায় হাসিবেন মাত্র, তাঁহারা উহা আবোল-তাবোল বাক্য বলিয়া মনে করিবেন। শিশু যা-তা বলুক না কেন, তাঁহারা তাহাতে কোন কথা কহেন না। তাঁহারা সত্য উপলব্ধি করিয়া 'ভরপুর' হইয়া আছেন। মনে কর, তুমি একটি দেশ দেখিয়া আসিয়াছ, আর একজন তোমার নিকট আসিয়া এই তর্ক করিতে লাগিল—ঐ দেশের

কখন অস্তিত্বই ছিল না ; এইরূপ সে ক্রমাগত তর্ক করিয়া যাইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রতি তোমার মনের ভাব এইরূপ হইবে যে, সে ব্যক্তি বাতুলালয়ের উপযুক্ত। এইরূপ যিনি ধর্মের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি বলেন, "জগতের ধর্ম সম্বন্ধে যে-সকল কথা শুনা যায়, সে-সকল কেবল বালকের কথামাত্র। প্রত্যক্ষানুভূতিই ধর্মের সার কথা।" ধর্ম উপলব্ধি করা যাইতে পারে। প্রশ্ন এই, তুমি কি উহার অধিকারী হইয়াছ? তোমার কি ধর্মের আবশ্যকতা আছে? যদি তুমি ঠিক ঠিক চেষ্টা কর, তবে তোমার প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইবে, তখনই তুমি প্রকৃতপক্ষে ধার্মিক হইবে। যতদিন না তোমার এই উপলব্ধি হইতেছে, ততদিন তোমাতে এবং নাস্তিকে কোন প্রভেদ নাই। নাস্তিকেরা তবু অকপট, কিন্তু যে বলে, 'আমি ধর্ম বিশ্বাস করি' অথচ কখন উহা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করে না, সে অকপট নহে।

তার পরের প্রশ্ন এই—উপলব্ধির পরে কি হয়? মনে কর, আমরা জগতের এই অখণ্ড ভাব (আমরাই যে সেই একমাত্র অনন্ত পুরুষ, তাহা) উপলব্ধি করিলাম; মনে কর, আমরা জানিতে পারিলাম—আত্মাই একমাত্র আছেন, আর তিনি বিভিন্ন ভাবে প্রকাশ পাইতেছেন; এইরূপ জানিতে পারিলে তারপর আমাদের কি হয়? তাহা হইলে আমরা কি নিশ্চেষ্ট হইয়া এক কোণে বসিয়া মরিয়া যাইব? জগতের ইহা দ্বারা কি উপকার হইবে? সেই প্রাচীন প্রশ্ন আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া! প্রথমতঃ উহা দ্বারা জগতের উপকার হইবে কেন? ইহার কি কোন যুক্তি আছে? লোকের এই প্রশ্ন করিবার কি অধিকার আছে, ইহাতে জগতের কি উপকার

হইবে? ইহার অর্থ কি?—ছোট ছেলে মিষ্টদ্রব্য ভালবাসে। মনে কর, তুমি তড়িতের বিষয়ে কিছু গবেষণা করিতেছ; শিশু তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, ইহাতে কি মিষ্টি কেনা যায়?' তুমি বলিলে, 'না'। 'তবে ইহাতে কি উপকার হইবে?' তত্ত্বজ্ঞানের আলোচনায় ব্যাপৃত দেখিলেও লোকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া বসে, 'ইহাতে জগতের কি উপকার হইবে? ইহাতে কি আমাদের টাকা হইবে?'—'না'। 'তবে ইহাতে আর উপকার কি?' মানুষ জগতের হিত করা অর্থে এইরূপ বুঝিয়া থাকে। তথাপি ধর্ম্মের এই প্রত্যক্ষানুভূতিই জগতের সম্পূর্ণ উপকার করিয়া থাকে। লোকের ভয় হয়, যখন সে এই অবস্থা লাভ করিবে, যখন সে উপলব্ধি করিবে যে সবই এক, তখন তাহার প্রেমের প্রস্রবণ শুকাইয়া যাইবে; জীবনের মূল্যবান যাহা কিছু সব চলিয়া যাইবে; এই জীবনে ও পরজীবনে তাহারা যাহা কিছু ভালবাসিত, তাহাদের পক্ষে তাহার কিছুই থাকিবে না। কিন্তু লোকে এ বিষয় একবার ভাবিয়া দেখে না যে, যে-সকল ব্যক্তি নিজ সুখচিন্তায় একরূপ উদাসীন, তাঁহারাই জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্মী হইয়া গিয়াছেন। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসে, যখন দেখিতে পায় তাহার ভালবাসার জিনিস কোন ক্ষুদ্র মর্ত্ত্য জীব নহে। তখনই মানুষ যথার্থ ভালবাসিতে পারে, যখন সে দেখিতে পায় তাহার ভালবাসার পাত্র—খানিকটা মৃত্তিকাখণ্ড নহে, স্বয়ং ভগবান। স্ত্রী স্বামীকে আরও অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি ভাবেন—স্বামী সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। স্বামীও স্ত্রীকে অধিক ভালবাসিবেন, যদি তিনি জানিতে পারেন—স্ত্রী স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ। সেই মাতাও সন্তানগণকে

বেশী ভালবাসিবেন, যিনি সন্তানগণকে ব্রহ্মস্বরূপ দেখেন। সেই ব্যক্তি তাঁহার মহাশত্রুকেও প্রীতি করিবেন, যিনি জানেন—ঐ শত্রু সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্যক্তিই সাধু ব্যক্তিকে ভাল বাসিবেন, যিনি জানেন—সেই সাধু ব্যক্তি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ। সেই লোকই আবার অতিশয় অসাধু ব্যক্তিকেও ভালবাসিবেন, যিনি জানেন – সেই অসাধুতম পুরুষেরও পশ্চাতে সেই প্রভু রহিয়াছেন। যাঁহার পক্ষে এই ক্ষুদ্র 'অহং' একেবারে মৃত হইয়া গিয়াছে এবং তৎস্থল ঈশ্বর অধিকার করিয়া বসিয়াছেন, সেই ব্যক্তি জগৎকে ইঙ্গিতে পরিচালন করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে সমুদয় জগৎ সম্পূর্ণরূপে অন্য আকার ধারণ করে। দুঃখকর ক্লেশকর যাহা কিছু, সবই তাঁহার পক্ষে চলিয়া যায়; সকল প্রকার গোলমাল, দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। জগৎ তখন তাঁহার পক্ষে কারাগারস্বরূপ না হইয়া (যেখানে আমরা প্রতিদিন এক টুকুরা রুটির জন্য ঝগড়া-মারামারি করি) আমাদের ক্রীড়াক্ষেত্ররূপে পরিণত হইবে। তখন জগৎ অতি সুন্দরভাবে পরিণত হইবে। এইরূপ ব্যক্তিরই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে—'এই জগৎ কি সুন্দর!' তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, সবই মঙ্গলস্বরূপ। এইরূপ প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতে জগতের এই মহৎ হিত হইবে যে, জগতের এই সকল বিবাদ, গণ্ডগোল সব দূর হইয়া জগতে শান্তির রাজ্য হইবে। যদি জগতের সকল মানুষ আজ এই মহান সত্যের এক বিন্দুও উপলব্ধি করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে এই সমুদয় জগৎই আর এক রূপ ধারণ করিবে; আর এই সব গণ্ডগোলের পরিবর্তে শান্তির রাজত্ব আসিবে। অসত্যভাবে

তাড়াতাড়ি করিয়া সকলকে ছাড়াইয়া যাইবার প্রবৃত্তি জগৎ হইতে চলিয়া যাইবে। উহার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রকার অশান্তি, সকল প্রকার ঘৃণা, সকল প্রকার ঈর্ষা এবং সকল প্রকার অশুভ চির-কালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন দেবতারা এই জগতে বাস করিবেন। তখন এই জগৎই স্বর্গ হইয়া যাইবে। আর যখন দেবতায় দেবতায় খেলা, যখন দেবতায় দেবতায় কাজ, যখন দেবতায় দেবতায় প্রেম, তখন কি আর অশুভ থাকিতে পারে? ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ উপলব্ধির এই মহা সুফল। সমাজে তোমরা যাহা কিছু দেখিতেছ, সবই তখন পরিবর্ত্তিত হইয়া অন্যরূপ ধারণ করিবে। তখন তোমরা মানুষকে আর খারাপ বলিয়া দেখিবে না; ইহাই প্রথম মহালাভ। তখন তোমরা আর কোন অন্যায়-কারী দরিদ্র নরনারীর দিকে ঘৃণাপূর্ব্বক দৃষ্টিপাত করিবে না। হে মহিলাগণ, তোমরা আর যে দুঃখিনী কামিনী রাত্রিতে পথে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ঘৃণাপূর্ব্বক তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিবে না; কারণ তোমরা সেখানেও সাক্ষাৎ ঈশ্বরকে দেখিবে। তখন তোমাদের আর ঈর্ষা বা অপরকে শাস্তি দিবার ভাব উদিত হইবে না; ঐ সবই চলিয়া যাইবে। তখন প্রেম এত প্রবল হইবে যে, মানবজাতিকে সৎপথে পরিচালিত করিতে আর চাবুকের প্রয়োজন হইবে না।

যদি জগতে নরনারীগণের লক্ষ ভাগের এক ভাগও শুদ্ধ চুপ করিয়া বসিয়া খানিকক্ষণের জন্যও বলেন—"তোমরা সকলেই ঈশ্বর; হে মানবগণ, হে পশুগণ, হে সর্ব্বপ্রকার জীবিত প্রাণী, তোমরা সকলেই এক জীবন্ত ঈশ্বরের প্রকাশ", তাহা হইলে অর্দ্ধ

ঘণ্টার মধ্যেই সমুদয় জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। তখন চতুর্দ্দিকে ঘৃণার বীজ প্রক্ষেপ না করিয়া, ঈর্ষা ও অসৎ চিন্তার প্রবাহ প্রক্ষেপ না করিয়া, সকল দেশের লোকেই চিন্তা করিবে—সবই তিনি। যাহা কিছু দেখিতেছ বা অনুভব করিতেছ, সবই তিনি। তোমার মধ্যে অশুভ না থাকিলে, তুমি অশুভ দেখিবে কিরূপে? তোমার মধ্যে চোর না থাকিলে, তুমি কেমন করিয়া চোর দেখিবে? তুমি নিজে খুনী না হইলে, খুনী দেখিবে কিরূপে? সাধু হও, তাহা হইলে অসাধু ভাব তোমার পক্ষে একেবারে চলিয়া যাইবে। এইরূপে সমুদয় জগৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। ইহাই সমাজের মহৎ লাভ। মানুষের পক্ষে ইহা মহৎ লাভ। এই সকল ভাব ভারতে প্রাচীনকালে অনেক মহাত্মা আবিষ্কার ও কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণতা এবং দেশের পরাধীনতা প্রভৃতি নানাবিধ কারণে এই সকল চিন্তা চতুর্দ্দিকে প্রচার হইতে পায় নাই! তাহা না হইলেও এগুলি খুব মহাসত্য, যেখানেই এগুলি তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিতে পারিয়াছে সেইখানেই মানুষ দেবভাবাপন্ন হইতেছে। এইরূপ একজন দেবপ্রকৃতি মানুষের দ্বারা আমার সমুদয় জীবনটি পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে; ইহার সম্বন্ধে আগামী রবিবার তোমাদের নিকট বলিব। এক্ষণে এই সকল ভাব জগতে প্রচারিত হইবার সময় আসিতেছে। মঠে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল পণ্ডিতদের পাঠের জন্য দার্শনিক পুস্তকসমূহে আবদ্ধ না থাকিয়া, কেবল কতকগুলি সম্প্রদায়ের এবং কতকগুলি পণ্ডিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে না থাকিয়া, উহা সমুদয় জগতে প্রচারিত

হইবে ; তাহাতে উহা সাধু, পাপী, আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত, অশিক্ষিত—সকলেরই সাধারণ সম্পত্তি হইতে পারে। তখন এইসকল ভাব জগতের বায়ুতে খেলা করিতে থাকিবে, আর আমরা যে বায়ু শ্বাসপ্রশ্বাস দ্বারা গ্রহণ করিতেছি তাহার প্রত্যেক তালে তালে বলিবে—'তত্ত্বমসি'। এই অসংখ্য চন্দ্রসূর্য্য-পূর্ণ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড বাক্য-উচ্চারণকারী প্রত্যেক পদার্থের ভিতর দিয়া বলিবে—'তত্ত্বমসি'।

# মায়া ও ঈশ্বরধারণার ক্রমবিকাশ

আমরা দেখিয়াছি, অদ্বৈত বেদান্তের একতম মূলভিত্তিস্বরূপ মায়াবাদ অস্ফুটভাবে সংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়, আর উপনিষদে যে-সকল তত্ত্ব খুব পরিস্ফুট ভাব ধারণ করিয়াছে, সংহিতাতে তাহার সবগুলিই অস্ফুটভাবে কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান। আপনারা অনেকেই এক্ষণে মায়াবাদের তত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে অবগত হইয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন। অনেক সময়ে লোকে ভ্রান্তিবশতঃ মায়াকে 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করে; অতএব তাঁহারা যখন জগৎকে মায়া বলেন, তখন উহাকেও 'ভ্রম' বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হয়। মায়ার 'ভ্রম' এই অর্থ বড় ঠিক নহে। মায়া কোন বিশেষ মত নহে, উহা কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপবর্ণনা মাত্র। সেই মায়াকে বুঝিতে হইলে, আমাদিগকে সংহিতা পর্য্যন্ত যাইতে হইবে এবং প্রথমে মায়া সম্বন্ধে কি ধারণা ছিল, তাহা পর্য্যন্ত দেখিতে হইবে। আমরা দেখিয়াছি, লোকের দেবতার জ্ঞান কিরূপে আসিল। বুঝিতে হইবে, এই দেবতারা প্রথমে কেবল শক্তিশালী পুরুষমাত্র ছিলেন। আপনারা অনেকে গ্রীক, হিব্রু, পারসী বা অপরাপর জাতির প্রাচীন শাস্ত্রে দেবতারা আমাদের দৃষ্টিতে যে-সকল কার্য্য অতীব ঘৃণিত সেইসকল কার্য্য করিতেছেন, এইরূপ বর্ণনা দেখিয়া ভীত হইয়া থাকেন;

কিন্তু আমরা সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া যাই যে, আমরা উনবিংশ শতাব্দীর লোক, আর এইসব দেবতা অনেক সহস্র বর্ষ পূর্ব্বের জীব; আর আমরা ইহাও ভুলিয়া যাই যে, ঐসকল দেবতার উপাসকেরা তাঁহাদের চরিত্রে কিছু অসঙ্গত দেখিতে পাইতেন না, বা তাঁহারা তাঁহাদের দেবতাদের যেরূপ বর্ণনা করিতেন, তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র ভয় পাইতেন না, কাবণ সেইসকল দেবতারা তাঁহাদেরই মত ছিলেন। আমাদের সারা জীবনে আমাদের এই শিক্ষা করিতে হইবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার নিজ নিজ আদর্শানুসারে বিচার করিতে হইবে, অপরের আদর্শানুসারে নয়। তাহা না করিয়া আমরা আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা অপরের বিচার করিয়া থাকি। এরূপ করা উচিত নয়। আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী লোকসকলের সহিত ব্যবহার করিবার সময় আমরা সর্ব্বদাই এই ভুলে পড়ি, আর আমার ধারণা অপরের সহিত আমাদের যাহা কিছু বিবাদ-বিসংবাদ হয়, তাহা কেবল এই এক কারণ হইতে হয় যে, আমরা অপরের দেবতাকে আমাদের নিজ দেবতা দ্বারা, অপরাপর আদর্শ আমাদের নিজ আদর্শ দ্বারা এবং অপরের অভিসন্ধি আমাদের নিজ অভিসন্ধি দ্বারা বিচার করিতে চেষ্টা করিয়া থাকি। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় আমি হয়ত কোন বিশেষ কার্য্য করিতে পারি, আর যখন আমি দেখি আর একজন লোক সেইরূপ কার্য্য করিতেছে, আমি মনে করিয়া লই তাহারও সেই অভিসন্ধি; আমার মনে একথা একবারও উদিত হয় না যে, যদিও ফল সমান হইতে পারে তথাপি ভিন্ন ভিন্ন সহস্র সহস্র কারণ সেই একই ফল প্রসব করিতে পারে। আমি যে কারণে সেই কার্য্য

করিতে প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকি, তিনি সেই কার্য্য অন্য অভিসন্ধিতে করিতে পারেন। সুতরাং ঐসকল প্রাচীন ধর্ম্ম বিচার করিবার সময় আমরা যেভাবে অপরের সম্বন্ধে বিচার করিয়া থাকি, সেইরূপ ভাবে যেন বিচারে অগ্রসর না হই; কিন্তু আমরা যেন সেই প্রাচীনকালের চিন্তাপ্রণালীর ভাবে আপনাদিগকে ভাবিত করিয়া বিচার করি।

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের নিষ্ঠুর জিহোভার বর্ণনায় অনেকে ভীত হইয়া থাকেন, কিন্তু ভীত হইবার কারণ কি? লোকের ইহা কল্পনা করিবার কি অধিকার আছে যে, প্রাচীন য়াহুদীদিগের জিহোভা আজকালকার ঈশ্বরের মত হইবেন? আবার ইহাও আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের পরে যাঁহারা আসিবেন তাঁহারা আমরা যেভাবে প্রাচীনদের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ধারণায় হাস্য করিয়া থাকি, আমাদের ধর্ম্ম বা ঈশ্বরের ধারণায়ও সেইভাবে হাস্য করিবেন। তাহা হইলেও এইসকল বিভিন্ন ঈশ্বর-ধারণার মধ্যে সংযোগসাধক এক সুবর্ণ-সূত্র বিদ্যমান, আর বেদান্তের উদ্দেশ্য—এই সূত্র আবিষ্কার করা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ভিন্ন ভিন্ন মণি যেমন একসূত্রে গ্রথিত, সেইরূপ এইসকল বিভিন্ন ভাবের ভিতরেও একসূত্র রহিয়াছে।" আর আধুনিক ধারণানুসারে সেগুলি যতই বীভৎস, ভয়ানক বা ঘৃণিত বলিয়া প্রতীয়মান হউক না কেন, বেদান্তের কর্ত্তব্য—ঐ সকল ধারণা ও বর্ত্তমান ধারণাসকলের ভিতর এই সংযোগসূত্র আবিষ্কার করা। ভূতকালের অবস্থা লইয়া বিচার করিলে সেগুলি বেশ সঙ্গতও দেখায়, আর বোধ হয় আমাদের বর্ত্তমান ধারণাসকল হইতে সেগুলি

অধিকতর বীভৎস ছিল না। যখন আমরা সেই প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা, প্রাচীনকালের লোকের নৈতিক ভাব—যাহার ভিতর ঐ দেবতার ভাব বিকাশ পাইবার অবকাশ পাইয়াছিল—তাহা হইতে পৃথক করিয়া সেই ভাবগুলিকে দেখিতে যাই, তখনই তাহাদের বীভৎসতা প্রকাশ হইয়া পড়ে। প্রাচীনকালের সমাজের অবস্থা এখন ত আর নাই। যেমন প্রাচীন য়াহুদী বর্ত্তমান তীক্ষ্ণবুদ্ধি য়াহুদীতে পরিণত হইয়াছেন, যেমন প্রাচীন আর্য্যেরা আধুনিক বুদ্ধিমান হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন, সেইরূপ জিহোভার ক্রমোন্নতি হইয়াছে, দেবতাদেরও হইয়াছে। আমরা এইটুকু ভুল করি যে, আমরা উপাসকের ক্রমোন্নতি স্বীকার করিয়া থাকি, কিন্তু ঈশ্বরের ক্রমোন্নতি স্বীকার করি না। উন্নতি করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার উপাসকদিগকে আমরা যেটুকু প্রশংসাবাদ প্রদান করি, ঈশ্বরকে তাহাও দিতে নারাজ। কথাটা এই—তুমি আমি যেমন কোন বিশেষ ভাবের প্রকাশক বলিয়া ঐ ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তোমার আমার উন্নতি হইয়াছে, সেইরূপ দেবতারাও বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্যোতক বলিয়া ভাবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেবতারও উন্নতি হইয়াছে। তোমাদের পক্ষে এইটি আশ্চর্য্য বোধ হইতে পারে যে, দেবতা বা ঈশ্বরের আবার উন্নতি হয় কি ? এরূপভাবে ধরিলে ইহাও ত বলা যায় যে, মানুষেরও কখনও উন্নতি হয় না। আমরা পরে দেখিব—এই মানুষের ভিতর যে প্রকৃত মানুষ রহিয়াছেন তিনি অচল, অপরিণামী, শুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত। যেমন এই মানুষ সেই প্রকৃত মানুষের ছায়ামাত্র, তদ্রূপ আমাদের ঈশ্বরধারণা কেবল আমাদের মনে সৃষ্টমাত্র—উহারা সেই প্রকৃত

ঈশ্বরের আংশিক প্রকাশ, আভাসমাত্র। ঐসকল আংশিক প্রকাশের পশ্চাতে প্রকৃত ঈশ্বর রহিয়াছেন—তিনি নিত্যশুদ্ধ, অপরিণামী। কিন্তু ঐসকল আংশিক প্রকাশ সর্ব্বদাই পরিণামশীল—উহারা উহাদের অন্তরালস্থ সত্যের ক্রমাভিব্যক্তি মাত্র; সেই সত্য যখন অধিক পরিমাণে অভিব্যক্ত হয় তখন উহাকে উন্নতি, আর উহার অধিকাংশ আবৃত বা অনভিব্যক্ত থাকিলে তাহাকে অবনতি বলে। এইরূপে যেমন আমাদের উন্নতি হয়, তেমনি দেবতার উন্নতি হয়। সাদাসিদে ভাবে ধরিতে গেলে বলিতে হয়, যেমন আমাদের উন্নতি হয়, আমাদের স্বরূপ যেমন প্রকাশ হয়, তেমনি দেবগণও তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন।

এক্ষণে আমরা মায়াবাদ বুঝিতে সমর্থ হইব। জগতের সকল ধর্ম্মই এক প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন—জগতে এই অসামঞ্জস্য কেন? জগতে এই অশুভ কেন? আমরা ধর্ম্মভাবের প্রথম আরম্ভের সময় এই প্রশ্নের উত্থাপন দেখিতে পাই না; তাহার কারণ—আদিম মনুষ্যের পক্ষে জগৎ অসামঞ্জস্যপূর্ণ বোধ হয় নাই। তাহার চতুর্দ্দিকে কোন অসামঞ্জস্য ছিল না, কোন প্রকার মতবিরোধ ছিল না, ভালমন্দের কোন প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। কেবল তাঁহাদের হৃদয়ে দুইটি জিনিসের সংগ্রাম হইত। একটি বলিত—এই কর, আর একটি তাহা করিতে নিষেধ করিত। প্রাথমিক মনুষ্য ভাবের দাস ছিলেন। তাঁহার মনে যাহা উদিত হইত, তাহাই তিনি করিতেন। তিনি নিজের এই ভাব সম্বন্ধে বিচার করিবার বা উহাকে সংযত করিবার চেষ্টা মোটেই

করিতেন না। এইসকল দেবতা সম্বন্ধেও তদ্রূপ; ইঁহারাও উপস্থিত প্রবৃত্তির অধীন ছিলেন। ইন্দ্র আসিলেন, আর দৈত্য-বল ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। জিহোভা কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, কাহারও প্রতি বা রুষ্ট; কেন—তাহা কেহ জানে না, জিজ্ঞাসাও করে না। ইহার কারণ, তখন অনুসন্ধানের প্রবৃত্তিই লোকের জাগরূক হয় নাই; সুতরাং তিনি যাহা করেন, তাহাই ভাল। তখন ভালমন্দের কোন ধারণাই হয় নাই। আমরা যাহাকে মন্দ বলি, দেবতারা এমন অনেক কাজ করিতেছেন; বেদে দেখিতে পাই—ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবতারা অনেক মন্দ কাজ করিতেছেন, কিন্তু ইন্দ্রের উপাসকদিগের দৃষ্টিতে পাপ বা অসৎ কার্য্য কিছু ছিল না, সুতরাং তাঁহারা সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতেন না।

নৈতিক ভাবেব উন্নতির সহিত মানুষের মনে এক যুদ্ধ বাধিল; মানুষের ভিতরে যেন একটি নূতন ইন্দ্রিয়ের আবির্ভাব হইল। ভিন্ন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন ভিন্ন জাতি উহাকে বিভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন; কেহ কেহ বলেন—উহা ঈশ্বরের বাণী; কেহ কেহ বলেন—উহা পূর্ব্ব শিক্ষার ফল। যাহাই হউক, উহা প্রবৃত্তির দমনকারী শক্তিরূপে কার্য্য করিয়াছিল। আমাদের মনের একটি প্রবৃত্তিতে বলে—এই কাজ কর; আর একটি বলে—করিও না। আমাদের ভিতরে কতকগুলি প্রবৃত্তি আছে, সেগুলি ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া বাহিরে যাইবার চেষ্টা করিতেছে; আর তাহার পশ্চাতে, যতই ক্ষীণ হউক না কেন, আর একটি স্বর বলিতেছে—বাহিরে যাইও না। এই দুইটি ব্যাপারের সংস্কৃত

নাম—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। প্রবৃত্তিই আমাদের সকল কর্ম্মের মূল। নিবৃত্তি হইতেই ধর্ম্মের উদ্ভব। ধর্ম্ম আরম্ভ হয় এই 'করিও না' হইতে; আধ্যাত্মিকতাও ঐ 'করিও না' হইতেই আরম্ভ হয়। যেখানে এই 'করিও না' নাই, সেখানে ধর্ম্মের আরম্ভই হয় নাই, বুঝিতে হইবে। এই 'করিও না'—এই নিবৃত্তির ভাব আসিল। মানুষের ধারণা—তাহাদের যুদ্ধশীল পাশব প্রকৃতি দেবতা-সত্ত্বেও উন্নত হইতে লাগিল।

এক্ষণে মানুষের হৃদয়ে একটু ভালবাসা প্রবেশ করিল। অবশ্য খুব অল্প ভালবাসাই তাহাদের হৃদয়ে আসিয়াছিল, আর এখনও যে উহা বড় বেশী, তাহা নহে। প্রথম উহা জাতিতে বদ্ধ ছিল। এই দেবগণ কেবল তাঁহাদের সম্প্রদায়কেই মাত্র ভালবাসিতেন। প্রত্যেক দেবতাই জাতীয় দেবমাত্রই ছিলেন, কেবল সেই বিশেষ জাতির রক্ষকমাত্রই ছিলেন। আর অনেক সময় ঐ জাতির অঙ্গেরা আপনাদিগকে ঐ দেবতার বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত, যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিভিন্নবংশীয়েরা আপনাদিগকে তাঁহাদের এক সাধারণ গোষ্ঠীপতির বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। প্রাচীনকালে কতকগুলি জাতি ছিল, এখনও আছে, যাঁহারা আপনাদিগকে সূর্য্য ও চন্দ্রের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থসকলে আপনারা সূর্য্যবংশের বড় বড় বীর সম্রাটগণের কথা পাঠ করিয়াছেন। ইঁহারা প্রথমে চন্দ্র-সূর্য্যের উপাসক ছিলেন; ক্রমশঃ আপনাদিগকে ঐ চন্দ্র-সূর্য্যের বংশধর বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং যখন এইজাতীয় ভাব আসিতে লাগিল, তখন একটু

ভালবাসা আসিল, পরস্পরের প্রতি একটু কর্ত্তব্যের ভাব আসিল, একটু সামাজিক শৃঙ্খলার উৎপত্তি হইল; আর অমনি এই ভাবও আসিতে লাগিল—আমরা পরস্পরের দোষ সহ্য ও ক্ষমা না করিয়া কিরূপে একত্র বাস করিতে পারি? মানুষ কি করিয়া অন্ততঃ কোন না কোন সময়ে নিজ মনের প্রবৃত্তি সংযত না করিয়া অপরের—এমন কি, একজনেরও সহিত বাস করিতে পারে? উহা অসম্ভব। এইরূপেই সংযমের ভাব আসে। এই সংযমের ভাবের উপর সমুদয় সমাজ গ্রথিত, আর আমরা জানি, যে নর বা নারী এই সহিষ্ণুতা বা ক্ষমারূপ মহতী শিক্ষা আয়ত্ত না করিয়াছেন, তিনি অতি কষ্টে জীবন যাপন করেন।

অতএব যখন এইরূপ ধর্ম্মের ভাব আসিল, তখন মানুষের মনে কিছু উচ্চতর, অপেক্ষাকৃত অধিক নীতিসঙ্গত একটু ভাবের আভাস আসিল। তখন তাঁহাদের ঐ প্রাচীন দেবতাগণকে—চঞ্চল, সমরপরায়ণ, মদ্যপায়ী, গোমাংসভুক্ দেবগণকে—যাঁহাদের দগ্ধ মাংসের গন্ধ এবং তীব্র সুরার আহুতিতেই পরম আনন্দ ছিল—কেমন গোলমেলে ঠেকিতে লাগিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—বেদে বর্ণিত আছে যে, কখন কখন ইন্দ্র হয়ত এত মদ্যপান করিতেছেন যে, তিনি মাটিতে পড়িয়া অবোধ্যভাবে বকিতে আরম্ভ করিলেন! এরূপ দেবতায় আর লোকের বিশ্বাসস্থাপন অসম্ভব হইল। তখন সকলেরই অভিসন্ধি অন্বেষিত—জিজ্ঞাসিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; দেবতাদেরও কার্য্যের অভিসন্ধি জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। অমুক দেবতার অমুক কার্য্যের হেতু কি? কোন হেতুই পাওয়া গেল না, সুতরাং লোকে এইসকল

দেবতা পরিত্যাগ করিল, অথবা তাহারা দেবতাদের আরও উচ্চতম ধারণা করিতে লাগিল। তাহারা দেবতাদের কার্য্যগুলির মধ্যে যেগুলি ভাল, যেগুলি তাহারা বুঝিতে পারিল সেগুলি সব একত্রিত করিল; আর যেগুলি বুঝিতে পারিল না বা যেগুলি তাহাদের ভাল বলিয়া বোধ হইল না সেগুলিকেও পৃথক করিল; এই ভাল ভাবগুলির সমষ্টিকে তাহারা দেবদেব এই আখ্যা প্রদান করিল। তাহাদের উপাস্য দেবতা তখন কেবলমাত্র শক্তির পরিচায়ক রহিলেন না, শক্তি হইতে আরও কিছু অধিক তাহাদের পক্ষে আবশ্যক হইল। তিনি নীতিপরায়ণ দেবতা হইলেন; তিনি মানুষকে ভালবাসিতে লাগিলেন, তিনি মানুষের হিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবতার ধারণা তখনও অক্ষুন্ন রহিল। তাহারা তাঁহার নীতিপরায়ণতা ও শক্তি বর্দ্ধিত করিল মাত্র। জগতের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতিপরায়ণ পুরুষ এবং একরূপ সর্ব্বশক্তিমানও হইলেন।

কিন্তু জোড়াতাড়া দিয়া বেশী দিন চলে না। যেমন জগদ্‌রহস্যের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা হইতে লাগিল, তেমনি ঐ রহস্য যেন আরও রহস্যময় হইতে লাগিল। দেবতা বা ঈশ্বরের গুণ যেন সমযুক্তান্তর শ্রেণীনিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, সন্দেহও সেইরূপ সমগুণিতান্তর শ্রেণীনিয়মে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। যখন লোকের জিহোভা নামক নিষ্ঠুর ঈশ্বরের ধারণা ছিল, তখন সেই ঈশ্বরের সহিত জগতের সামঞ্জস্যবিধান করিতে যে কষ্ট পাইতে হইত, তাহা অপেক্ষা এখন যে ঈশ্বরের ধারণা উপস্থিত হইল, তাহার সহিত জগতের সামঞ্জস্যসাধন কঠিনতর হইয়া পড়িল।

সর্ব্বশক্তিমান ও প্রেমময় ঈশ্বরের রাজ্যে এরূপ পৈশাচিক ঘটনা কেন ঘটে? কেন সুখ অপেক্ষা দুঃখ এত বেশী? সাধুভাব যত আছে, তাহা অপেক্ষা অসাধুভাব এত বেশী কেন? আমরা কিছু খারাপ দেখিব না—বলিয়া চোখ বুজিয়া থাকিতে পারি; কিন্তু তাহাতে জগতের বীভৎসতার কিছু পরিবর্ত্তন হয় না। খুব ভাল বলিলে বলিতে হয়, এই জগৎ ট্যাণ্টালাসের[1] নরকস্বরূপ, তাহা হইতে উহা কোন অংশে উৎকৃষ্ট নহে। প্রবল প্রবৃত্তি সব রহিয়াছে—ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিবার প্রবল বাসনা, কিন্তু পূরণ করিবার উপায় নাই। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমাদের হৃদয়ে এক তরঙ্গ উঠিল—তাহাতে আমাদিগকে কোন কার্য্যে অগ্রসর করিল, আর আমরা একপদ যেই অগ্রসর হইলাম, অমনি বাধা পাইলাম। আমরা সকলেই ট্যাণ্টালাসের মত এই জগতে জীবনধারণ করিতে এবং মরিতে যেন বিধিনির্ব্বন্ধে অভিশপ্ত। পঞ্চেন্দ্রিয়ের দ্বারা সীমাবদ্ধ জগতের অতীত আদর্শসমূহ আমাদের মস্তিষ্কে আসিতেছে, কিন্তু অনেক চেষ্টাচরিত্র করিয়া দেখিতে পাই, সেগুলিকে কখনই কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় না বরং আমরা পারিপার্শ্বিক

---

[1] গ্রীকদিগের মধ্যে একটি পৌরাণিক গল্প আছে। তাহাতে বর্ণিত আছে যে, ট্যাণ্টালাস নামক এক রাজা পাতালে এক হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ হ্রদের জল তাঁহার ওষ্ঠ পর্য্যন্ত আসিত এবং যখনই তিনি পিপাসানিবারণ করিবার জন্ত জলপান করিতে উদ্যত হইতেন, অমনি জল সরিয়া যাইত। তাঁহার মাথার উপর নানাবিধ ফল ঝুলিত এবং যখনই তিনি ক্ষুধানিবৃত্তি করিবার জন্ত ঐ ফল হাত দিয়া লইতে যাইতেন, অমনি উহা সরিয়া যাইত।

অবস্থাচক্রে পেষিত হইয়া. চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরমাণুতে পরিণত হই। আবার যদি আমি এই আদর্শের জন্য চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কেবল সাংসারিকভাবে থাকিতে চাই, তাহা হইলেও আমাকে পশুজীবন যাপন কবিতে হয়, আর আমি অবনতভাবাপন্ন হইয়া যাই। সুতরাং কোনদিকেই সুখ নাই। যাহারা এই জগতেই যেমন জন্মাইয়াছে সেইরূপ থাকিতে চায়, তাহাদেরও অদৃষ্টে দুঃখ। যাহারা আবার সত্যের জন্য—এই পাশব জীবন হইতে কিছু উন্নত জীবনের জন্য—প্রাণ দিতে অগ্রসর হয়, তাহাদের আবার সহস্রগুণ অসুখ। ইহা বাস্তব ঘটনা; ইহার আর কিছু ব্যাখ্যা নাই। ইহার কোন ব্যাখ্যা হইতে পারে না। তবে বেদান্ত এই সংসার হইতে বাহিরে যাইবার পথ দেখাইয়া দেন। এই সকল বক্তৃতার সময় আমাকে সময়ে সময়ে এমন অনেক কথা বলিতে হইবে, যাহাতে তোমরা ভয় পাইবে, কিন্তু আমি যাহা বলি তাহা স্মরণ রাখিও, উহা বেশ করিয়া হজম করিও, দিবারাত্র ঐ সম্বন্ধে চিন্তা করিও। তাহা হইলে উহা তোমাদের অন্তরে প্রবেশ করিবে, উহা তোমাদিগকে উন্নত করিবে এবং তোমাদিগকে সত্য বুঝিতে এবং সত্যে অবস্থিত হইতে সমর্থ করিবে।

এই জগৎ যে ট্যাণ্টালাসের নরকস্বরূপ, ইহা কোন মতবিশেষ নহে, ইহা বাস্তবিক সত্য কথা—আমরা এই জগৎসম্বন্ধে কিছু জানিতে পারি না; আবার আমরা জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। এই জগৎশৃঙ্খলের অস্তিত্ব আছে তাহাও আমরা বলিতে পারি না, আবার যখন আমরা উহার সম্বন্ধে চিন্তা করিতে যাই তখন আমরা দেখিতে পাই, আমরা কিছুই জানি না।

উহা আমার মস্তিষ্কের সম্পূর্ণ ভ্রম হইতে পারে। আমি হয়ত কেবল স্বপ্ন দেখিতেছি মাত্র। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি, আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কহিতেছি, আবার তোমরা আমার কথা শুনিতেছ। কেহই ইহার বিপরীত প্রমাণ করিতে পারেন না। 'আমার মস্তিষ্ক' ইহাও একটি স্বপ্ন হইতে পারে, আর বাস্তবিকও ত কেহ নিজের মস্তিষ্ক কখন দেখে নাই। আমরা উহা কেবল মানিয়া লইতেছি মাত্র। সকল বিষয়েই এইরূপ। আমার নিজের শরীরও আমি মানিয়া লইতেছি মাত্র। আবার আমি জানি না, তাহাও বলিতে পারি না। জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যে এই অবস্থান, এই রহস্যময় কুহেলিকা, এই সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ —কোথায় মিশিয়াছে, কে জানে? আমরা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করিতেছি—অর্দ্ধনিদ্রিত, অর্দ্ধজাগরিত, সারা জীবন এক কুহেলিকায় আবদ্ধ—ইহাই আমাদের প্রত্যেকের দশা! সব ইন্দ্রিয়জ্ঞানের ঐ দশা। সকল দর্শনের, সকল বিজ্ঞানের, সকল প্রকার মানবীয় জ্ঞানের—যাহাদিগকে লইয়া আমাদের এত অহঙ্কার, তাহাদেরও এই দশা, এই পরিণাম। ইহাই ব্রহ্মাণ্ড!

ভূতই বল, আত্মাই বল, মনই বল, আর যাহাই বল না কেন, যে কোন নামই উহাকে দাও না কেন, ব্যাপার এই একই—আমরা বলিতে পারি না উহাদের অস্তিত্ব আছে, বলিতে পারি না যে, উহাদের অস্তিত্ব নাই। আমরা উহাদিগকে একও বলিতে পারি না, আবার বহুও বলিতে পারি না। এই আলো-আঁধারে খেলা, এই নানাবিধ দুর্ব্বলতা—অবিবিক্ত, অপৃথক, অবিভাজ্য—ইহাতে সমুদয় ঘটনাকে একবার সত্য বলিয়া বোধ হইতেছে,

আবার বোধ হইতেছে মিথ্যা—ইহা সর্ব্বদাই বর্ত্তমান—ইহাতে একবার বোধ হইতেছে আমরা জাগরিত, আবার তখনই বোধ হইতেছে নিদ্রিত। ইহাই মায়া এবং ইহা প্রকৃত ঘটনা। আবার এই মায়াতে জন্মিয়াছি, আমরা ইহাতেই জীবিত রহিয়াছি, আমরা ইহাতেই চিন্তা করিতেছি, ইহাতেই স্বপ্ন দেখিতেছি। আমরা এই মায়াতেই দার্শনিক, আমরা ইহাতেই সাধু; শুধু তাহাই নহে, আমরা এই মায়াতেই কখন দানব, কখন বা দেবতা হইতেছি। চিন্তারথে আরোহণ করিয়া যতদূর যাও, তোমার ধারণাকে উচ্চ হইতে উচ্চতর কর, উহাকে অনন্ত অথবা যে-কোন নাম দিতে ইচ্ছা হয় দাও, ঐ ধারণাও এই মায়ারই ভিতরে। ইহার বিপরীত হইতেই পারে না; আর মানুষের সমস্ত জ্ঞান—কেবল এই মায়ার সাধারণ ভাব আবিষ্কার করা, উহার প্রকৃত স্বরূপ জানা। এই মায়া নামরূপের কার্য্য। যে-কোন বস্তুরই আকৃতি আছে, যাহা কিছু তোমার মনের মধ্যে কোনপ্রকার ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দেয়, তাহাই মায়ার অন্তর্গত। জার্ম্মাণ দার্শনিকগণও বলেন—সমুদয়ই দেশকালনিমিত্তের অধীন, আর উহাই মায়া!

এক্ষণে পুনরায় সেই ঈশ্বরধারণা সম্বন্ধে কি হইল, তাহার বিচার করা যাউক। পূর্ব্বে সংসারের যে অবস্থা চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনায়াসেই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর-ধারণা—একজন ঈশ্বর আমাদিগকে অনন্তকাল ধরিয়া ভালবাসিতেছেন—ভালবাসা অবশ্য আমাদের ধারণামত—একজন অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান ও নিঃস্বার্থ পুরুষ এই জগৎ শাসন করিতেছেন, তাহা হইতেই পারে না। এই সগুণ ঈশ্বরধারণার বিরুদ্ধে

দাঁড়াইতে কবির সাহসের আবশ্যক। তোমার ন্যায়পর দয়াময় ঈশ্বর কি? কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, তিনি কি মনুষ্যরূপ বা পশুরূপ তাঁহার লক্ষ লক্ষ সন্তানের বিনাশ দেখিতেছেন না? কারণ এমন কে আছে, যে এক মুহূর্ত্তও অপরকে না মারিয়া জীবনধারণ করিতে পারে? তুমি কি সহস্র সহস্র জীবন সংহার না করিয়া একটি নিঃশ্বাসও আকর্ষণ করিতে পার? তুমি জীবিত রহিয়াছ, লক্ষ লক্ষ জীব মরিতেছে বলিয়া। তোমার জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেক নিঃশ্বাস—যাহা তুমি গ্রহণ করিতেছ, তাহা সহস্র সহস্র জীবের মৃত্যুস্বরূপ আর তোমার প্রত্যেক গতি লক্ষ লক্ষ জীবের মৃত্যুস্বরূপ। কেন তাহারা মরিবে? এ সম্বন্ধে একটি অতি প্রাচীন অযৌক্তিক কথা প্রচলিত আছে—'উহারা ত অতি নীচ জীব।' মনে কর যেন তাহাই হইল—কিন্তু উহা একটি অমীমাংসিত বিষয়। কে বলিতে পারে—কীট মনুষ্য হইতে শ্রেষ্ঠ, কি মনুষ্য কীট হইতে শ্রেষ্ঠ? কে প্রমাণ করিতে পারে—এটি ঠিক, কি ওটি ঠিক? মানুষ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে অথবা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে, তবে মানুষই শ্রেষ্ঠতর। একথা বলিলে ইহাও বলা যাইতে পারে, কীট গৃহ নির্ম্মাণ করিতে পারে না বা যন্ত্র আবিষ্কার করিতে পারে না বলিয়াই সে শ্রেষ্ঠ। এ পক্ষেও যেমন যুক্তি নাই, ও পক্ষেও তদ্রূপ নাই।

যাক সে কথা, তাহারা অতি হীন জীব ধরিয়া লইলেও, তাহারা মরিবে কেন? যদি তাহারা হীন জীব হয়, তাহাদেরই ত বাঁচা বেশী দরকার। কেন তাহারা বাঁচিবে না; তাহাদের জীবন ইন্দ্রিয়েই বেশী আবদ্ধ, সুতরাং তাহারা তোমার আমার অপেক্ষা

সহস্রগুণ সুখ-দুঃখ বোধ করে। কুক্কুর ব্যাঘ্র যেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন করে, কোন্ মানব সেরূপ স্ফূর্ত্তির সহিত ভোজন করিতে পারে? ইহার কারণ, আমাদের সমুদয় কার্য্যপ্রবৃত্তি ইন্দ্রিয়ে নহে, বুদ্ধিতে—আত্মায়। কিন্তু কুক্কুরের ইন্দ্রিয়েই প্রাণ পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারা ইন্দ্রিয়সুখের জন্য উন্মত্ত হয়; তাহারা এত আনন্দের সহিত ইন্দ্রিয়সুখ ভোগ করিবে যে, আমরা মনুষ্যেরা সেরূপ করিতে পারি না; আর এই সুখও যতখানি, দুঃখও তাহার সমপরিমাণ।

যতখানি সুখ ততখানি দুঃখ। যদি মনুষ্যেতর প্রাণীরা এত তীব্রভাবে সুখ অনুভব করিয়া থাকে, তবে ইহাও সত্য যে তাহাদের দুঃখবোধও তেমনি তীব্র—মনুষ্যের অপেক্ষা সহস্রগুণে তীব্রতর, তথাচ তাহাদিগকে মরিতে হইবে! তাহা হইলে দাঁড়াইল এই, মানুষ মরিতে যত কষ্ট অনুভব করিবে, অপর প্রাণী তাহার শতগুণ কষ্ট ভোগ করিবে; তথাপি আমাদিগকে তাহাদের কষ্টের বিষয় না ভাবিয়া তাহাদিগকে মরিতে হয়। ইহাই মায়া। আর যদি আমরা মনে করি—একজন সগুণ ঈশ্বর আছেন, যিনি ঠিক মানুষেরই মত, যিনি সব সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে ঐ যেসকল ব্যাখ্যা, মত প্রভৃতি, যাহাতে বলে মন্দের মধ্য হইতে ভাল হইতেছে, তাহা পর্য্যাপ্ত হয় না। হউক না শত শত সহস্র সহস্র উপকার—মন্দের মধ্য দিয়া উহা কেন আসিবে? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে তবে আমিও নিজ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সুখের জন্য অপরের গলা কাটিব। সুতরাং ইহা কোন যুক্তি হইল না। কেন মন্দের মধ্য দিয়া ভাল হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে, কিন্তু

এই প্রশ্নের ত উত্তর দেওয়া যায় না; ভারতীয় দর্শন ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

বেদান্ত সকল প্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর সাহসের সহিত সত্য-অন্বেষণে অগ্রসর হইয়াছেন। বেদান্ত মাঝখানে এক জায়গায় গিয়া তাঁহার অনুসন্ধান স্থগিত রাখেন নাই, আর তাঁহার পক্ষে অগ্রসর হইবার এক সুবিধাও ছিল। বেদান্তধর্ম্মের বিকাশের সময় পুরোহিত-সম্প্রদায় সত্যান্বেষিগণের মুখ বন্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম্মে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণতা ছিল—সামাজিক প্রণালীতে। এখানে (ইংলণ্ডে) সমাজ খুব স্বাধীন। ভারতে সামাজিক বিষয়ে স্বাধীনতা ছিল না, কিন্তু ধর্ম্মমতসম্বন্ধে ছিল। এখানে লোকে পোশাক যেরূপ পরুক না কেন, কিংবা যাহা ইচ্ছা করুক না কেন, কেহ কিছু বলে না বা আপত্তি করে না; কিন্তু চার্চ্চে একদিন যাওয়া বন্ধ হইলেই, নানা কথা উঠে। সত্য চিন্তার সময় তাঁহাকে আগে হাজার বার ভাবিতে হয়, সমাজ কি বলে। অপর পক্ষে, ভারতবর্ষে যদি একজন অপর জাতির হাতে খায়, অমনি সমাজ তাহাকে জাতিচ্যুত করিতে অগ্রসর হইয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষেরা, যেরূপ পোশাক পরিতেন, তাহা হইতে একটু পৃথকরূপ পোশাক পরিলেই ব্যস্, তাহার সর্ব্বনাশ! আমি শুনিয়াছি, প্রথম রেলগাড়ী দেখিতে গিয়াছিল বলিয়া একজন জাতিচ্যুত হইয়াছিল। মানিয়া লইলাম ইহা সত্য নহে, কিন্তু আমাদের সমাজের এই গতি। কিন্তু আবার ধর্ম্মবিষয়ে দেখিতে পাই—নাস্তিক, জড়বাদী, বৌদ্ধ—সকল রকমের ধর্ম্ম, সকল রকমের মত, অদ্ভুত রকমের ভয়ানক ভয়ানক মত

লোকে প্রচার করিতেছে, শিক্ষাও পাইতেছে, এমন কি, দেবপূর্ণ মন্দিরের দ্বারদেশে ব্রাহ্মণেরা জড়বাদিগণকেও দাঁড়াইয়া তাঁহাদেরই দেবতার নিন্দা করিতে দিতেছেন! ইহা তাঁহাদের ধর্ম্মের উদারভাব ও মহত্ত্বের পরিচায়কই বটে।

বুদ্ধ খুব বৃদ্ধ বয়সেই দেহরক্ষা করেন। আমার একজন আমেরিকান বৈজ্ঞানিক বন্ধু বুদ্ধদেবের জীবনচরিত পড়িতে বড় ভালবাসিতেন। তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুটি ভালবাসিতেন না; কারণ বুদ্ধদেব ক্রুশে বিদ্ধ হন নাই। কি ভ্রমাত্মক ধারণা! বড় লোক হইতে গেলেই খুন হইতে হইবে! ভারতে এরূপ ধারণা প্রচলিত ছিল না। বুদ্ধদেব তাঁহাদের দেবতা, এমন কি তাঁহাদেরই দেবদেব জগৎশাসনকর্ত্তাকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া তাঁহাদের দেশে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তথাপি তিনি বৃদ্ধবয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন। তিনি ৮৫ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন, আর তিনি অর্দ্ধেক দেশকে তাঁহার ধর্ম্মে আনিয়াছিলেন।

চার্ব্বাকেরা ভয়ানক ভয়ানক মত প্রচার করিতেন—উনবিংশ শতাব্দীতেও লোক এরূপ স্পষ্ট খোলা খাঁটী জড়বাদপ্রচারে সাহস করে না। এই চার্ব্বাকগণ মন্দিরে মন্দিরে নগরে নগরে প্রচার করিতেন—ধর্ম্ম মিথ্যা, উহা পুরোহিতগণের স্বার্থ চরিতার্থ করিবার উপায় মাত্র, বেদ ভণ্ড ধূর্ত্ত নিশাচরদিগের রচনা—ঈশ্বরও নাই, আত্মাও নাই। যদি আত্মা থাকেন, তবে স্ত্রী-পুত্রের প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া কেন তিনি ফিরিয়া আসেন না। তাঁহাদের এই ধারণা ছিল যে, যদি আত্মা থাকেন তবে মৃত্যুর পরও তাঁহার ভালবাসা প্রণয় সব থাকে, তিনি ভাল খাইতে, ভাল পরিতে চান।

এইরূপ ধারণাসম্পন্ন হইলেও, কেহই চার্ব্বাকদিগের উপরে কোন অত্যাচার করে নাই।

আমরা ধর্ম্মবিষয়ে স্বাধীনতা দিয়াছিলাম, তাহার ফলস্বরূপ এখনও ধর্ম্মজগতে আমাদের মহাশক্তি বিরাজিত। তোমরা সামাজিক বিষয়ে সেই স্বাধীনতা দিয়াছ, তাহার ফল—তোমাদের অতি সুন্দর সামাজিক প্রণালী। আমরা সামাজিক উন্নতি-বিষয়ে কিছু স্বাধীনতা দিই নাই, সুতরাং আমাদের সমাজ সঙ্কীর্ণ। তোমরা ধর্ম্মসম্বন্ধে স্বাধীনতা দাও নাই, ধর্ম্মবিষয়ে প্রচলিত মতের ব্যতিক্রম করিলেই অমনি বন্দুক, তরবারি বাহির হইত! তাহার ফল—ইউরোপে ধর্ম্মভাব সঙ্কীর্ণ। ভারতে সমাজের শৃঙ্খল খুলিয়া দিতে হইবে, আর ইউরোপে ধর্ম্মের শৃঙ্খল খুলিয়া লইতে হইবে। তবেই উন্নতি হইবে। যদি আমরা এই আধ্যাত্মিক, নৈতিক বা সামাজিক উন্নতির ভিতরে যে একত্ব রহিয়াছে তাহা ধরিতে পারি, যদি জানিতে পারি উহারা একই পদার্থের বিভিন্ন বিকাশমাত্র, তবে ধর্ম্ম আমাদের সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিবে, আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তই ধর্ম্মভাবে পূর্ণ হইবে। ধর্ম্ম আমাদের জীবনের প্রতি কার্য্যে প্রবেশ করিবে—ধর্ম্ম বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সেই সমুদয় আমাদের জীবনে তাহার প্রভাব বিস্তার করিবে। বেদান্তের আলোকে তোমরা বুঝিবে সব বিজ্ঞান কেবল ধর্ম্মেরই বিভিন্ন বিকাশ মাত্র; জগতের আর সব জিনিসও ঐরূপ।

তবে আমরা দেখিলাম, স্বাধীনতা থাকাতেই ইউরোপে এই সকল বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে; আর আমরা দেখিতে

পাই, আশ্চর্য্যের বিষয় সকল সমাজেই দুইটি বিভিন্ন দল দেখিতে পাওয়া যায়। একদল সংহারক, আর একদল সংগঠনকারী। মনে কর সমাজে কোন দোষ আছে, অমনি একদল উঠিয়া গালাগালি করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারা অনেক সময় গোঁড়ামাত্র হইয়া দাঁড়ান। সকল সমাজেই ইহাদিগকে দেখিতে পাইবে; আর স্ত্রীলোকেরাই অধিকাংশ এই চীৎকারে যোগ দিয়া থাকে, কারণ তাহারা স্বভাবতঃই ভাবপ্রবণ। যে কোন ব্যক্তি দাঁড়াইয়া কোন বিষয়ের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে, তাহারই দলবৃদ্ধি হইতে থাকে। ভাঙ্গা সহজ; একজন পাগল সহজে যাহা ইচ্ছা ভাঙ্গিতে পারে, কিন্তু তাহার পক্ষে কিছু গড়া কঠিন।

সকল দেশেই এইরূপ অসদ্বিষয়ে প্রতিবাদী কোন না কোন আকারে বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়, আর তাহারা মনে করে—কেবল গালাগালি দিয়া, কেবল দোষ প্রকাশ করিয়া দিয়াই তাহারা লোককে ভাল করিবে। তাহাদের দিক হইতে দেখিলে মনে হয় বটে তাহারা কিছু উপকার করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহারা অধিক অনিষ্টই করিয়া থাকে। কোন জিনিস ত আর একদিনে হয় না। সমাজ একদিনে নির্ম্মিত হয় নাই, আর পরিবর্ত্তন অর্থে—কারণ দূর করা। মনে কর, এখানে অনেক দোষ আছে, কেবল গালাগালি দিলে কিছু হইবে না, কিন্তু মূলে গমন করিতে হইবে। প্রথমে ঐ দোষের হেতু কি নির্ণয় কর, তারপর উহা দূর কর, তাহা হইলে উহার ফলস্বরূপ দোষ আপনিই চলিয়া যাইবে। চীৎকারে কোন ফল হইবে না; তাহাতে বরং অনিষ্টই আনয়ন করিবে।

পূর্ব্বলিখিত অপর দলের হৃদয়ে কিন্তু সহানুভূতি ছিল। তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দোষনিবারণ করিতে হইলে উহার কারণ পর্য্যন্ত গমন করিতে হইবে। বড় বড় সাধু-মহাত্মাগণকে লইয়াই এই দল গঠিত। একটি কথা তোমাদের স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, জগতের সকল শ্রেষ্ঠ আচার্য্যগণই বলিয়া গিয়াছেন—আমরা নাশ করিতে আসি নাই, পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহাকে সম্পূর্ণ করিতে আসিয়াছি। অনেক সময় লোকে আচার্য্যগণের এইরূপ মহৎ উদ্দেশ্য না বুঝিয়া তাঁহারা সাধারণ লোকের মতে সায় দিয়া তাঁহাদের অনুপযুক্ত কার্য্য করিয়াছেন, বলিয়া থাকে। এখনও অনেকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, ইঁহারা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিতেন তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে সাহস করিতেন না, ইঁহারা কতকটা কাপুরুষ ছিলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই সকল একদেশদর্শীরা, এই সকল মহাপুরুষগণের হৃদয়স্থ প্রেমের অনন্ত শক্তি অতি অল্পই বুঝিতে পারে। তাঁহারা জগতের নরনারীগণকে তাঁহাদের সন্তান-স্বরূপ দেখিতেন। তাঁহারাই যথার্থ পিতা, তাঁহারাই যথার্থ দেবতা, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই জন্য অনন্ত সহানুভূতি ও ক্ষমা ছিল—তাঁহারা সর্ব্বদা সহ্য ও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন কি করিয়া মানবসমাজ সংগঠিত হইবে; সুতরাং তাঁহারা অতি ধীরভাবে, অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত তাঁহাদের সঞ্জীবন-ঔষধ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লোককে তাঁহারা গালাগালি দেন নাই বা ভয় দেখান নাই, কিন্তু অতি ধীরভাবে তাঁহাকে এক এক পদ করিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা উপনিষদের রচয়িতা। তাঁহারা বেশ

জানিতেন—ঈশ্বরীয় প্রাচীন ধারণাসকল উন্নত নীতি-সঙ্গত ধারণার সহিত মেলে না। তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন—ঐসকল খণ্ডনকারীদের ভিতরই অধিক সত্য আছে; তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে জানিতেন—বৌদ্ধ ও নাস্তিকগণ যাহা প্রচার করিতেন, তাহার মধ্যে অনেক মহৎ মহৎ সত্য আছে; কিন্তু তাঁহারা ইহাও জানিতেন—যাহারা পূর্ব্বমতের সহিত কোন সম্বন্ধ রক্ষা না করিয়া নূতন মত স্থাপন করিতে চাহে, যাহারা যে সূত্রে মালা গ্রথিত তাহাকে ছিন্ন করিতে চাহে, যাহারা শূন্যের উপর নূতন সমাজ গঠন করিতে চাহে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইবে।

আমরা কখনই নূতন কিছু নির্ম্মাণ করিতে পারি না, আমরা কেবল পুরাতন বস্তুর স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারি মাত্র। বীজই বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সুতরাং আমাদিগকে ধৈর্য্যের সহিত শান্তভাবে লোকের সত্যানুসন্ধানের জন্য নিযুক্ত শক্তিকে পরিচালন করিতে হইবে, যে সত্য পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত তাহারই সম্পূর্ণ ভাব জানিতে হইবে। সুতরাং ঐ প্রাচীন ঈশ্বরধারণা বর্ত্তমান কালের অনুপযুক্ত বলিয়া একেবারে উড়াইয়া না দিয়া, তাঁহারা উহার মধ্যে যাহা সত্য আছে তাহার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন; তাহার ফল বেদান্তদর্শন। তাঁহারা প্রাচীন দেবতাসকল ও জগতের শাস্তা এক ঈশ্বরের ভাব হইতেও উচ্চতর ভাবসকল আবিষ্কার করিতে লাগিলেন—এইরূপে তাঁহারা যে উচ্চতম সত্য আবিষ্কার করিলেন, তাহাই নির্গুণ পূর্ণব্রহ্ম নামে অভিহিত—এই নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণায় তাঁহারা জগতের মধ্যে এক অখণ্ড সত্তা দেখিতে পাইয়াছিলেন।

"যিনি এই বহুত্বপূর্ণ জগতে সেই এক অখণ্ডস্বরূপকে দেখিতে পান, যিনি এই মরজগতে সেই এক অনন্ত জীবন দেখিতে পান, যিনি এই জড়তা ও অজ্ঞানপূর্ণ জগতে সেই একস্বরূপকে দেখিতে পান, তাঁহারই শাশ্বতী শান্তি, আর কাহারও নহে।"

# মায়া ও মুক্তি

কবি বলেন, "আমরা জগতে প্রবেশ করিবার সময় আমাদের পশ্চাদ্দেশে যেন হিরণ্ময় জলদজাল লইয়া প্রবেশ করি।" কিন্তু সত্য কথা বলিতে গেলে, আমরা সকলেই এরূপ মহিমমণ্ডিত হইয়া সংসারে প্রবেশ করি না; আমাদের অনেকেই কুজ্ঝটিকার কালিমা পশ্চাতে টানিয়া জগতে প্রবেশ করে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমরা—আমাদের মধ্যে সকলেই যেন যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধের জন্য প্রেরিত হইয়াছি। কাঁদিয়া আমাদিগকে এই জগতে প্রবেশ করিতে হইবে—যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া আপনার পথ করিয়া লইতে হইবে—এই অনন্ত জীবন-সমুদ্রের মধ্যে পশ্চাতে কোন চিহ্ন পর্য্যন্ত না রাখিয়া পথ করিয়া লইতে হইবে—সম্মুখে আমবা অগ্রসর, পশ্চাতে অনন্ত যুগ পড়িয়া রহিয়াছে, সম্মুখেও অনন্ত। এইরূপে আমরা চলিতে থাকি, অবশেষে মৃত্যু আসিয়া আমাদিগকে এই ক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়া দেয়—জয়ী বা পরাজিত কিছুই নিশ্চয় নাই;—ইহাই মায়া।

বালকের হৃদয়ে আশা বলবতী। বালকের বিস্ফারিত নয়ন-সমক্ষে সমুদয়ই যেন একটি সোনার ছবি বলিয়া প্রতিভাত হয়; সে ভাবে—আমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে। কিন্তু যেই সে অগ্রসর হয়, অমনি প্রতি পদক্ষেপে প্রকৃতি বজ্রদৃঢ় প্রাচীর-

স্বরূপে তাহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হন। বার বার এই প্রাচীর ভঙ্গ করিবার উদ্দেশ্যে সে বেগে তদুপরি উৎপতিত হইতে পারে। সারা জীবন যেমন সে অগ্রসর হয়, অমনি তাহার আদর্শ যেন তাহার সম্মুখ হইতে সরিয়া সরিয়া যায়—শেষে মৃত্যু আসিয়া হয় ত নিস্তার;—ইহাই মায়া।

বৈজ্ঞানিক উঠিলেন—মহা জ্ঞানপিপাসু। তাঁহার পক্ষে এমন কিছুই নাই যাহা তিনি না ত্যাগ করিতে পারেন, কোন চেষ্টাতেই তাঁহাকে নিরুৎসাহ করিতে পারে না। তিনি ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া প্রকৃতির একটির পর একটি গুপ্ততত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন—প্রকৃতির অন্তস্তল হইতে আভ্যন্তরীণ গূঢ় রহস্যসকল উদ্ঘাটন করিতেছেন—কিন্তু ইহার উদ্দেশ্য কি? এ সব করিবার উদ্দেশ্য কি? আমরা এই বৈজ্ঞানিকের গৌরব করিব কেন? কেন তিনি যশোলাভ করিবেন? প্রকৃতি কি মানুষ যতদূর জানিতে পারে তদপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক জানিতে পারেন না? তাহা হইলেও তিনি কি জড় নহেন? জড়ের অনুকরণে গৌরব কি? বজ্র যত প্রভূত পরিমাণে তড়িৎশক্তিসন্নিবিষ্টই হউক না কেন, প্রকৃতি উহাকে যতদূর ইচ্ছা ততদূর নিক্ষেপ করিতে পারেন। যদি কোন মানুষ তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারে, তবে আমরা তাহাকে একেবারে আকাশে তুলিয়া দিই। কিন্তু ইহার কারণ কি? প্রকৃতির অনুকরণ, মৃত্যুর অনুকরণ, জাড্যের অনুকরণ, অচেতনের অনুকরণের জন্য কেন তাঁহার প্রশংসা করিব?

মাধ্যাকর্ষণশক্তি অতি বৃহত্তম পদার্থকে পর্য্যন্ত খণ্ড বিখণ্ড

করিয়া ফেলিতে পারে, তথাপি উহা জড়শক্তি। জড়ের অনুকরণে কি ফল? তথাপি আমরা সারা জীবন কেবল উহার জন্যই চেষ্টা করিতেছি;—ইহাই মায়া।

ইন্দ্রিয়গণ মানুষকে টানিয়া বাহিরে লইয়া যায়; যেখানে কোনক্রমে সুখ পাওয়া যায় না, মানুষে সেখানে সুখের অন্বেষণ করিতেছে। অনন্ত যুগ ধরিয়া আমরা সকলেই এই উপদেশ পাইতেছি—এসব বৃথা; কিন্তু আমরা শিখিতে পারি না। নিজে না ঠেকিলে শিখাও অসম্ভব। ঠেকিতে হইবে—হয় ত তীব্র আঘাত পাইব। তাহাতেই আমরা কি শিখিব? না, তখনও নহে। পতঙ্গ যেমন পুনঃ পুনঃ অগ্নির অভিমুখে ধাবমান হয়, আমরাও তেমনি পুনঃ পুনঃ বিষয়সমূহের দিকে বেগে যাইতেছি—যদি কিছু সুখ পাই। ফিরিয়া ফিরিয়া আবার নূতন উৎসাহে যাইতেছি। এইরূপে আমরা অগ্রসর হই। শেষে প্রতারিত ও ভগ্নহস্তপদ হইয়া মরিয়া যাই—ইহাই মায়া।

আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আমরা জগতের রহস্য-মীমাংসার চেষ্টা করিতেছি—আমরা এই জিজ্ঞাসা, এই অনুসন্ধান-প্রবৃত্তিকে বন্ধ করিয়া রাখিতে পারি না; কিন্তু আমাদিগের ইহা জানিয়া রাখা উচিত—জ্ঞান লব্ধব্য বস্তু নহে—কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই অনাদি অনন্ত কালের প্রাচীর আসিয়া মধ্যে ব্যবধান-স্বরূপে দণ্ডায়মান হয়, আমরা উহা লঙ্ঘন করিতে পারি না। কয়েক পদ অগ্রসর হইলেই অসীম দেশের ব্যবধান আসিয়া উপস্থিত হয়—উহাকে অতিক্রম করা যায় না; সমুদয়ই অনতিক্রমণীয়ভাবে কার্য্যকারণরূপ প্রাচীরে সীমাবদ্ধ। আমরা উহাদিগকে

ছাড়াইয়া যাইতে পারি না। তথাপি আমরা চেষ্টা করিয়া থাকি, চেষ্টা আমাদিগকে করিতেই হয়,—ইহাই মায়া।

প্রতি নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের প্রতি আঘাতে, আমাদের প্রত্যেক গতিতে আমরা বিবেচনা করি—আমরা স্বাধীন, আবার তন্মুহূর্ত্তেই আমরা দেখিতে পাই—আমরা স্বাধীন নই। ক্রীতদাস, প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা—শরীর, মন, সর্ব্ববিধ চিন্তা এবং সকল ভাবেই প্রকৃতির ক্রীতদাস আমরা;—ইহাই মায়া।

এমন জননীই নাই, যিনি তাঁহার সন্তানকে অদ্ভুত শিশু—মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস না করেন। তিনি সেই ছেলেটিকে লইয়াই মাতিয়া থাকেন, সেই ছেলেটির উপর তাঁহার সমুদয় প্রাণটি পড়িয়া থাকে। ছেলেটি বড় হইল—হয়ত মহা মাতাল, পশুতুল্য হইয়া উঠিল, জননীর প্রতি অসদ্ব্যবহার করিতে লাগিল। যতই এই অসদ্ব্যবহার বাড়িতে থাকে, মায়ের ভালবাসাও তত বাড়িতে থাকে। জগৎ উহাকে মায়ের নিঃস্বার্থ ভালবাসা বলিয়া খুব প্রশংসা করে; তাহাদের স্বপ্নেও মনে উদিত হয় না যে, সেই জননী জন্মাবধি একটি ক্রীতদাসীতুল্য মাত্র—তিনি না ভালবাসিয়া থাকিতে পারেন না। সহস্রবার তাঁহার ইচ্ছা হয়—তিনি উহা ত্যাগ করিবেন, কিন্তু তিনি পারেন না। তিনি কতকগুলি পুষ্পরাশি উহার উপর ছড়াইয়া, উহাকেই আশ্চর্য্য ভালবাসা বলিয়া ব্যাখ্যা করেন;—ইহাই মায়া।

জগতে আমরা সকলেই এইরূপ। নারদও একদিন শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, "প্রভু, তোমার মায়া কিরূপ, তাহা দেখাও।" কয়েক দিন গত হইলে কৃষ্ণ নারদকে সঙ্গে করিয়া একটি অরণ্যে লইয়া

গেলেন। অনেক দূর গিয়া কৃষ্ণ বলিলেন, "নারদ, আমি বড় তৃষ্ণার্ত্ত, একটু জল আনিয়া দিতে পার?" নারদ বলিলেন, "প্রভু, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করুন; আমি জল লইয়া আসিতেছি।" এই বলিয়া নারদ চলিয়া গেলেন। ঐ স্থান হইতে কিয়দ্দূরে একটি গ্রাম ছিল; নারদ সেই গ্রামে জলের অনুসন্ধানে প্রবেশ করিলেন। তিনি একটি দ্বারে গিয়া ঘা মারিলেন, দ্বার উন্মুক্ত হইল, একটি পরমা সুন্দরী কন্যা তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নারদ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার প্রভু যে তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তিনি যে তৃষ্ণার্ত্ত, হয়ত তৃষ্ণায় তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইবার উপক্রম হইয়াছে, নারদ এ সমুদয় ভুলিয়া গেলেন। তিনি সব ভুলিয়া সেই কন্যাটির সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন, ক্রমে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয়সঞ্চার হইল। তখন নারদ সেই কন্যার পিতার নিকট ঐ কন্যার জন্য প্রার্থনা করিলেন—বিবাহ হইয়া গেল, তাঁহারা সেই গ্রামে বাস করিতে লাগিলেন, ক্রমে তাঁহাদের সন্তান-সন্ততি হইল। এইরূপে দ্বাদশবর্ষ অতিবাহিত হইল। তাঁহার শ্বশুরের মৃত্যু হইল—তিনি শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং পুত্র, কলত্র, ভূমি, পশু, সম্পত্তি, গৃহ প্রভৃতি লইয়া বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে লাগিলেন। অন্ততঃ তাঁহার বোধ হইতে লাগিল—তিনি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছেন। এই সময় সেই দেশে বন্যা আসিল। একদিন রাত্রিকালে নদী বেলা অতিক্রম করিয়া উভয় কূল প্লাবিত করিল, আর সমুদয় গ্রামটিই জলমগ্ন হইল। অনেক বাড়ী পড়িতে লাগিল—মানুষ পশু সব

ভাসিয়া গিয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল, স্রোতের বেগে সবই ভাসিয়া যাইতে লাগিল। নারদকে পলায়ন করিতে হইল। এক হাতে তিনি স্ত্রীকে ধরিলেন, অপর হস্ত দ্বারা দুইটি ছেলেকে ধরিলেন, আর একটি ছেলেকে কাঁধে লইয়া এই ভয়ঙ্কর নদী হাঁটিয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেই তরঙ্গের বেগ অত্যন্ত অধিক বোধ হইল। নারদ স্কন্ধস্থ শিশুটিকে কোনক্রমে রাখিতে পারিলেন না; সে পড়িয়া গিয়া তরঙ্গে ভাসিয়া গেল। নিরাশায়, দুঃখে নারদ চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তাহাকে রক্ষা করিতে গিয়া আর একজন—যাহার হাত ধরিয়া ছিলেন, সে হাত ফস্কাইয়া ডুবিয়া গেল। তাঁহার পত্নীকে তিনি তাঁহার শরীরের সমুদয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া ধরিয়াছিলেন, তরঙ্গের বেগ অবশেষে তাহাকেও তাঁহার হাত ছিনাইয়া লইল, তিনি স্বয়ং কূলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মৃত্তিকায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন এবং অতি কাতরস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এমন সময় কে যেন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে মৃদু আঘাত করিল, কে যেন বলিল, "বৎস, কই, জল কই? তুমি জল আনিতে গিয়াছিলে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছি। তুমি আধ ঘণ্টা হইল গিয়াছ।" আধ ঘণ্টা! নারদের মনে দ্বাদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইয়াছিল, আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত দৃশ্য তাঁহার মনের ভিতর দিয়া চলিয়াছিল—ইহাই মায়া। কোন না কোনরূপে আমরা এই মায়ার ভিতর রহিয়াছি। এ ব্যাপার বুঝা বড় কঠিন—বিষয়টিও বড় জটিল। ইহার তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই—ব্যাপার বড়

ভয়ানক; সকল দেশেই মহাপুরুষগণ এই তত্ত্ব প্রচার করিয়াছেন, সকল দেশের লোকেই এই তত্ত্ব শিক্ষা পাইয়াছে, কিন্তু খুব অল্প লোকেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছে; তাহার কারণ এই—নিজে না ভুগিলে, নিজে না ঠেকিলে আমরা ইহা বিশ্বাস করিতে পারি না। বাস্তবিক বলিতে গেলে—সমুদয়ই বৃথা, সমুদয়ই মিথ্যা।

সর্ব্বসংহারক কাল আসিয়া সকলকেই গ্রাস করেন, কিছু আর অবশিষ্ট রাখেন না। তিনি পাপকে গ্রাস করেন, পাপীকে গ্রাস করেন; রাজাকে, প্রজাকে, সুন্দর, কুৎসিৎ সকলকেই গ্রাস করেন; কাহাকেও ছাড়েন না। সবই সেই এক চরমগতি—বিনাশের দিকে অগ্রসর হইতেছে। আমাদের জ্ঞান, শিল্প, বিজ্ঞান—সবই সেই এক অনিবার্য্যগতি মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছে। কেহই ঐ তরঙ্গের গতিরোধে সমর্থ নহে, কেহই ঐ বিনাশাভিমুখী গতিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও রোধ করিয়া রাখিতে পারে না। আমরা উহাকে ভুলিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতে পারি, যেমন কোন দেশে মহামারী উপস্থিত হইলে মদ্যপান, নৃত্য ও অন্যান্য বৃথা চেষ্টা করিয়া লোকে সমুদয় ভুলিতে চেষ্টা করিয়া পক্ষাঘাতগ্রস্তের ন্যায় গতিশক্তিরহিত হইয়া থাকে। আমরাও এইরূপে এই মৃত্যুচিন্তাকে ভুলিবার জন্য অতি কঠোর চেষ্টা করিতেছি—সর্ব্ব প্রকার ইন্দ্রিয়সুখের দ্বারা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু তাহাতে উহার নিবৃত্তি হয় না।

লোকের সম্মুখে দুইটি পথ আছে। তন্মধ্যে একটি পথ সকলেই জানেন, তাহা এই—জগতে দুঃখ আছে, কষ্ট আছে, সব সত্য

কিন্তু ও সম্বন্ধে মোটেই ভাবিও না! 'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।' দুঃখ আছে বটে, কিন্তু ওদিকে নজর দিও না। যা একটু আধটু সুখ পাও, তাহা ভোগ করিয়া লও, এই সংসারচরিত্রের ছায়াময় অংশের দিকে লক্ষ্য করিও না—কেবল আলোকময় অংশের দিকেই লক্ষ্য করিও। এই মতে কিছু সত্য আছে বটে, কিন্তু ইহাতে ভয়ানক বিপদাশঙ্কাও আছে। ইহার মধ্যে সত্য এইটুকু যে, ইহা আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত রাখে। আশা ও এইরূপ একটা প্রত্যক্ষ আদর্শ আমাদিগকে কার্যে প্রবৃত্ত ও উৎসাহিত করে বটে, কিন্তু উহাতে এই এক বিপদ আছে যে, শেষে হতাশ হইয়া সব চেষ্টা ছাড়িয়া দিতে হয়। যাঁহারা বলেন, "সংসারকে যেমন দেখিতেছ, তেমনই গ্রহণ কর; যতদূর স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার, থাক; দুঃখকষ্ট সমুদয় আসিলেও তাহাতে সন্তুষ্ট থাক; আঘাত পাইলে বল—উহারা আঘাত নহে, পুষ্পবৃষ্টি; দাসবৎ পরিচালিত হইলেও বল—আমি মুক্ত, স্বাধীন; অপরের নিকট এবং নিজের নিকট ক্রমাগত মিথ্যা বল, কারণ সংসারে থাকিবার, জীবনধারণ করিবার ইহাই একমাত্র উপায়" —তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া অবশেষে ইহা করিতে হয়। ইহাকেই পাকা সাংসারিক জ্ঞান বলে, আর এই উনবিংশ শতাব্দীতে এই জ্ঞান যত সাধারণ, কোনকালে উহা এত সাধারণ ছিল না; তাহার কারণ এই—লোক এখন যেমন তীব্র আঘাত পাইয়া থাকে, কোন কালে এত তীব্র আঘাত পাইত না, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কখন এত অধিক তীব্র ছিল না; মানুষ এক্ষণে তাহার অপর ভ্রাতার প্রতি যত নিষ্ঠুর, তত কখন ছিল না, আর এই জন্যই এক্ষণে এই সান্ত্বনা

প্রদত্ত হইয়া থাকে। বর্ত্তমানকালে এই উপদেশই অধিক পরিমাণে প্রদত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু এই উপদেশে এখন কোন ফল হয় না, কোনকালেই হয় না। গলিত শবকে আর কতকগুলি ফুল চাপা দিয়া রাখা যায় না—অসম্ভব বেশী দিন চলে না; একদিন ঐ ফুলগুলি সব উড়িয়া যাইবে, তখন সেই শব পূর্ব্বাপেক্ষা বীভৎসরূপে প্রতিভাত হইবে। আমাদের সমুদয় জীবনও এই প্রকার। আমরা আমাদের পুরাতন পচা ঘা সোনার কাপড়ে মুড়িয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু একদিন আসিবে যখন সেই সোনার কাপড় খসিয়া পড়িবে, আর সেই ক্ষত অতি বীভৎসভাবে নয়নসমক্ষে প্রকাশিত হইবে। তবে কি কিছু আশা নাই? এ কথা সত্য যে, আমরা সকলেই মায়ার দাস, আমরা সকলেই মায়ায় জন্মগ্রহণ করিয়াছি, মায়াতেই আমরা জীবিত।

তবে কি কোন উপায় নাই, কোন আশা নাই? আমরা যে সকলেই অতি দুর্দ্দশাপন্ন, এই জগৎ যে বাস্তবিক একটি কারাগার, আমাদের পূর্ব্বপ্রাপ্ত মহিমার ছটাও যে একটি কারাগৃহমাত্র, আমাদের বুদ্ধি এবং মনও যে কারাস্বরূপ, তাহা শত শত যুগ ধরিয়া লোকে জ্ঞাত আছে। মানুষ যাহাই বলুক না কেন, এমন লোকই নাই, যিনি কোন না কোন সময়ে ইহা প্রাণে প্রাণে অনুভব না করিয়াছেন। বৃদ্ধেরা এটি আরও তীব্রভাবে অনুভব করিয়া থাকে, কারণ তাহাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে; প্রকৃতির মিথ্যা ভাষা তাহাদিগকে বড় অধিক ঠকাইতে পারে না। এই বন্ধন-অতিক্রমের উপায় কি? এই বন্ধনগুলিকে অতিক্রম করিবার কি কোন উপায় নাই? আমরা দেখিতেছি,

এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার, এই বন্ধন আমাদের সম্মুখে পশ্চাতে সর্ব্বত্র থাকিলেও, এই দুঃখকষ্টের মধ্যেই, এই জগতেই, যেখানে জীবন ও মৃত্যু একার্থক, এখানেও এক মহাবাণী সকল যুগে, সকল দেশে, সকল ব্যক্তির হৃদয়াভ্যন্তর দিয়া যেন উত্থিত হইতেছে—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" অর্থাৎ আমার এই দৈবী ত্রিগুণময়ী মায়া অতি কষ্টে অতিক্রম করা যায়। যাঁহারা আমার শরণাপন্ন হন, তাঁহারা এই মায়া অতিক্রম করেন। 'হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোকগণ, আইস, আমি তোমাদিগকে আশ্রয় দিব'—এই বাণীই আমাদিগকে ক্রমাগত সম্মুখে অগ্রসর করিতেছে। মানুষ ইহা শুনিয়াছে এবং অনন্ত যুগ ইহা শুনিতেছে। যখন মানুষের সবই যায় যায় হইয়াছে বোধ হয়, যখন আশা ভঙ্গ হইতে থাকে, যখন মানুষের নিজ বলের প্রতি বিশ্বাস নষ্ট হইয়া যায়, যখন সমুদয়ই যেন তাহার আঙ্গুল গলিয়া পলাইতে থাকে এবং জীবন একটি ভগ্নস্তূপে পরিণত হয় মাত্র, তখন সে এই বাণী শুনিতে পায়,—আর ইহাই ধর্ম্ম।

তাহা হইলেই হইল, একদিকে এই অভয়বাণী, এই আশাপ্রদ বাক্য যে,—এই সমুদয়ই কিছুই নয়, এই সমুদয়ই মায়া, ইহা উপলব্ধি কর, কিন্তু মায়ার বাহিরে যাইবার পথ আছে। অপর দিকে, আমাদের সাংসারিক ব্যক্তিগণ বলেন—"ধর্ম্ম, দর্শন এ সব বাজে জিনিস লইয়া মাথা ঘামাইও না। জগতে বাস কর; এই জগৎ ঘোর অশুভপূর্ণ বটে, কিন্তু যতদূর পার, ইহার সদ্ব্যবহার করিয়া লও।" সাদা কথায় ইহার অর্থ এই, ভণ্ডভাবে দিবারাত্র প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর—তোমার

কতগুলি যতদূর পার ঢাকিয়া রাখ। তালির উপর তালি দাও, শেষে আদত জিনিসটিই যেন নষ্ট হইয়া যায়, আর তুমি কেবল একটি 'তালির উপর তালি' হইয়া যাও। ইহাকেই বলে—সাংসারিক জীবন। যাহারা এইরূপ জোড়াতাড়া তালি লইয়া সন্তুষ্ট, তাহারা কখন ধর্ম্মলাভ করিতে পারিবে না! যখন জীবনের বর্ত্তমান অবস্থায় ভয়ানক অশান্তি উপস্থিত হয়, যখন নিজের জীবনের উপরও আর মমতা থাকে না, যখন এইরূপ তালি দেওয়ার উপর ভয়ানক ঘৃণা উপস্থিত হয়, যখন মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার উপর ভয়ানক বিতৃষ্ণা জন্মায়, তখনই ধর্ম্মের আরম্ভ হয়। সেই কেবল প্রকৃত ধার্ম্মিক হইবার যোগ্য, যে বুদ্ধদেব যেমন বোধিবৃক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া দৃঢ়স্বরে যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রাণে প্রাণে বলিতে পারে। সংসারী হইবার ইচ্ছা তাঁহারও হৃদয়ে একবার উদিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার এই অবস্থা—তিনি স্পষ্ট বুঝিতেছেন এই সাংসারিক জীবনটা একেবারে ভুল; অথচ ইহা হইতে বাহির হইবার কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারিতেছেন না। প্রলোভন একবার তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল; সে যেন বলিল—সত্যের অনুসন্ধান পরিত্যাগ কর, সংসারে ফিরিয়া গিয়া প্রাচীন প্রতারণাপূর্ণ জীবন যাপন কর, সকল জিনিসকে তাহার ভুল নাম দিয়া ডাক, নিজের নিকট ও সকলের নিকট দিনরাত মিথ্যা বলিতে থাক—এই প্রলোভন তাঁহার নিকট আবার আসিয়াছিল, কিন্তু সেই মহাবীর অতুল বিক্রমে তৎক্ষণাৎ উহা জয় করিয়া ফেলিলেন; তিনি বলিলেন—"অজ্ঞানভাবে কেবল খাইয়া পরিয়া জীবনযাপন অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়ঃ; পরাজিত হইয়া জীবনযাপন

অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মরা শ্রেয়ঃ।" ইহাই ধর্ম্মের ভিত্তি। যখন মানুষ এই ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান হয়, তখন সে সত্যলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, সে ঈশ্বরলাভ করিবার পথে চলিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ধার্ম্মিক হইবার জন্যও প্রথমেই এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা আবশ্যক। ~~আমি নিজের পথ নিজে করিয়া লইব~~। সত্য জানিব অথবা এই চেষ্টায় প্রাণ দিব। কারণ সংসারের দিকে ত আর কিছু পাইবার আশা নাই, ইহা শূন্যস্বরূপ—ইহা দিবারাত্র অন্তর্হিত হইতেছে। অদ্যকার সুন্দর আশাপূর্ণ তরুণ পুরুষ কল্যকার বৃদ্ধ। আশা আনন্দ সুখ—এ সকল মুকুলসমূহের ন্যায় কল্যকার শিশির-পাতেই নষ্ট হইবে। এ ত এই দিকের কথা; অপর দিকে জয়ের প্রলোভন রহিয়াছে—জীবনের সমুদয় অশুভ জয় করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এমন কি, জীবন ও জগতের উপর পর্য্যন্ত জয়ী হইবার আশা রহিয়াছে; এই উপায়েই মানুষ নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে। অতএব যাহারা এই জয়লাভের জন্য, সত্যের জন্য, ধর্ম্মের জন্য চেষ্টা করিতেছে, তাহারাই সত্যপথে রহিয়াছে আর বেদসকল ইহাই প্রচার করেন—'নিরাশ হইও না; পথ বড় কঠিন—যেন ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম; তাহা হইলেও নিরাশ হইও না; উঠ, জাগ এবং তোমাদের চরম আদর্শে উপনীত হও।'

বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহ যে আকারেই মানুষের নিকট আপন স্বরূপ অভিব্যক্ত করুক না কেন, তাহাদের সকলেরই এই এক মূলভিত্তি। সকল ধর্ম্মই জগৎ হইতে বাহিরে যাইবার অর্থাৎ মুক্তির উপদেশ দিতেছে। এই সকল বিভিন্ন ধর্ম্মের উদ্দেশ্য—সংসার ও ধর্ম্মের মধ্যে একটা আপস করিয়া লওয়া নহে, বরং ধর্ম্মকে নিজ আদর্শে

দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করা, সংসারের সঙ্গে আপস করিয়া ঐ আদর্শকে ছোট করিয়া ফেলা নহে। প্রত্যেক ধর্ম্মই ইহা প্রচার করিতেছেন, আর বেদান্তের কর্ত্তব্য—বিভিন্ন ধর্ম্মভাবসকলের সামঞ্জস্যসাধন; যেমন এইমাত্র আমরা দেখিলাম, এই মুক্তিতত্ত্বে জগতের উচ্চতম ও নিম্নতম সকল ধর্ম্মের মধ্যে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। আমরা যাহাকে অত্যন্ত ঘৃণিত কুসংস্কার বলি, আবার যাহা সর্ব্বোচ্চ দর্শন, সকলগুলিরই এই এক সাধারণ ভিত্তি যে, তাহারা সকলেই ঐ এক প্রকার সঙ্কট হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দেয় এবং এইসকল ধর্ম্মের অধিকাংশগুলিতেই প্রপঞ্চাতীত পুরুষবিশেষের—প্রাকৃতিক নিয়ম দ্বারা আবদ্ধ নহেন এরূপ অর্থাৎ নিত্যমুক্ত পুরুষবিশেষের—সাহায্যে এই মুক্তিলাভ করিতে হয়। এই মুক্ত পুরুষের স্বরূপ সম্বন্ধে নানা গোলযোগ ও মতভেদ সত্ত্বেও সেই ব্রহ্ম সগুণ বা নির্গুণ, মানুষের ন্যায় তিনি জ্ঞানসম্পন্ন কি না, তিনি পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীব—এইরূপ অনন্ত বিচারসত্ত্বেও বিভিন্ন মতের অতি প্রবল বিরোধসত্ত্বেও উহাদের সকলের মধ্যেই একত্বের যে সুবর্ণসূত্র উহাদিগকে গ্রথিত করিয়া রাখিয়াছে তাহা আমরা দেখিতে পাই; সুতরাং ঐ সকল বিভিন্নতা বা বিরোধ আমাদের ভীতি উৎপাদন করে না; আর এই বেদান্তদর্শনে এই সুবর্ণসূত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, আমাদের দর্শনসমক্ষে একটু একটু করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে আর ইহাতে প্রথমেই এই তত্ত্ব উপলব্ধ হয় যে, আমরা সকলেই বিভিন্ন পথ দ্বারা সেই এক মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। সকল ধর্ম্মের এই সাধারণ ভাব।

আমাদের সুখ-দুঃখ, বিপদ-কষ্ট—সকল অবস্থার মধ্যেই আমরা

এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিতে পাই যে, আমরা ধীরে ধীরে সকলেই সেই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছি। প্রশ্ন হইল,—এই জগৎ বাস্তবিক কি? কোথা হইতে ইহার উৎপত্তি, কোথায়ই বা ইহার লয়? আর ইহার উত্তর প্রদত্ত হইল—মুক্তিতে ইহার উৎপত্তি, মুক্তিতে বিশ্রাম এবং অবশেষে মুক্তিতেই ইহার লয়। এই যে মুক্তির ভাব, আমরা যে বাস্তবিক মুক্ত এই আশ্চর্য্য ভাব ছাড়িয়া আমরা এক মুহূর্ত্তও চলিতে পারি না, এই ভাব ব্যতীত তোমার সকল কার্য্য, এমন কি তোমার জীবন পর্য্যন্ত বৃথা। প্রতি মুহূর্ত্তে প্রকৃতি আমাদিগকে দাস বলিয়া প্রতিপন্ন করিতেছেন, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গেই এই অপর ভাবও আমাদের মনে উদিত হইতেছে যে, তথাপি আমরা মুক্ত। প্রতি মুহূর্ত্তে যেন আমরা মায়া দ্বারা আহত হইয়া বদ্ধ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছি, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই সেই আঘাতের সঙ্গে সঙ্গেই, 'আমরা বদ্ধ' এই ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আর এক ভাবও আমাদের উপলব্ধ হইতেছে যে, আমরা মুক্ত। ভিতরে কিছু যেন আমাদিগকে বলিয়া দিতেছে যে, আমরা মুক্ত। কিন্তু এই মুক্তিকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিতে, আমাদের মুক্ত স্বভাবকে প্রকাশ করিতে যে সকল বাধা উপস্থিত হয়, তাহাও একরূপ অনতিক্রমণীয়। তথাপি ভিতরে, আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে উহা যেন সর্ব্বদা বলিতেছে—আমি মুক্ত, আমি মুক্ত। আর যদি তুমি জগতের বিভিন্ন ধর্ম্মসকল আলোচনা করিয়া দেখ, তবে তুমি বুঝিবে—তাহাদের সকলগুলিতেই কোন না কোনরূপে এই ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। শুধু ধর্ম্ম নয়—ধর্ম্ম শব্দটিকে আপনারা অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করিবেন না—সমগ্র সামাজিক

জীবনটি কেবল এই এক মুক্তভাবের অভিব্যক্তিমাত্র। সকল সামাজিক গতিই সেই এক মুক্তভাবের বিভিন্ন প্রকাশ মাত্র। যেন সকলেই জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বর শুনিয়াছে—যে স্বর দিবারাত্র বলিতেছে, 'পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত সকলে আমার নিকট আইস।' একরূপ ভাষায় বা একরূপ ভঙ্গীতে উহা প্রকাশিত না হইতে পারে, কিন্তু মুক্তির জন্য আহ্বানকারিণী সেই বাণী কোন না কোনরূপে আমাদেব সহিত বর্তমান রহিয়াছে। আমরা এখানে যে জন্মিয়াছি, তাহাও ঐ বাণীর কারণে; আমাদের প্রত্যেক গতিই উহার জন্য। আমরা জানি বা না জানি, আমরা সকলেই মুক্তির দিকে চলিয়াছি, আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছি। যেমন সেই মোহন বংশীবাদক (The Pied Piper) বংশীধ্বনি দ্বারা গ্রামের বালকগণকে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আমরাও তেমনি না জানিয়াই সেই মোহন বংশীর অনুসরণ করিতেছি।

আমরা নীতিপরায়ণ কেন? না, আমাদিগকে অবশ্যই সেই বাণীর অনুসরণ করিতে হয়। কেবল জীবাত্মা নহেন, কিন্তু সেই নিম্নতম জড়পরমাণু হইতে উচ্চতম মানব পর্যন্ত সকলেই সে স্বর শুনিয়াছেন, আর ঐ স্বরে গা ঢালিয়া দিবার জন্য চাহিয়াছেন। আর এই চেষ্টায় পরস্পর মিলিত হইতেছে, এ উহাকে ঠেলিয়া দিতেছে আর ইহা হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আনন্দ, চেষ্টা, সুখ, জীবন, মৃত্যু —সমুদয়ের উৎপত্তি; আর এই অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঐ বাণীর সমীপে উপস্থিত হইবার জন্য উন্মত্ত চেষ্টার ফল বই আর কিছুই নয়। আমরা ইহাই করিয়া চলিয়াছি। ইহাই ব্যক্ত প্রকৃতির পরিচয়।

এই বাণী শুনিতে পাইলে কি হয়? তখন আমাদের সম্মুখস্থ দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখনই তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পার, বুঝিতে পার উহা কি, তখন তোমার সম্মুখস্থ সমুদয় দৃশ্যই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এই জগৎ, যাহা পূর্ব্বে মায়ার বীভৎস যুদ্ধক্ষেত্র ছিল, তাহা আর কিছুতে—অপেক্ষাকৃত সৌন্দর্য্যপূর্ণ, সুন্দরতর কিছুতে—পরিণত হইয়া যায়। প্রকৃতিকে অভিসম্পাত করিবার তখন আর আমাদের কিছু প্রয়োজন থাকে না, জগৎ অতি বীভৎস অথবা এই সমুদয়ই বৃথা ইহা বলিবারও আমাদের প্রয়োজন থাকে না, আমাদের কাঁদিবার অথবা বিলাপ করিবারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যখন তুমি ঐ স্বরকে জানিতে পার, তখনই তুমি বুঝিতে পার—এই সকল চেষ্টা, এই সকল যুদ্ধ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা, এই গোলমাল, এই নিষ্ঠুরতা, এইসকল ক্ষুদ্র সুখাদির প্রয়োজন কি। তখন বুঝিতে পারা যায় যে, উহারা প্রকৃতির স্বভাববশতঃই ঘটিয়া থাকে—আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সেই স্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছি বলিয়াই এইগুলি ঘটিয়া থাকে! অতএব সমুদয় মানব-জীবন, সমুদয় প্রকৃতি কেবল সেই মুক্তভাবকে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছে মাত্র; সূর্য্যও সেইদিকে চলিয়াছে, পৃথিবীও তজ্জন্য সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, চন্দ্রও তাই পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই স্থানে উপস্থিত হইবার জন্য সকল গ্রহ ভ্রমণ করিতেছে এবং পবনও বহিতেছে। সেই মুক্তির জন্য বজ্র তীব্র নিনাদ করিতেছে, মৃত্যুও তাহারই জন্য চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সকলেই সেই দিকে যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সাধু সেইদিকে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না,

তাঁহার পক্ষে উহা কিছু প্রশংসার কথা নহে। পাপীও তদ্রূপ। খুব দানশীল ব্যক্তি সেইসব লক্ষ্য করিয়া সরলভাবে চলিয়াছেন, তিনি না গিয়া থাকিতে পারেন না; আবার ভয়ানক কৃপণ ব্যক্তিও সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে। যিনি মহা সৎকর্ম্মশীল তিনিও সেই বাণী শুনিয়াছেন, তিনি সেই সৎকর্ম্ম না করিয়া থাকিতে পারেন না, আবার ভয়ানক অলস ব্যক্তিও তদ্রূপ। একজনের অপর ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পদস্খলন হইতে পারে, আর যে ব্যক্তির খুব বেশী পদস্খলন হয়, তাহাকে আমরা দুর্ব্বল বলি, আর যাহার পদস্খলন অল্প হয়, তাঁহাকে আমরা সৎ বলি। ভালমন্দ এই দুইটি বিভিন্ন বস্তু নহে, উহারা একই জিনিস; উঁহাদের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

এক্ষণে দেখ, যদি এই মুক্তভাবরূপ শক্তি বাস্তবিক সমুদয় জগতে কার্য্য করিতে থাকে, তবে আমাদের বিশেষ আলোচ্য বিষয়—ধর্ম্মে উহা প্রয়োগ করিলে দেখিতে পাই, সমুদয় ধর্ম্মই ঐ একভাব দ্বারাই নিয়মিত হইয়াছে। খুব নিম্নতম ধর্ম্মগুলির কথা ধর, সেই সকল ধর্ম্মে হয়ত কোন মৃত পূর্ব্বপুরুষ অথবা ভয়ানক নিষ্ঠুর দেবগণ উপাসিত হন; কিন্তু তাহাদের উপাসিত এই দেবতা বা মৃত পূর্ব্বপুরুষদের মোটামুটি ধারণাটা কি? সেই ধারণা এই যে —তাঁহারা প্রকৃতি হইতে উন্নত, এই মায়া দ্বারা তাঁহারা বদ্ধ নন। অবশ্য তাঁহাদের প্রকৃতির ধারণা খুব সামান্য। তাঁহারা কেবল আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ শক্তিদ্বয়ের সহিত পরিচিত। উপাসক—একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, তাহার খুব স্থূল ধারণা—সে গৃহ-প্রাচীর ভেদ করিয়া যাইতে পারে না, অথবা শূন্যে উড়িতে পারে না; সুতরাং

এই সকল বাধা অতিক্রম করা বা না করা ব্যতীত তাহার শক্তির আর উচ্চতর ধারণা নাই; সুতরাং সে এমন দেবগণের উপাসনা করে, যাঁহারা প্রাচীর ভেদ করিয়া অথবা আকাশের মধ্য দিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, অথবা নিজরূপ পরিবর্তন করিতে পারেন। দার্শনিকদৃষ্টিতে এইরূপ দেবোপাসনার ভিতর কি রহস্য নিহিত আছে? এই রহস্য নিহিত আছে যে, এখানেও সেই মুক্তির ভাব রহিয়াছে, তাহার দেবতার ধারণা পরিজ্ঞাত প্রকৃতির ধারণা হইতে উন্নত। আবার যাঁহারা তদপেক্ষা উন্নত দেবতার উপাসক তাহাদেরও সেই একই মুক্তির অপরবিধ ধারণা। যেমন প্রকৃতি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উন্নত হইতে থাকে, তেমনি প্রকৃতির প্রভু আত্মার ধারণাও উন্নত হইতে থাকে; অবশেষে আমরা একেশ্বরবাদে উপনীত হই। এই মায়া, এই প্রকৃতি রহিয়াছেন আর এই মায়ার প্রভু একজন রহিয়াছেন—ইহাই আমাদের আশার স্থল।

যেখানে প্রথম এই একেশ্বরবাদসূচক ভাবের আরম্ভ, সেইখানে বেদান্তেরও আরম্ভ। বেদান্ত উহা হইতেও গভীরতর তত্ত্বানুসন্ধান করিতে চান। বেদান্ত বলেন—এই মায়াপ্রপঞ্চের পশ্চাতে যে এক আত্মা রহিয়াছেন, যিনি মায়ার প্রভু অথচ যিনি মায়ার অধীন নন, তিনি যে আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন এবং আমরাও যে সকলে তাঁহারই দিকে ক্রমাগত চলিতেছি, এই ধারণা সত্য বটে, কিন্তু এখনও যেন ধারণা স্পষ্ট হয় নাই, এখনও যেন এই দর্শন অস্পষ্ট ও অস্ফুট—যদিও উহা স্পষ্টতঃ যুক্তির বিরোধী নহে। যেমন আপনাদের স্তবগীতিতে আছে—

'আমার ঈশ্বর তোমার অতি নিকটে', বেদান্তীর পক্ষেও এই স্তুতি খাটিবে, তিনি কেবল একটি শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া বলিবেন—'আমার ঈশ্বর আমার অতি নিকটে।' আমাদের চরম পথ যে আমাদের অনেক দূরে প্রকৃতির অতীত প্রদেশে, আমরা যে তাহার নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছি, এই তফাৎ তফাৎ ভাবকে ক্রমশঃ আমাদের নিকটবর্ত্তী করিতে হইবে, অবশ্য আদর্শের পবিত্রতা ও উচ্চতা বজায় রাখিয়া ইহা করিতে হইবে। যেন ঐ আদর্শ ক্রমশঃ আমাদের নিকট হইতে নিকটতর হইতে থাকে—অবশেষে সেই স্বর্গস্থ ঈশ্বর যেন প্রকৃতির ঈশ্বররূপে উপলব্ধ হন, শেষে যেন প্রকৃতিতে ও সেই ঈশ্বরে কোন প্রভেদ না থাকে, তিনিই যেন এই দেহমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে, অবশেষে এই দেবমন্দিররূপে পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাকেই যেন শেষে জীবাত্মা ও মানুষ বলিয়া পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এইখানেই বেদান্তের শেষ কথা। যাঁহাকে ঋষিগণ বিভিন্ন স্থানে অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহাকে এতক্ষণে জানা গেল। বেদান্ত বলেন—তুমি যে বাণী শুনিয়াছিলে তাহা সত্য, তবে তুমি উহা শুনিয়া ঠিকপথে পরিচালিত হও নাই। যে মুক্তির মহা আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে তোমরা নিকটে, খুব নিকটে লইয়া আইস, যতদিন না তুমি জানিতে পার যে ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মাস্বরূপ। এই মুক্তি বরাবরই তোমার স্বরূপই ছিল এবং মায়া তোমাকে কখনই আক্রমণ করে নাই। এই প্রকৃতি কখনই

তোমার উপর শক্তি বিস্তার করিতে সমর্থ ছিল না। বালককে ভয় দেখাইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুমিও স্বপ্ন দেখিতেছিলে যে, প্রকৃতি তোমাকে নাচাইতেছেন, আর উহা হইতে মুক্ত হওয়াই তোমার লক্ষ্য। শুধু ইহা বুদ্ধিপূর্ব্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা, অপরোক্ষ করা—আমরা এই জগৎকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে উহা উপলব্ধি করা। তখনই আমরা মুক্ত হইব, তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, তখনই হৃদয়ের চঞ্চলতাসকল স্থির হইয়া যাইবে, তখনই সমুদয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে, তখনই এই বহুত্ব-ভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি—এই মায়া এখনকার মত ভয়ানক অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্রস্বরূপ প্রতিভাত হইবে, তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি, তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে—তাহারা তখন তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে প্রতিভাত হইবে, সকল বস্তুর পশ্চাতে, সকল সারসত্তাস্বরূপ তিনিই দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন দেখা যাইবে, আর বুঝিতে পারা যাইবে যে তিনিই আমার প্রকৃত অন্তরাত্মস্বরূপ।

# ব্রহ্ম ও জগৎ

অদ্বৈত বেদান্তের এই বিষয়টি ধারণা করা অতি কঠিন যে অনন্ত ব্রহ্ম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে? এই প্রশ্ন মানুষ চিরকালই জিজ্ঞাসা করিবে, কিন্তু সারাজীবন এই প্রশ্ন অনুধ্যান করিয়াও মানুষের অন্তর হইতে এই প্রশ্ন বিদূরিত হইবে না— অনন্ত অসীম যিনি, তিনি সসীম হইলেন কিরূপে? আমি এক্ষণে এই প্রশ্নটি লইয়া আলোচনা করিব। ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য আমি নিম্নে অঙ্কিত চিত্রটির সাহায্য গ্রহণ করিব।

এই চিত্রে (ক) ব্রহ্ম, (খ) জগৎ। ব্রহ্ম জগৎ হইয়াছেন। এখানে জগৎ অর্থে শুধু জড়জগৎ নহে, সূক্ষ্ম জগৎ, আধ্যাত্মিক জগৎও তাহার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে হইবে—স্বর্গ, নরক—এক কথায়, যাহা কিছু আছে, জগৎ অর্থে তৎসমুদয় বুঝিতে হইবে। মন একপ্রকার পরিণামের নাম, শরীর আর একপ্রকার পরিণামের নাম—ইত্যাদি, ইত্যাদি, এই সব লইয়া জগৎ। এই ব্রহ্ম (ক) জগৎ (খ) হইয়াছেন —দেশকালনিমিত্তের (গ) মধ্য দিয়া আসিয়া—ইহাই অদ্বৈতবাদের মূল কথা। দেশকালনিমিত্তরূপ আদর্শের মধ্য দিয়া ব্রহ্মকে আমরা

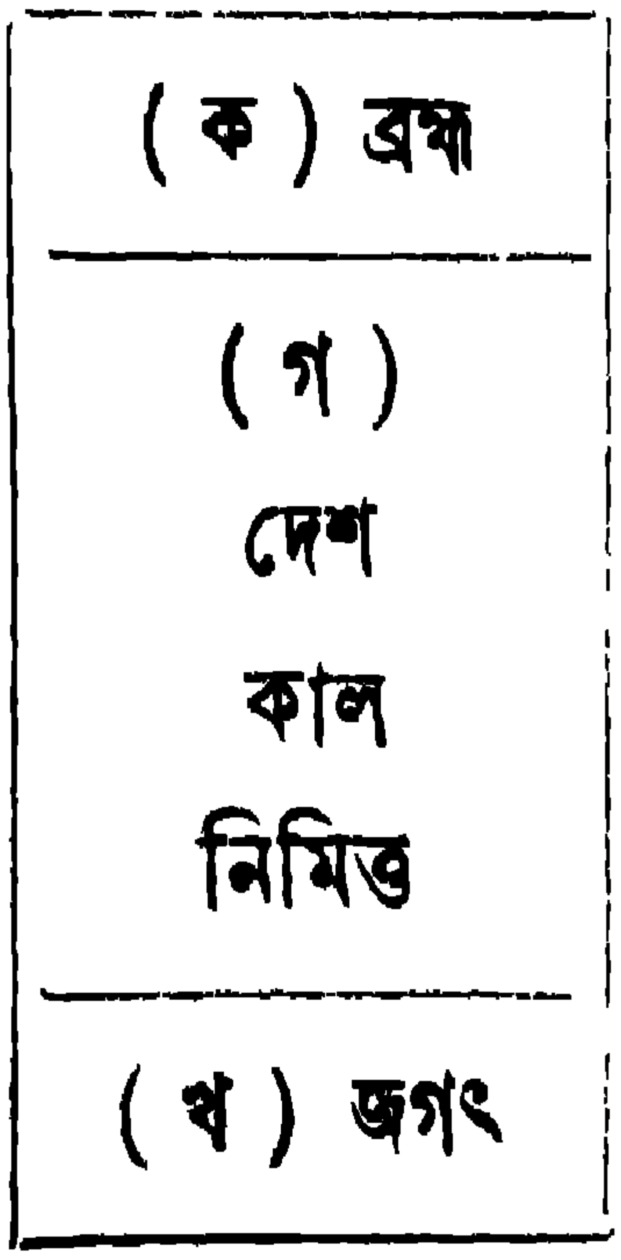

দেখিতেছি, আর ঐরূপে নীচের দিক হইতে দেখিলে এই ব্রহ্ম জগদ্রূপে দৃষ্ট হন। ইহা হইতে বেশ বোধ হইতেছে, যেখানে ব্রহ্ম সেখানে দেশকালনিমিত্ত নাই। কাল তথায় থাকিতে পারে না, কারণ তথায় মনও নাই, চিন্তাও নাই। দেশ তথায় থাকিতে পারে না, কারণ তথায় কোন পরিণাম নাই। গতি এবং নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাবও তথায় থাকিতে পারে না, যথায় একমাত্র সত্তা বিরাজমান। এইটি বুঝা এবং বিশেষরূপে ধারণা করা আমাদের আবশ্যক যে, যাহাকে আমরা কার্য্যকারণ-ভাব বলি, তাহা ব্রহ্ম প্রপঞ্চরূপে অবনতভাবাপন্ন হইবার পর (যদি আমরা এই ভাষা প্রয়োগ করিতে পারি) আরম্ভ হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে; আর আমাদের ইচ্ছা, বাসনা প্রভৃতি যাহা কিছু সব তারপর হইতে আরম্ভ হয়। আমার বরাবর এই ধারণা যে, শোপেনহাওয়ার (Schopenhauer) বেদান্ত বুঝিতে এই জায়গায় ভ্রমে পড়িয়াছেন—তিনি এই 'ইচ্ছা'কেই সর্ব্বস্ব করিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মের স্থানে এই 'ইচ্ছা'কেই বসাইতে চান। কিন্তু পূর্ণব্রহ্মকে কখন 'ইচ্ছা' (Will) বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে না, কারণ ইচ্ছা জগৎপ্রপঞ্চের অন্তর্গত ও পরিণামশীল, কিন্তু ব্রহ্মে ('গ'-এর অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের উপরে) কোনরূপ গতি নাই, কোনরূপ পরিণাম নাই। ঐ (গ)-এর নিম্নেই গতি—বাহ্য বা আন্তর সর্ব্বপ্রকার গতির আরম্ভ; আর এই আন্তরিক গতিকেই চিন্তা বলে। অতএব (গ)-এর উপরে কোনরূপ ইচ্ছা থাকিতে পারে না, সুতরাং 'ইচ্ছা' জগতের কারণ হইতে পারে না। আরও নিকটে আসিয়া পর্য্যবেক্ষণ কর; আমাদের

শরীরের সকল গতি ইচ্ছাপ্রযুক্ত নহে। আমি এই চেয়ারখানি নাড়িলাম। ইচ্ছা অবশ্য উহা নাড়াইবার কারণ, ঐ ইচ্ছাই পৈশিক শক্তিরূপে পরিণত হইয়াছে। এ কথা ঠিক বটে। কিন্তু যে শক্তি চেয়ারখানি নাড়াইবার কারণ, তাহাই আবার হৃদয়ে ফুসফুস্‌কেও সঞ্চালিত করিতেছে, কিন্তু 'ইচ্ছা'রূপে নহে। এই দুই শক্তিই এক ধরিয়া লইলেও যখন উহা জ্ঞানের ভূমিতে আরোহণ করে, তখনই উহাকে 'ইচ্ছা' বলা যায়, কিন্তু ঐ ভূমি আরোহণ করিবার পূর্ব্বে উহাকে ইচ্ছা বলিলে, উহাকে ভুল নাম দেওয়া হইল বলিতে হইবে। ইহাতেই শোপেনহাওয়ারের দর্শনে বিশেষ গোলযোগ হইয়াছে। বরং এখানে 'প্রজ্ঞা' ও 'সম্বিৎ' শব্দদ্বয় ব্যবহার করিলে ভাল হয়। এই শব্দ দুইটি মনের সর্ব্বপ্রকার অবস্থার সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইতে পারে। প্রজ্ঞা ও সম্বিৎ ঠিক জ্ঞানের অবস্থা বা জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থা নহে, বরং উহাকে মানসিক পরিণামসমূহের একটা সাধারণ ভাব বলা যাইতে পারে।

যাহা হউক, এক্ষণে আলোচনা করা যাউক আমরা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি কেন? একটি প্রস্তর পড়িল—আমরা অমনি প্রশ্ন করিলাম উহার পতনের কারণ কি? এই প্রশ্নের ন্যায্যতা বা সম্ভাবনীয়তা এই অনুমান বা ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, যাহা কিছু ঘটে তাহারই পূর্ব্বে—প্রত্যেক গতিরই পূর্ব্বে আর কিছু ঘটিয়াছে। আর বিষয়টি সম্বন্ধে আপনাদিগকে খুব স্পষ্ট ধারণা করিতে অনুরোধ করিতেছি, কারণ যখনই আমরা জিজ্ঞাসা করি এই ঘটনা কেন ঘটিল, তখনই আমরা মানিয়া

লইতেছি যে সব জিনিসেরই, সব ঘটনারই একটি 'কেন' থাকিবে। অর্থাৎ উহা ঘটিবার পূর্ব্বে আর কিছু উহার পূর্ব্ববর্ত্তী থাকিবে। এই পূর্ব্ববর্ত্তিতা ও পরবর্ত্তিতাকেই 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণ' ভাব বলে, আর যাহা কিছু আমরা দেখি, শুনি, অনুভব করি, সংক্ষেপে জগতের সমুদয়ই একবার কারণ, আবার কার্য্য হইতেছে। একটি জিনিস তাহার পরবর্ত্তীর কারণ হইতেছে, কিন্তু আবার উহাই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কিছুর কার্য্য। ইহাকেই কার্য্যকারণের নিয়ম বলে, ইহাই আমাদের স্থির বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস জগতের প্রত্যেক পরমাণুরই অপর সমুদয় বস্তুর সহিত, তাহা যাহা হউক না কেন, কোন না কোন সম্বন্ধে জড়িত রহিয়াছে। আমাদের এই ধারণা কিরূপে আসিল, এই লইয়া ভয়ানক বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। ইউরোপে অনেক সহজ-প্রাজ্ঞ ( intuitive ) দার্শনিক আছেন, তাঁহাদের বিশ্বাস ইহা মানবজাতির স্বভাবগত ধারণা, আবার অনেকের ধারণা ইহা ভূয়োদর্শনলব্ধ, কিন্তু এই প্রশ্নের এখনও মীমাংসা হয় নাই। বেদান্ত ইহার কি মীমাংসা করেন, আমরা পরে দেখিব। অতএব আমাদের প্রথম ইহা বুঝা উচিত যে, 'কেন' এই প্রশ্নটি এই ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে যে, উহার পূর্ব্ববর্ত্তী কিছু আছে এবং উহার পরে আরও কিছু ঘটিবে। এই প্রশ্নে আর এক বিশ্বাস অন্তর্নিহিত রহিয়াছে যে, জগতের কোন পদার্থই স্বতন্ত্র নহে, সকল পদার্থের উপর উহার বহিঃস্থ অপর কোন পদার্থ কার্য্য করিতে পারে। জগতের সকল বস্তুই এইরূপ পরস্পর-সাপেক্ষ—একটি অপরটির অধীন—কেহই স্বতন্ত্র নহে।

যখন আমরা বলি, 'ব্রহ্মের উপর কোন্ শক্তি কার্য্য করিল?' তখন আমরা এই ভুল করি যে, ব্রহ্মকে জগতের সামিল কোন বস্তুর ন্যায় মনে করিয়া বসি। এই প্রশ্ন করিতে গেলেই আমাদিগকে অনুমান করিতে হইবে যে, সেই ব্রহ্মও অপর কিছুর অধীন—সেই নিরপেক্ষ ব্রহ্মসত্তাও অপর কিছুর দ্বারা বদ্ধ। অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' বা 'নিরপেক্ষ সত্তা' শব্দটিকে আমরা জগতের ন্যায় মনে করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত রেখার উপরে ত আর দেশকাল-নিমিত্ত নাই, কারণ উহা একমেবাদ্বিতীয়ং—মনের অতীত। যাহা কেবল নিজের অস্তিত্বে নিজে প্রকাশিত, যাহা একমাত্র, একমেবাদ্বিতীয়ং তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না। যাহা মুক্তস্বভাব, স্বতন্ত্র তাহার কোন কারণ থাকিতে পারে না, কারণ তাহা হইলে তিনি মুক্ত হইলেন না, বদ্ধ হইয়া গেলেন। যাহার ভিতর আপেক্ষিকতা আছে, তাহা কখন মুক্তস্বভাব হইতে পারে না। অতএব তোমরা দেখিতেছ, অনন্ত সান্ত কেন হইল এই প্রশ্নই ভ্রমাত্মক—উহা স্ববিরোধী।

এইসব সূক্ষ্ম বিচার ছাড়িয়া দিয়া সাদাসিদে ভাবেও আমরা এ বিষয় বুঝাইতে পারি। মনে কর আমরা বুঝিলাম—ব্রহ্ম কিরূপে জগৎ হইলেন, অনন্ত কিরূপে সান্ত হইলেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম কি ব্রহ্মই থাকিবেন, অনন্ত কি অনন্তই থাকিবেন? তাহা হইলে ত অনন্ত সান্তই হইয়া গেলেন। মোটামুটি আমরা জ্ঞান বলিতে কি বুঝি? যে কোন বিষয় আমাদের মনের বিষয়ীভূত হয় অর্থাৎ মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়, তাহাই আমরা জানিতে

পারি, আর যখন উহা আমাদের মনের বাহিরে থাকে অর্থাৎ মনের বিষয়ীভূত না হয়, তখন আমরা উহা জানিতে পারি না। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, যদি সেই অনন্ত ব্রহ্ম মনের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইলেন, তাহা হইলে তিনি আর অনন্ত রহিলেন না; তিনি সসীম হইয়া গেলেন। মনের দ্বারা যাহা কিছু সীমাবদ্ধ, সবই সসীম। অতএব সেই 'ব্রহ্মকে জানা'—এ কথা আবার স্ববিরোধী। এই জন্যই এ প্রশ্নের উত্তর এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কারণ যদি ইহার উত্তর হয়, তাহা হইলে তিনি অসীম রহিলেন না; ঈশ্বর 'জ্ঞাত' হইলে তাঁহার আর ঈশ্বরত্ব থাকে না—তিনি আমাদের মত একজন—এই চেয়ারখানার মত একটা জিনিস হইয়া গেলেন। তাঁহাকে জানা যায় না, তিনি সর্ব্বদাই অজ্ঞেয়। তবে অদ্বৈতবাদী বলেন, তিনি শুধু 'জ্ঞেয়' হইতেও আরও কিছু বেশী। এ কথাটি আবার বুঝিতে হইবে। তোমরা যেন অজ্ঞেয়বাদীদের মত ঈশ্বর অজ্ঞেয় মনে করিয়া বসিয়া থাকিও না। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ—সম্মুখে এই চেয়ারখানি রহিয়াছে, উহাকে আমি জানিতেছি, উহা আমার জ্ঞাত পদার্থ। আবার আকাশের বহির্দ্দেশে কি আছে, সেখানে কোন লোকের বসতি আছে কি না, এ বিষয় হয়ত একেবারে অজ্ঞেয়। কিন্তু ঈশ্বর পূর্ব্বোক্ত পদার্থগুলির ন্যায় জ্ঞাতও নন, অজ্ঞেয়ও নন। ঈশ্বর বরং যাহাকে 'জ্ঞাত' বলা হইতেছে, তাহা হইতে আরও কিছু বেশী—ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় বলিলে ইহাই বুঝায়, কিন্তু যে অর্থে কেহ কেহ কোন কোন প্রশ্নকে অজ্ঞাত বা অজ্ঞেয় বলেন, সে অর্থে নহে। ঈশ্বর জ্ঞাত হইতে আরও কিছু অধিক। এই

চেয়ার আমাদের জ্ঞাত; কিন্তু ঈশ্বর তাহা হইতেও আমাদের অধিক জ্ঞাত, কারণ তাঁহাকে অগ্রে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে আমাদিগকে চেয়ারের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। তিনি সাক্ষিস্বরূপ, সকল জ্ঞানের তিনি অনন্ত সাক্ষিস্বরূপ। যাহা কিছু আমরা জানি, সবই অগ্রে তাঁহাকে জানিয়া—তাঁহারই ভিতর দিয়া—তবে জানিতে হয়। তিনিই আমাদের আত্মার সারসত্তাস্বরূপ। তিনিই প্রকৃত আমি—সেই 'আমি'ই আমাদের এই 'আমি'র সারসত্তাস্বরূপ; আমরা সেই 'আমি'র ভিতর দিয়া ব্যতীত কিছুই জানিতে পারি না, সুতরাং সমুদয়ই আমাদিগকে ব্রহ্মের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। অতএব এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে ইহাকে ব্রহ্মের মধ্য দিয়া তবে জানিতে হইবে। অতএব ব্রহ্ম চেয়ার অপেক্ষা আমাদের নিকটবর্ত্তী হইলেন, কিন্তু তথাপি তিনি আমাদের নিকট হইতে অনেক উচ্চে রহিলেন। জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞাতও নহেন, কিন্তু উভয় হইতেই অনন্তগুণে উচ্চ। তিনি তোমার আত্মস্বরূপ। কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও জীবনধারণ করিতে পারিত, কে এ জগতে এক মুহূর্ত্তও শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত, যদি সেই আনন্দস্বরূপ ইহার প্রতি পরমাণুতে বিরাজমান না থাকিতেন? কারণ তাঁহারই শক্তিতে আমরা শ্বাসপ্রশ্বাসকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছি এবং তাঁহারই অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্ব। তিনি যেকোন এক স্থানবিশেষে অবস্থান করিয়া আমার রক্তসঞ্চালন করিতেছেন, তাহা নহে। তাৎপর্য্য এই যে, তিনিই সমুদয়ের সত্তাস্বরূপ—তিনি

আমার আত্মার আত্মা; তুমি কোনরূপেই বলিতে পার না যে, তুমি তাঁহাকে জান—উহাতে তাঁহাকে অত্যন্ত নামাইয়া ফেলা হয়। তুমি লাফাইয়া নিজের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিতে পার না, সুতরাং তুমি তাঁহাকে জানিতেও পার না। জ্ঞান বলিতে 'বিষয়ীকরণ' (objectification)—জিনিসকে বাহিরে আনিয়া বিষয়ের ন্যায় (জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায়) প্রত্যক্ষীকরণ—বুঝায়। উদাহরণস্বরূপ দেখ, স্মরণকার্যে তোমরা অনেক জিনিসকে 'বিষয়ীকৃত' করিতেছ—যেন তোমাদের নিজেদের স্বরূপ হইতে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ! সমুদয় স্মৃতি—যাহা কিছু আমি দেখিয়াছি এবং যাহা কিছু আমি জানি, সবই আমার মনে অবস্থিত। ঐসকল বস্তুর ছাপ বা ছবি যেন আমার অন্তরে রহিয়াছে। যখনই আমি উহাদের বিষয় চিন্তা করিতে ইচ্ছা করি, উহাদিগকে জানিতে চাই, তখন প্রথমেই ঐগুলিকে যেন বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে হয়। ঈশ্বরসম্বন্ধে এরূপ করা অসম্ভব, কারণ তিনি আমাদের আত্মার আত্মস্বরূপ, আমরা তাঁহাকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতে পারি না। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, 'স য এষোঽণিমৈতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো'—ইহার অর্থ এই, 'সেই সূক্ষ্মস্বরূপ জগৎকারণ সকল বস্তুর আত্মা, তিনিই সত্যস্বরূপ; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' এই 'তত্ত্বমসি' বাক্য বেদান্তের মধ্যে পবিত্রতম বাক্য, মহাবাক্য বলিয়া কথিত হয়, আর ঐ পূর্ব্বোক্ত বাক্যাংশ দ্বারা 'তত্ত্বমসি'র প্রকৃত অর্থ কি তাহাও বুঝা গেল। 'তুমিই সেই'—ঈশ্বরকে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় তুমি

বর্ণনা করিতে পার না। ভগবানকে পিতা মাতা ভ্রাতা বা প্রিয় বন্ধু বলিলে তাঁহাকে 'বিষয়ীকৃত' করিতে হয়—তাঁহাকে বাহিরে আনিয়া দেখিতে হয়—তাহা ত কখন হইতে পারে না। তিনি সকল বিষয়ের অনন্ত বিষয়ী। যেমন আমি চেয়ারখানি দেখিতেছি, আমি চেয়ারখানির দ্রষ্টা—আমি উহার বিষয়ী, তদ্রূপ ঈশ্বর আমার আত্মার নিত্যদ্রষ্টা—নিত্যজ্ঞাতা—নিত্যবিষয়ী। কিরূপে তুমি তাঁহাকে—তোমার আত্মার অন্তরাত্মাকে—সকল বস্তুর সারসত্তাকে—'বিষয়ীকৃত' করিবে, বাহিরে আনিয়া দেখিবে? অতএব আমি তোমাদের নিকট পুনরায় বলিতেছি, ঈশ্বর জ্ঞেয়ও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন—তিনি জ্ঞেয় অজ্ঞেয় হইতে অনন্তগুণ উচ্চে—তিনি আমাদের সহিত অভেদ, আর যাহা আমার সহিত এক, তাহা কখন আমার জ্ঞেয় বা অজ্ঞেয় হইতে পারে না; যেমন তোমার আত্মা, আমার আত্মা জ্ঞেয়ও নহে, অজ্ঞেয়ও নহে। তুমি তোমার আত্মাকে জানিতে পার না, তুমি উহাকে নাড়িতে চাড়িতে পার না, অথবা উহাকে 'বিষয়' করিয়া উহাকে দৃষ্টিগোচর করিতে পার না, কারণ তুমি নিজেই তাহাই, তুমি তোমাকে উহা হইতে পৃথক করিতে পার না। আবার উহাকে অজ্ঞেয়ও বলিতে পার না, কারণ অজ্ঞেয় বলিতে গেলেও অগ্রে উহাকে 'বিষয়' করিতে হইবে; তাহা ত করা যায় না। আর তুমি নিজে যেমন তোমার নিকট পরিচিত, জ্ঞাত আর কোন্ বস্তু তদপেক্ষা তোমার অধিক জ্ঞাত? প্রকৃতপক্ষে উহা আমাদের জ্ঞানের কেন্দ্রস্বরূপ। ঠিক এই ভাবেই বলা যায় যে, ঈশ্বর জ্ঞাতও নহেন, অজ্ঞেয়ও নহেন, তদপেক্ষা

অনন্তগুণে উচ্চ, কারণ তিনিই আমাদের আত্মার অন্তরাত্মস্বরূপ।

অতএব আমরা দেখিতেছি, প্রথমতঃ পূর্ণব্রহ্মসত্তা হইতে কিরূপে' জগৎ হইল, এই প্রশ্নই স্ববিরোধী; আর দ্বিতীয়তঃ আমরা দেখিতে পাই অদ্বৈতবাদে ঈশ্বরের ধারণা এই একত্ব, সুতরাং আমরা তাঁহাকে 'বিষয়ীকৃত' করিতে পারি না, কারণ জ্ঞাতসারেই হউক আর অজ্ঞাতসারেই হউক, আমরা সর্ব্বদাই তাঁহাতে সঞ্জীবিত এবং তাঁহাতেই থাকিয়া সমুদয় কার্য্যকলাপ করিতেছি। আমরা যাহা করিতেছি, সবই সর্ব্বদা তাঁহারই মধ্য দিয়া করিতেছি। এক্ষণে প্রশ্ন এই, দেশকালনিমিত্ত কি? অদ্বৈতবাদের মর্ম্ম ত এই যে—একটিমাত্র বস্তু আছে, দুইটি নাই। এক্ষণে আবার কিন্তু বলা হইতেছে যে, সেই অনন্ত ব্রহ্ম দেশকালনিমিত্তের আবরণের দ্বারা নানারূপে প্রকাশ পাইতেছেন। অতএব এক্ষণে বোধ হইতেছে দুইটি বস্তু আছে—সেই অনন্ত ব্রহ্ম একটি বস্তু, আর মায়া অর্থাৎ দেশকালনিমিত্তের সমষ্টি আর এক বস্তু। আপাততঃ দুইটি বস্তু আছে, ইহাই যেন স্থিরসিদ্ধান্ত বলিয়া বোধ হয়। অদ্বৈতবাদী ইহার উত্তরে বলেন, বাস্তবিক ইহাতে দুই হয় না। দুইটি বস্তু থাকিতে হইলে ব্রহ্মের ন্যায়—যাঁহার উপর কোন নিমিত্ত কার্য্য করিতে পারে না—এরূপ দুইটি স্বতন্ত্র বস্তু থাকা আবশ্যক। প্রথমতঃ দেশকালনিমিত্তের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে, বলা যাইতে পারে না। কাল আমাদের মনের প্রতি পরিবর্ত্তনের সহিত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সুতরাং উহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কখন কখন স্বপ্নে দেখা যায়, আমি যেন অনেক বৎসর জীবনধারণ

করিয়াছি—কখন কখন আবার এক মুহূর্তের মধ্যে লোকে কয়েক মাস অতীত হইল, বোধ করিয়াছে। অতএব দেখা গেল, কাল তোমার মনের অবস্থার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে। দ্বিতীয়তঃ কালের জ্ঞান সময় সময় একেবারে উড়িয়া যায়, আবার অপর সময় আসিয়া থাকে। দেশ সম্বন্ধেও এইরূপ। আমরা দেশের স্বরূপ জানিতে পারি না। তথাপি উহার নির্দ্দিষ্ট লক্ষণ করা অসম্ভব হইলেও উহা রহিয়াছে—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই; উহা আবার কোন পদার্থ হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে না। নিমিত্ত বা কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধেও এইরূপ। এই দেশকালনিমিত্তের ভিতর এই একই বিশেষত্ব দেখিতেছি যে, উহারা অন্যান্য বস্তু হইতে পৃথকভাবে অবস্থান করিতে পারে না। তোমরা শুদ্ধ 'দেশের' বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, যাহাতে কোন বর্ণ নাই, যাহার সীমা নাই, চতুর্দ্দিকস্থ কোন বস্তুর সহিত যাহার কোন সংস্রব নাই। তুমি উহার বিষয় চিন্তা করিতেই পারিবে না। তোমাকে দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইলে দুইটি সীমার মধ্যস্থিত অথবা তিনটি বস্তুর মধ্যে অবস্থিত দেশের বিষয় চিন্তা করিতে হইবে। তবেই দেখা গেল, দেশের অস্তিত্ব অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে। কাল সম্বন্ধেও তদ্রূপ; শুদ্ধ কাল সম্বন্ধে তুমি কোন ধারণা করিতে পার না; কালের ধারণা করিতে হইলে তোমাকে একটি পূর্ব্ববর্ত্তী আর একটি পরবর্ত্তী ঘটনা লইতে হইবে এবং কালের ধারণা দ্বারা ঐ দুইটিকে যোগ করিতে হইবে। যেমন দেশ বহিঃস্থ দুইটি বস্তুর উপর নির্ভর করিতেছে, তদ্রূপ কালও দুইটি ঘটনার উপর নির্ভর করিতেছে। আর 'নিমিত্ত' বা 'কার্য্যকারণ'ভাবে ধারণা এই

দেশকালের উপর নির্ভর করিতেছে। 'দেশকালনিমিত্ত' এই সকলগুলিরই ভিতর বিশেষত্ব এই যে, উহাদের স্বতন্ত্র সত্তা নাই। এই চেয়ারখানা বা ঐ দেয়ালটার যেরূপ অস্তিত্ব আছে, উহার তাহাও নাই। ইহারা যেন সকল বস্তুরই পশ্চাদ্দেশস্থ ছায়াস্বরূপ, তুমি কোনমতে উহাদিগকে ধরিতে পার না। উহাদের ত কোন সত্তা নাই—আমরা দেখিলাম, উহাদের বাস্তবিক অস্তিত্বই নাই—বড় জোর না হয় ছায়া। আবার উহারা যে কিছুই নয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কারণ উহাদেরই ভিতর দিয়া জগতের প্রকাশ হইতেছে—ঐ তিনটি যেন স্বভাবতঃ মিলিত হইয়া নানা রূপ প্রসব করিতেছে। অতএব আমরা প্রথমতঃ দেখিলাম, এই দেশ-কালনিমিত্তের সমষ্টির অস্তিত্বও নাই এবং উহারা একেবারে অসৎও (অস্তিত্বশূন্য) নহে। দ্বিতীয়তঃ উহারা আবার এক সময়ে একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সম্বন্ধে চিন্তা কর। তরঙ্গ অবশ্যই সমুদ্রের সহিত অভিন্ন, তথাপি আমরা উহাকে তরঙ্গ বলিয়া সমুদ্র হইতে পৃথকরূপে জানিতেছি। এই বিভিন্নতার কারণ কি?—নাম রূপ। নাম অর্থাৎ সেই বস্তু-সম্বন্ধে আমাদের মনে যে একটি ধারণা রহিয়াছে, আর রূপ অর্থাৎ আকার। আবার তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে একেবারে পৃথক-রূপে কি আমরা চিন্তা করিতে পারি? কখনই না। উহা সকল সময়েই ঐ সমুদ্রের ধারণার উপর নির্ভর করিতেছে। যদি ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, তবে রূপও অন্তর্হিত হইল, কিন্তু ঐ রূপটি যে একেবারে ভ্রমাত্মক ছিল, তাহা নহে। যতদিন ঐ তরঙ্গ ছিল, ততদিন ঐ রূপটি ছিল এবং তোমাকে বাধ্য হইয়া ঐ রূপ দেখিতে

হইত; ইহাই মায়া। অতএব এই সমুদয় জগৎ যেন সেই ব্রহ্মের এক বিশেষ রূপ। ব্রহ্মই সেই সমুদ্র এবং তুমি, আমি, সূর্য্য, তারা সবই সেই সমুদ্রে ভিন্ন ভিন্ন তরঙ্গমাত্র। তরঙ্গগুলিকে সমুদ্র হইতে পৃথক করে কে? ঐ রূপ। আর ঐ রূপ—কেবল দেশকাল-নিমিত্ত। ঐ দেশকালনিমিত্ত আবার সম্পূর্ণরূপে ঐ তরঙ্গের উপর নির্ভর করিতেছে। তরঙ্গও যেই চলিয়া যায়, অমনি তাহারাও অন্তর্হিত হয়। জীবাত্মা যখনই এই মায়া পরিত্যাগ করে, তখনই তাহার পক্ষে উহা অন্তর্হিত হইয়া যায়, সে মুক্ত হইয়া যায়। আমাদের সমুদয় চেষ্টাই এই দেশকালনিমিত্তের উপর নির্ভর হইতে আপনাকে রক্ষা করা। উহারা সর্ব্বদাই আমাদের উন্নতির পথে বাধা দিতেছে, আর আমরা সর্ব্বদাই উহাদের কবল হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করিতে চেষ্টা করিতেছি। পণ্ডিতেরা 'ক্রমবিকাশবাদ' (Theory of Evolution) কাহাকে বলেন? উহার ভিতর দুইটি ব্যাপার আছে। একটি এই যে, একটি প্রবল অন্তর্নিহিত গূঢ়শক্তি আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছে, আর বহিঃস্থ অনেক ঘটনাবলী উহাতে বাধা দিতেছে—পারিপার্শ্বিক অবস্থাপুঞ্জ উহাকে প্রকাশিত হইতে দিতেছে না। সুতরাং এই অবস্থাপুঞ্জের সহিত সংগ্রামের জন্য ঐ শক্তি নব নব কলেবর ধারণ করিতেছেন। একটি ক্ষুদ্রতম কীটাণু এই উন্নত হইবার চেষ্টায় আর একটি শরীর ধারণ করে এবং কতকগুলি বাধাকে জয় করিয়া থাকে, এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শরীর ধারণ করিয়া অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হয়। এক্ষণে যদি এই তত্ত্বটিকে উহার স্বাভাবিক চরম সিদ্ধান্তে লইয়া যাওয়া যায়, তবে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে,

এমন সময় আসিবে, যখন যে শক্তি কীটাণুর ভিতরে ক্রীড়া করিতেছিল এবং যাহা অবশেষে মনুষ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল, তাহা সমস্ত বাধা অতিক্রম করিবে, বহিঃস্থ ঘটনাপুঞ্জ আর উহাকে কোন বাধা দিতে পারিবে না। এই তত্ত্বটি দার্শনিক ভাষায় প্রকাশিত হইলে এইরূপ বলিতে হইবে—প্রত্যেক কার্য্যের দুইটি করিয়া অংশ আছে, একটি বিষয়ী, অপরটি বিষয়। একজন আমাকে তিরস্কার করিল, আমি আপনাকে অসুখী বোধ করিলাম—এখানেও এই দুইটি ব্যাপার রহিয়াছে। আর আমার সারাজীবনের চেষ্টা কি? না, নিজের মনকে এতদূর সবল করা, যাহাতে বাহিরের অবস্থাগুলির উপর আমি আধিপত্য করিতে পারি, অর্থাৎ সে আমাকে তিরস্কার করিলেও আমি কিছু কষ্ট অনুভব করিব না। এইরূপেই আমরা প্রকৃতিকে জয় করিবার চেষ্টা করিতেছি। নীতির অর্থ কি? 'নিজ'কে দৃঢ় করা—উহাকে ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার অবস্থা সহাইয়া লওয়া, যেমন তোমাদের বিজ্ঞান বলেন যে, মনুষ্যশরীর কালে সর্ব্বাবস্থাসহনক্ষম হইবে, আর যদি বিজ্ঞানের এ কথা সত্য হয় তবে আমাদের দর্শনের এই সিদ্ধান্ত (অর্থাৎ এমন এক সময় আসিবে যখন আমরা সর্ব্বপ্রকার অবস্থার উপর জয়লাভ করিতে পারিব) অকাট্য যুক্তির উপর স্থাপিত হইল, বলিতে হইবে; কারণ প্রকৃতি সসীম।

এই একটি কথা আবার বুঝিতে হইবে—প্রকৃতি সসীম। প্রকৃতি সসীম কি করিয়া জানিলে? দর্শনের দ্বারা উহা জানা যায়; প্রকৃতি সেই অনন্তেরই সীমাবদ্ধ ভাবমাত্র, অতএব উহা সসীম। অতএব এমন এক সময় আসিবে, যখন আমরা বাহিরের

অবস্থাগুলিকে জয় করিতে পারিব। উহাদিগকে জয় করিবার উপায় কি? আমরা বাস্তবিকপক্ষে বাহিরের বিষয়গুলিতে কোন পরিবর্ত্তন উৎপাদন করিয়া উহাদিগকে জয় করিতে পারি না। ক্ষুদ্রকায় মৎস্যটি তাহার জলস্থ শত্রুগণ হইতে আত্মরক্ষায় ইচ্ছুক। সে কি করিয়া উহা সাধন করে? আকাশে উড়িয়া—পক্ষী হইয়া। মৎস্যটি জল বা বায়ুতে কোন পরিবর্ত্তন সাধন করিল না—পরিবর্ত্তন যাহা কিছু হইল, তাহা তাহার নিজের ভিতরে। পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই 'নিজের' ভিতরই হইয়া থাকে। এইরূপে আমরা দেখিতে পাই, সমুদয় ক্রমবিকাশ-ব্যাপারটিতে 'নিজের' পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়াই প্রকৃতির জয় হইতেছে। এই তত্ত্বটি ধর্ম্ম এবং নীতিতে প্রয়োগ কর—দেখিবে এখানেও 'অশুভজয়' নিজের ভিতরে পরিবর্ত্তনের দ্বারাই সাধিত হইতেছে। সবই নিজের উপর নির্ভর করে, এই 'নিজের'টির উপর ঝোঁক দেওয়াই অদ্বৈতবাদের প্রকৃত দৃঢ় ভূমি। 'অশুভ, দুঃখ'—এ সকল কথা বলাই ভুল, কারণ বহির্জ্জগতে উহাদের কোন অস্তিত্ব নাই। ক্রোধের কারণসমূহ পুনঃ পুনঃ ঘটিলেও ঐসকল ঘটনায় স্থিরভাবে থাকা যদি আমার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা হইলেই আমার কখনই ক্রোধের উদ্রেক হইবে না। এইরূপে লোকে আমাকে যতই ঘৃণা করুক, যদি সে-সকল আমি গায়ে না মাখি, তাহা হইলে আমারও তাহার প্রতি ঘৃণার উদ্রেক হইবে না। এইরূপে 'অশুভজয়' করিতে হয়—নিজের উন্নতির সাধন করিয়া। অতএব তোমরা দেখিতেছ অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্ম্ম, যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই শুধু মেলে তাহা নয়,

বরং ঐসকল সিদ্ধান্ত হইতেও উচ্চতর সিদ্ধান্তসমূহ স্থাপন করে, আর এইজন্যই আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের প্রাণে ইহা খুব লাগিতেছে। তাঁহারা দেখিতেছেন, প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক ধর্ম্মসমূহ তাঁহাদের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে, উহাতে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে না। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদে তাঁহাদের জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিতেছে। শুধু প্রাণের বিশ্বাস থাকিলে মানুষের চলিবে না, এমন বিশ্বাসও থাকা চাই, যাহাতে তাহার জ্ঞানবৃত্তি চরিতার্থ হয়। যদি মানুষকে যাহা দেখিবে তাহাই বিশ্বাস করিতে বলা হয়, তবে সে শীঘ্রই বাতুলালয়ে যাইবে। একবার জনৈক মহিলা আমার নিকট একখানি পুস্তক পাঠাইয়া দেন—তাহাতে লেখা ছিল, সমুদয়ই বিশ্বাস করা উচিত। ঐ পুস্তকে আরও লিখিত ছিল যে, মানুষের আত্মা বা ঐরূপ কিছুর অস্তিত্বই নাই। তবে স্বর্গে দেবদেবীগণ আছেন আর একটি জ্যোতিঃসূত্র আমাদের প্রত্যেকের মস্তকের সহিত স্বর্গের সংযোগ-সাধন করিতেছে। গ্রন্থকর্ত্রী এসকল জানিলেন কিরূপে? তিনি প্রত্যাদিষ্ট হইয়া এসকল তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন আর তিনি আমাকেও এইসকল বিশ্বাস করিতে বলিয়াছিলেন। আমি যখন তাঁহার ঐসকল কথা বিশ্বাস করিতে অস্বীকৃত হইলাম, তিনি বলিলেন, "তুমি নিশ্চিত অতি দুরাচার—তোমার আর কোন আশা নাই।" যাহা হউক, এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও 'আমার পিতৃপিতামহাগত ধর্ম্মই একমাত্র সত্য, অন্য যে-কোন স্থানে যে-কোন ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছে তাহা অবশ্যই মিথ্যা'—এইরূপ ধারণা অনেকস্থলে বর্ত্তমান থাকাতে ইহা বেশ প্রমাণিত হয় যে, আমাদের ভিতর এখনও কতকটা দুর্ব্বলতা রহিয়াছে—এই দুর্ব্বলতা

দূর করিতে হইবে। আমি এরূপ বলিতেছি না যে, এই দুর্ব্বলতা শুধু এই দেশেই (ইংলণ্ড) বিদ্যমান—ইহা সকল দেশেই আছে, আর আমাদের দেশে যেমন, আর কোথাও তেমন নহে—তথায় ইহা অতি ভয়ানক আকারে বর্ত্তমান রহিয়াছে। তথায় অদ্বৈতবাদ কখন সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচারিত হইতে দেওয়া হয় নাই, সন্ন্যাসীরাই অরণ্যে উহার সাধনা করিতেন, সেইজন্যই বেদান্তের এক নাম হইয়াছিল 'আরণ্যক'। অবশেষে ভগবৎকৃপায় বুদ্ধদেব আসিয়া আপামর সাধারণের ভিতর উহা প্রচার করিলেন, তখন সমস্ত জাতি বৌদ্ধধর্ম্মে জাগিয়া উঠিল। অনেক দিন পরে আবার যখন নাস্তিকেরা সমুদয় জাতিকে একেবারে ধ্বংস করিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল, তখন জ্ঞানীরা একমাত্র এই ধর্ম্মকেই ভারতের এই নাস্তিকতান্ধকার-মোচনের একমাত্র উপায় দেখিলেন। দুইবার উহা ভারতকে নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিয়াছিল। প্রথম, বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের ঠিক পূর্ব্বে নাস্তিকতা অতি প্রবল হইয়াছিল—ইউরোপ-আমেরিকার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এখন যেরূপ নাস্তিকতা সেরূপ নাস্তিকতা নহে, উহা হইতে অনেক জঘন্য নাস্তিকতা। আমি একপ্রকারের নাস্তিক, কারণ আমার বিশ্বাস—একমাত্র পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিক নাস্তিকও তাই বলেন, তবে তিনি উহাকে 'জড়' আখ্যা প্রদান করেন, আমি উহাকে 'ব্রহ্ম' বলি। এই জড়বাদী নাস্তিক বলেন—এই জড় হইতেই মানুষের আশা, ভরসা, ধর্ম্ম সবই আসিয়াছে। আমি বলি—ব্রহ্ম হইতে সমুদয় হইয়াছে। আমি এরূপ নাস্তিকতার কথা বলিতেছি না, আমি চার্ব্বাকের মতের কথা

বলিতেছি—খাও দাও মজা উড়াও; ঈশ্বর আত্মা বা স্বর্গ কিছুই নাই; ধর্ম্ম কতকগুলি ধূর্ত্ত দুষ্ট পুরোহিতের কল্পনামাত্র—'যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।'—এইরূপ নাস্তিকতা বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে, উহার এক নাম ছিল—'লোকায়ত-দর্শন'। এই অবস্থায় বুদ্ধদেব আসিয়া সাধারণের মধ্যে বেদান্ত প্রচার করিয়া ভারতবর্ষকে রক্ষা করিলেন। বুদ্ধদেবের তিরোভাবের সহস্র বর্ষ পরে আবার ঠিক এইরূপ ব্যাপার ঘটিল। আচণ্ডাল বৌদ্ধ হইতে লাগিল। নানাবিধ বিভিন্ন জাতি বৌদ্ধ হইতে লাগিল। অনেকে অতি নীচ জাতি হইলেও বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বেশ সদাচারপরায়ণ হইল। ইহাদের কিন্তু নানাপ্রকার কুসংস্কার ছিল—নানাপ্রকার ছিটাফোঁটা, মন্ত্রতন্ত্র, ভূতদেবতায় বিশ্বাস ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মপ্রভাবে ঐগুলি দিনকতক চাপা থাকিল বটে, কিন্তু সেগুলি আবার প্রকাশ হইয়া পড়িল। অবশেষে ভারতে বৌদ্ধধর্ম্ম নানাপ্রকার বিষয়ের খিচুড়ি হইয়া দাঁড়াইল। তখন আবার নাস্তিকতার মেঘে ভারতগগন আচ্ছন্ন হইল—সম্ভ্রান্ত লোক যথেচ্ছাচারী ও সাধারণ লোক কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইল। এমন সময়ে শঙ্করাচার্য্য উঠিয়া বেদান্তের পুনরুদ্দীপন করিলেন। তিনি উহাকে একটি যুক্তিসঙ্গত বিচারপূর্ণ দর্শনরূপে প্রচার করিলেন। উপনিষদে বিচারভাগ বড় অস্ফুট। বুদ্ধদেব উপনিষদের নীতিভাগের দিকে খুব ঝোঁক দিয়াছিলেন, শঙ্করাচার্য্য উহার জ্ঞানভাগের দিকে বেশী ঝোঁক দিলেন। তদ্দ্বারা উপনিষদের সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিবিচারের দ্বারা

প্রমাণিত ও প্রণালীবদ্ধরূপে লোকসমক্ষে স্থাপিত হইয়াছে। ইউরোপেও আজকাল ঠিক সেই অবস্থা উপস্থিত। এই নাস্তিকগণের মুক্তির জন্য—তাহারা যাহাতে বিশ্বাস করে তজ্জন্য—তোমরা জগৎ জুড়িয়া প্রার্থনা করিতে পার, কিন্তু তাহারা বিশ্বাস করিবে না; তাহারা যুক্তি চায়। সুতরাং ইউরোপের মুক্তি এক্ষণে এই বিচারপূত ধর্ম্ম—অদ্বৈতবাদের উপর নির্ভর করিতেছে; আর একমাত্র এই অদ্বৈতবাদ, এই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাবই পণ্ডিতদিগের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ। যখনই ধর্ম্ম লুপ্ত হইবার উপক্রম হয় এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই ইহার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এই জন্যই ইউরোপ ও আমেরিকায় ইহা প্রবেশ লাভ করিয়া দৃঢ়মূল হইতেছে।

কেবল উহাতে একটি জিনিস যোগ দিতে হইবে। প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি অতি উচ্চ কবিত্বপূর্ণ। এই উপনিষদ্বক্তা ঋষিগণ মহাকবি ছিলেন। তোমাদের অবশ্য স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্লেটো বলিয়াছেন—কবিত্বের ভিতর দিয়াও জগতে অলৌকিক সত্যের প্রকাশ হইয়া থাকে। উপনিষদের ঋষিগণকে কবিত্বের মধ্য দিয়া উচ্চতম সত্যসকল জগৎকে দিবার জন্য বিধাতা যেন সাধারণ মানব হইতে বহু উচ্চ পদবীতে আরূঢ় কবিরূপে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রচারও করিতেন না, অথবা দার্শনিক বিচারও করিতেন না, অথবা লিখিতেনও না। তাঁহাদের হৃদয়-উৎস হইতে সঙ্গীতের ফোয়ারা বহিত। তারপর বুদ্ধদেবে আমরা দেখি হৃদয়, অনন্ত সহৃগুণ; তিনি ধর্ম্মকে সর্ব্বসাধারণের উপযোগী করিয়া প্রচার করিলেন।

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন শঙ্করাচার্য্য উহাকে জ্ঞানের প্রখর আলোকে উদ্ভাসিত করিলেন। আমরা এক্ষণে চাই এই প্রখর জ্ঞানসূর্য্যের সহিত বুদ্ধদেবের এই অদ্ভুত হৃদয়—এই অদ্ভুত প্রেম ও দয়া সম্মিলিত হউক। খুব উচ্চ দার্শনিক ভাবও উহাতে থাকুক, উহা বিচারপূত হউক, আবার সঙ্গে সঙ্গে যেন উহাতে উচ্চ হৃদয়, প্রবল প্রেম ও দয়ার যোগ থাকে। তবেই মণিকাঞ্চনযোগ হইবে, তবেই বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম পরস্পরকে কোলাকুলি করিবে। ইহাই ভবিষ্যতের ধর্ম্ম হইবে, আর যদি আমরা উহা ঠিক ঠিক করিয়া তুলিতে পারি, তাহা হইলে নিশ্চয় বলা যাইতে পারে, উহা সর্ব্বকাল ও সর্ব্বাবস্থার উপযোগী হইবে। যদি আপনারা বাড়ী গিয়া স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে দেখিবেন, সকল বিজ্ঞানেরই কিছু না কিছু ত্রুটি আছে। তাহা হইলেও কিন্তু ইহা নিশ্চয় জানিবেন, আধুনিক বিজ্ঞানকে এই এক পথেই আসিতে হইবে; হইবে কি—এখনই প্রায় উহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। যখন কোন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানাচার্য্য বলেন সবই সেই এক শক্তির বিকাশ, তখন কি আপনাদের মনে হয় না যে, তিনি সেই উপনিষদুক্ত ব্রহ্মেরই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছেন?

'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।' কঠ, ২।২।৯ অর্থাৎ যেমন এক অগ্নি জগতে প্রবিষ্ট হইয়া নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, তদ্রূপ সেই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা এক ব্রহ্ম নানারূপে প্রকাশিত হইতেছেন, আবার তিনি জগতের বাহিরেও আছেন। বিজ্ঞানের গতি কোন্ দিকে, তাহা কি আপনারা বুঝিতেছেন না?

হিন্দুজাতি মনস্তত্ত্বের আলোচনা করিতে করিতে দর্শনের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন; ইউরোপীয় জাতি বাহ্য প্রকৃতির আলোচনা করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এক্ষণে উভয়ে এক স্থানে পঁহুছিতেছেন। মনস্তত্ত্বের ভিতর দিয়া আমরা সেই এক অনন্ত সার্ব্বভৌম সত্তায় পৌছিতেছি—যিনি সকল বস্তুর অন্তরাত্মস্বরূপ, যিনি সকলের সার ও সকল বস্তুর সত্যস্বরূপ, যিনি নিত্যমুক্ত, নিত্যানন্দময় ও নিত্যসত্তাস্বরূপ। বাহ্যবিজ্ঞানের দ্বারাও আমরা সেই এক তত্ত্বে পৌছিতেছি। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই একেরই বিকাশ—তিনি জগতে যাহা কিছু আছে, সেই সকলেরই সমষ্টিস্বরূপ। আর সমগ্র মানবজাতিই মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতেছে, বন্ধনের দিকে তাহাদের গতি কখনই হইতে পারে না। মানুষ নীতিপরায়ণ হইবে কেন? কারণ নীতিই মুক্তির এবং দুর্নীতিই বন্ধনের পথ।

অদ্বৈতবাদের আর একটি বিশেষত্ব এই, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের সূত্রপাত হইতেই উহা অন্য ধর্ম্ম বা অন্য মতকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে না। ইহা অদ্বৈতবাদের আর এক মহত্ত্ব—ইহা প্রচার করা মহা সাহসের কার্য্য যে,

'ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোজয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥'—গীতা, ৩।২৬

অর্থাৎ, জ্ঞানী জন অজ্ঞ অতএব কর্ম্মে আসক্ত ব্যক্তিদিগের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না, বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজে যুক্ত থাকিয়া তাহাদিগকে সকলপ্রকার কর্ম্মে নিয়োগ কবিবেন।

অদ্বৈতবাদ ইহাই বলে—কাহারও মতি বিচলিত করিও না,

কিন্তু সকলকেই উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতে সাহায্য কর। অদ্বৈতবাদ যে ঈশ্বর প্রচার করেন তিনি সকল জগতের সমষ্টিস্বরূপ; এই মত যদি সত্য হয়, তবে উহা অবশ্যই সকল মতকে উহার বিশাল উদরে গ্রহণ করিবে। যদি এমন কোন সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম থাকে যাহার লক্ষ্য সকলকেই গ্রহণ করা, তাহাকে কেবল কতকগুলি লোকের গ্রহণোপযোগী ঈশ্বরের ভাববিশেষ প্রচার করিলে চলিবে না, উহা সর্ব্বভাবের সমষ্টি হওয়া আবশ্যক। অন্য কোন মতে এই সমষ্টির ভাব তত পরিস্ফুট নহে। তাহা হইলেও তাঁহারা সকলেই সেই সমষ্টিকে প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। খণ্ডের অস্তিত্ব কেবল এইজন্য যে, উহা সর্ব্বদাই সমষ্টি হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। অদ্বৈতবাদের সহিত এইজন্যই ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রথম হইতেই কোন বিরোধ ছিল না। ভারতে আজকাল অনেক দ্বৈতবাদী রহিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যাও অত্যধিক; ইহার কারণ অশিক্ষিত লোকের মনে স্বভাবতঃই দ্বৈতবাদের উদয় হয়। দ্বৈতবাদীরা বলিয়া থাকেন, ইহা জগতের খুব স্বাভাবিক ব্যাখ্যা কিন্তু এই দ্বৈতবাদীদিগের সহিত অদ্বৈতবাদীর কোনও বিবাদ নাই। দ্বৈতবাদী বলেন, ঈশ্বর জগতের বাহিরে, স্বর্গের মধ্যে স্থানবিশেষে অবস্থিত; অদ্বৈতবাদী বলেন, জগতের ঈশ্বর তাঁহার নিজেরই অন্তরাত্মস্বরূপ, তাঁহাকে দূরবর্ত্তী বলাই যে নাস্তিকতা। তাঁহাকে স্বর্গে বা অপর কোন দূরবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত কি করিয়া বল? তাঁহা হইতে পৃথগ্‌ভাব—ইহা মনে করাও যে ভয়ানক। তিনি অন্যান্য সকল বস্তু অপেক্ষা আমাদের অধিকতর সন্নিহিত। 'তুমিই তিনি'—এই একত্বসূচক বাক্য ব্যতীত কোন

ভাষায় এমন কোন শব্দ নাই, যদ্দ্বারা এই সন্নিহিতত্ব প্রকাশ করা যাইতে পারে। যেমন দ্বৈতবাদী অদ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও উহাকে নাস্তিকতা বলেন, অদ্বৈতবাদীও তদ্রূপ দ্বৈতবাদীর কথায় ভয় পান ও বলিয়া থাকেন—মানুষ কি করিয়া তাঁহাকে নিজের জ্ঞেয় বস্তুর ন্যায় ভাবিতে সাহস করে? তাহা হইলেও তিনি জানেন ধর্ম্মজগতে দ্বৈতবাদের স্থান কোথায়—তিনি জানেন দ্বৈতবাদী তাঁহার দিক হইতে ঠিকই দেখিতেছেন, সুতরাং উহার সহিত তাঁহার কোন বিবাদ নাই। যখন তিনি সমষ্টিভাবে না দেখিয়া ব্যষ্টিভাবে দেখিতেছেন, তখন তাঁহাকে অবশ্যই বহু দেখিতে হইবে। ব্যষ্টিভাবের দিক হইতে দেখিতে গেলে, তাঁহাকে অবশ্যই ভগবানকে বাহিরে দেখিতে হইবে—তাহা না হইয়া যাইতেই পারে না। তিনি বলেন, তাঁহাদিগকে তাঁহাদের মতে থাকিতে দাও। তাহা হইলেও অদ্বৈতবাদী জানেন, দ্বৈতবাদীদের মতে অসম্পূর্ণতা যাহাই থাকুক না কেন, তাঁহারা সকলেই সেই এক চরম লক্ষ্যে চলিয়াছেন। এইখানেই দ্বৈতবাদীর সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ প্রভেদ। পৃথিবীর সকল দ্বৈতবাদীই স্বভাবতঃই এমন একজন সগুণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন, যিনি একজন উচ্চশক্তিসম্পন্ন মনুষ্যমাত্র, আর যেমন মানুষের কতকগুলি প্রিয়পাত্র থাকে আবার কতকগুলি অপ্রিয় থাকে, দ্বৈতবাদীর ঈশ্বরেরও তাহা আছে। তিনি বিনা হেতুতেই কাহারও প্রতি সন্তুষ্ট, আবার কাহারও প্রতি বা বিরক্ত। আপনারা দেখিবেন সকল জাতির মধ্যেই এমন কতকগুলি লোক আছেন যাহারা বলেন, আমরা ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ প্রিয়পাত্র, আর কেহ নহেন; যদি অনুতপ্তহৃদয়ে আমাদের শরণাগত হও, তবেই

আমাদের ঈশ্বর তোমায় কৃপা করিবেন। আবার কতকগুলি দ্বৈতবাদী আছেন, তাঁহাদের মত আরও ভয়ানক। তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর যাঁহাদের প্রতি সদয়, যাঁহারা তাঁহার অন্তরঙ্গ তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছেন—আর কেহ যদি মাথা কুটিয়া মরে, তথাপি ঐ অন্তরঙ্গদলের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। আপনারা দ্বৈতবাদাত্মক এমন কোন ধর্ম্ম দেখান যাহার ভিতর এই সঙ্কীর্ণতা নাই। এইজন্যই এইসকল ধর্ম্ম চিরকালই পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিবে, করিতেছেও। আবার এই দ্বৈতবাদের ধর্ম্ম সকল সময়েই লোকপ্রিয় হয়, তাহার কারণ অশিক্ষিতদিগের ভাব সকল সময়েই লোকপ্রিয় হইয়া থাকে। দ্বৈতবাদী ভাবেন, একজন দণ্ডধারী ঈশ্বর না থাকিলে কোন প্রকার নীতিই দাঁড়াইতে পারে না। মনে কর একটা ঘোড়া—ছেক্ড়া গাড়ীর ঘোড়া—বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিল। সে বলিবে লণ্ডনের লোক বড় খারাপ, কারণ প্রত্যহ তাহাদিগকে চাবুক মারা হয় না। সে নিজে চাবুক খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছে। সে ইহা অপেক্ষা আর অধিক কি বুঝিবে? বাস্তবিক কিন্তু চাবুক লোককে আরও খারাপ করিয়া তোলে। গাঢ় চিন্তায় অক্ষম সাধারণ লোক সকল দেশেই দ্বৈতবাদী হইয়া থাকে। গরীব বেচারারা চিরকাল অত্যাচারিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং তাহাদের মুক্তির ধারণা শাস্তি হইতে অব্যাহতি পাওয়া। অপর পক্ষে আমরা ইহাও জানি সকল দেশেরই চিন্তাশীল মহাপুরুষগণ এই নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব লইয়া কার্য্য করিয়াছেন। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াই ঈশা বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক।' এইরূপ ব্যক্তিই

লক্ষ লক্ষ ব্যক্তির ভিতরে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ। এই শক্তি সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া মানবগণের প্রাণে শুভ পরিত্রাণপ্রদ শক্তিসঞ্চার করিয়া থাকে। আমরা আবার ইহাও জানি, সেই মহাপুরুষই অদ্বৈতবাদী ছিলেন বলিয়া অপরের প্রতিও দয়াশীল ছিলেন। তিনি সাধারণকে 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা'—এ কথাও শিক্ষা দিয়াছেন। সাধারণ লোকদিগকে, যাহারা সগুণ ঈশ্বর হইতে আর কোন উচ্চতর ভাব ধারণা করিতে পারে না, তাহাদিগকে তিনি তাহাদেব স্বর্গস্থ পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিখাইলেন ; কিন্তু ইহাও বলিলেন, "যখন সময় আসিবে তখন তোমরা জানিবে—'আমি তোমাদিগেতে, তোমরা আমাতে', যেন তোমরা সকলেই সেই পিতার সহিত একীভূত হইতে পার, যেমন 'আমি ও আমার পিতা অভেদ।' " বুদ্ধদেব দেবতা, ঈশ্বর প্রভৃতি বড় গ্রাহ্য করিতেন না। সাধারণ লোকে তাঁহাকে নাস্তিক আখ্যা দিয়াছিল, কিন্তু তিনি একটি সামান্য ছাগের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই বুদ্ধদেব মনুষ্যজাতির পক্ষে সর্ব্বোচ্চ যে নীতি গ্রহণীয় হইতে পারে, তাহা প্রচার করিয়াছিলেন। যেখানেই কোনপ্রকার নীতিবিধান দেখিবে, সেখানেই দেখিবে তাঁহার প্রভাব, তাঁহার আলোক। জগতের এইসকল উচ্চহৃদয় ব্যক্তিগণকে তুমি সঙ্কীর্ণ গণ্ডির ভিতরে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পার না, বিশেষতঃ এক্ষণে মনুষ্যজাতির ইতিহাসে এমন এক সময় আসিয়াছে যাহা শতবর্ষ পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই ; এমন সকল জ্ঞানের উন্নতি হইয়াছে, এমন সকল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে যাহা এমন কি পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ব্বে কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এ সময় কি

আর লোককে এরূপ সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায়? লোকে পশুতুল্য চিন্তাহীন জড়পদার্থে পরিণত না হইলে ইহা অসম্ভব। এখন আবশ্যক—উচ্চতম জ্ঞানের সহিত উচ্চতম হৃদয়, অনন্ত জ্ঞানের সহিত অনন্ত প্রেমের যোগ। সুতরাং বেদান্তবাদী বলেন, সেই অনন্ত সত্তার সহিত একীভূত হওয়াই একমাত্র ধর্ম্ম; আর তিনি ভগবানের গুণ কেবল এই কয়েকটি বলেন—অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ; আর তিনি বলেন, এই তিনই এক। জ্ঞান ও আনন্দ ব্যতীত সত্তা কখন থাকিতে পারে না। জ্ঞানও আনন্দ বা প্রেম ব্যতীত এবং আনন্দও কখন জ্ঞান ব্যতীত থাকিতে পারে না। আমরা চাই এই সম্মিলন—এই অনন্ত সত্তা, জ্ঞান ও আনন্দের চরমোন্নতি—একদেশী উন্নতি নহে। আমরা চাই—সকল বিষয়ের সমভাবে উন্নতি। বুদ্ধদেবের ন্যায় মহান্ হৃদয়ের সহিত মহা জ্ঞানের যোগ হওয়া সম্ভব। আশা করি, আমরা সকলেই সেই এক লক্ষ্যে পৌঁছিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিব।

# জগৎ

## বহির্জ্জগৎ

সুন্দর কুসুমরাশি চতুর্দ্দিকে সুবাস ছড়াইতেছে, প্রভাতারুণ অতি সুন্দর লোহিতবর্ণ ধরিয়া উঠিতেছে। প্রকৃতি নানা বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত হইয়া পরম শোভাশালিনী হইয়াছে। সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডই সুন্দর, আর মানুষ পৃথিবীতে আসিয়া অবধি এই সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতেছে। গম্ভীরভাবব্যঞ্জক ও ভয়োদ্দীপক শৈলমালা, প্রবল খরবাহিনী সমুদ্রাভিমুখগামিনী স্রোতস্বিনী, পদচিহ্নহীন মরুদেশ, অনন্ত অসীম সাগর, তারকারাজিমণ্ডিত গগন—এ সকলই গম্ভীরভাবপূর্ণ ও ভয়োদ্দীপক অথচ মনোহর; প্রকৃতিশব্দব্যঞ্জিত সমুদয় অস্তিত্বসমষ্টি স্মৃতিপথাতীত সময় হইতে মানবমনের উপর কার্য্য করিতেছে, উহা মানবচিন্তার উপর ক্রমাগত প্রভাব বিস্তার করিতেছে, আর ঐ প্রভাবের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ক্রমাগত মানবহৃদয়ে এই প্রশ্ন উঠিতেছে—উহারা কি এবং উহাদের উৎপত্তিই বা কোথা হইতে? অতি প্রাচীন মানবরচনা বেদের প্রাচীন ভাগেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত দেখিতে পাই। কোথা হইতে ইহা আসিল? যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না, তম তমে আবৃত ছিল, তখন কে এই জগৎ সৃজন করিল? কেমন করিয়াই বা করিল? কে এই রহস্য জানেন? বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত এই

প্রশ্ন চলিয়া আসিয়াছে; লক্ষ লক্ষ বার ইহার উত্তরের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু আবার লক্ষ লক্ষ বার উহার উত্তর দিতে হইবে। ঐ প্রত্যেক উত্তরই যে ভ্রমপূর্ণ, তাহা নহে। প্রত্যেক উত্তরে কিছু না কিছু সত্য আছে—কালের আবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সত্যও ক্রমশঃ বল সংগ্রহ করিবে। আমি ভারতের প্রাচীন দার্শনিকগণের নিকট ঐ প্রশ্নের যে উত্তর সংগ্রহ করিয়াছি, বর্ত্তমান মানবজ্ঞানের সহিত মিলাইয়া তাহা আপনাদের সমক্ষে স্থাপনের চেষ্টা করিব।

আমরা দেখিতে পাই, এই প্রাচীনতম প্রশ্নের কতকগুলি বিষয় পূর্ব্ব হইতেই জ্ঞাত ছিল। প্রথম এই, 'যখন অস্তি নাস্তি কিছুই ছিল না'—এই প্রাচীন বৈদিক বাক্য হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে, এক সময়ে যে জগৎ ছিল না—এই গ্রহ-জ্যোতিষ্কগণ, আমাদের জননী, ধরণী, সাগর, মহাসাগর, নদী, শৈলমালা, নগর, গ্রাম, মানবজাতি, ইতরপ্রাণী, উদ্ভিদ, বিহঙ্গ, এই অনন্ত বহুধা সৃষ্টি, এসকল যে এক সময় ছিল না, এ বিষয় পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিল। আমরা কি এ বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ? কি করিয়া এই সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হওয়া গেল, তাহা আমরা বুঝিতে চেষ্টা করিব। মানুষ আপন চতুর্দ্দিকে দেখে কি? একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লও। মানুষ দেখে, উদ্ভিদটি ধীরে ধীরে মাটি ঠেলিয়া উঠিতে থাকে, শেষে বাড়িতে বাড়িতে অবশেষে হয়ত একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, আবার মরিয়া যায়—রাখিয়া যায় কেবল বীজ। উহা যেন ঘুরিয়া ফিরিয়া একটি বৃত্ত সম্পূরণ করে। বীজ হইতে উহা আসে, বৃক্ষ হইয়া দাঁড়ায়, অবশেষে বীজে উহার পুনঃ

পরিণাম। একটি পাখীকে দেখ, কেমন উহা ডিম্ব হইতে জন্মায়, সুন্দর পক্ষিরূপ ধরে, কিছুদিন বাঁচিয়া থাকে, পরে আবার মরিয়া যায়, রাখিয়া যায় কেবল অপর কতকগুলি ডিম্ব, ভবিষ্যৎ পক্ষিকুলের বীজ। তির্য্যগ্‌জাতি সম্বন্ধেও এইরূপ, মানুষ সম্বন্ধেও তাহাই। প্রত্যেক পদার্থেরই যেন কতকগুলি বীজ, কতকগুলি মূল উপাদান, কতকগুলি সূক্ষ্ম আকার হইতে আরম্ভ, উহারা স্থূলাৎ স্থূলতর হইতে থাকে, কিছুকালের জন্য ঐরূপে চলে, পুনরায় ঐ সূক্ষ্মরূপে চলিয়া গিয়া উহাদের লয় হয়। বৃষ্টির ফোঁটাটি, যাহার ভিতরে এক্ষণে সুন্দর সূর্য্যকিরণ খেলিতেছে, বাতাসে অনেক দূরে চলিয়া গিয়া পাহাড়ে পৌঁছে, সেখানে উহা বরফে পরিণত হয়, আবার জল হয়, আবার শত শত মাইল ঘুরিয়া উহার উৎপত্তিস্থান সমুদ্রে পৌঁছে। আমাদের চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির সকল বস্তু সম্বন্ধেই এইরূপ; আর আমরা জানি, বর্ত্তমানকালে হিমশিলা ও নদীসমূহ বড় বড় পর্ব্বতসমূহের উপর কার্য্য করিতেছে, উহারা ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে তাহাদিগকে গুঁড়াইতেছে, গুঁড়াইয়া বালি করিতেছে, সেই বালি আবার সমুদ্রে বহিয়া চলিতেছে—সমুদ্রতলে স্তরে স্তরে জমিতেছে, পরিশেষে আবার পাহাড়ের ন্যায় শক্ত হইতেছে, ভবিষ্যতে আবার ফাঁপিয়া উঠিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয়দের পর্ব্বত হইবে বলিয়া। আবার উহা পিষ্ট হইয়া গুঁড়া হইবে—এইরূপ চলিবে। বালুকা হইতে এই শৈলমালার উদ্ভব আবার বালুকারূপে পরিণতি। বড় বড় জ্যোতিষ্কগণ সম্বন্ধেও তাহাই; আমাদের এই পৃথিবীও নীহারিকাময় পদার্থবিশেষ হইতে আসিয়াছে—ক্রমশঃ শীতল হইতে শীতলতর হইয়াছে, পরে

আমাদের নিবাস-ভূমিরূপা এই বিশেষাকৃতিবিশিষ্টা ধরণী হইয়াছে। ভবিষ্যতে উহা আবার শীতল হইতে শীতলতর হইয়া নষ্ট হইবে, খণ্ড খণ্ড হইবে, গুঁড়াইবে, শেষে সেই মূল নীহারিকাময় সূক্ষ্মরূপে যাইবে। প্রতিদিন আমাদের সম্মুখে ইহা ঘটিতেছে। স্মরণাতীত কাল হইতেই ইহা হইতেছে। ইহাই মানবের সমগ্র ইতিহাস, ইহাই প্রকৃতির সমগ্র ইতিহাস, ইহাই জীবনের সমগ্র ইতিহাস।

যদি ইহা সত্য হয় যে, প্রকৃতি তাহার সকল কার্য্যেই সমপ্রণালীক (uniform); যদি ইহা সত্য হয় এবং এ পর্য্যন্ত কোন মনুষ্যজ্ঞানই ইহা খণ্ডন করে নাই যে, একটি ক্ষুদ্র বালুকণা যে প্রণালী ও যে নিয়মে সৃষ্ট, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সূর্য্য, তারা, এমন কি সমুদয় জগদ্ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেও সেই প্রণালী, একই নিয়ম; যদি ইহা সত্য হয় যে, একটি পরমাণু যে কৌশলে নির্ম্মিত, সমুদয় জগৎও সেই কৌশলে নির্ম্মিত; যদি ইহা সত্য হয় যে, একই নিয়ম সমুদয় জগতে প্রতিষ্ঠিত, তবে প্রাচীন বৈদিক ভাষায় আমরা বলিতে পারি—'একখণ্ড মৃত্তিকাকে জানিয়া আমরা জগদ্ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমুদয় মৃত্তিকাকে জানিতে পারি।' একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদ লইয়া উহার জীবন-চরিত আলোচনা করিলে আমরা জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের স্বরূপ জানিতে পারি। একটি বালুকণার গতি-পর্য্যবেক্ষণে সমুদয় জগতের রহস্য জানিতে পারা যাইবে। সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব আলোচনার ফল সমগ্র জগদ্ব্রহ্মাণ্ডের উপর প্রয়োগ করিয়া প্রথমতঃ ইহাই পাইতেছি যে, সকলই আদি ও অন্তে প্রায় সদৃশ। পর্ব্বতের উৎপত্তি বালুকা হইতে, বালুকায় আবার উহার পরিণাম;

নদী হয় বাষ্প হইতে, যায় আবার বাষ্পে ; উদ্ভিদ্‌জীবন আসে বীজ হইতে, যায় আবার বীজেই ; মানবজীবন আসে মনুষ্যজীবাণু হইতে, যায় আবার জীবাণুতে। নক্ষত্রপুঞ্জ, নদী, গ্রহ, উপগ্রহ নীহারিকাময় অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যায় আবার সেই নীহারিকাময় অবস্থায়। ইহাতে আমরা শিখি কি ? শিখি এই যে, ব্যক্ত অর্থাৎ স্থূল অবস্থা—কার্য্য ; সূক্ষ্মভাব—উহার কারণ। সর্ব্বদর্শনের জনকস্বরূপ মহর্ষি কপিল অনেক দিন পূর্ব্বে প্রমাণ করিয়াছেন, 'নাশঃ কারণলয়ঃ'।

যদি এই টেবিলটি নাশ হয় ত উহা কেবল উহার কারণরূপে পুনরাবর্ত্তিত হইবে মাত্র—সেই সূক্ষ্মরূপও পরমাণুতে ফিরিয়া যাইবে যাহাদের সম্মিলনে এই টেবিল নামক পদার্থটি উৎপন্ন হইয়াছিল। মানুষ যখন মরে তখন যেসকল ভূতে তাহার দেহ নির্ম্মিত তাহাতে তাহার পুনরাবৃত্তি হয়। এই পৃথিবীর ধ্বংস হইলে, যে ভূতসমষ্টি উহাকে এই আকার দিয়াছিল তাহাতে পুনরাবর্ত্তন করিবে। ইহাকেই নাশ বলে—কারণলয়। সুতরাং আমরা শিখিলাম, কার্য্য কারণের সহিত অভেদ—ভিন্ন নহে, কারণটিই রূপ-বিশেষ ধারণ করিয়া কার্য্য নামে পরিচিত হয়। যে উপাদানগুলিতে ঐ টেবিলের উৎপত্তি তাহাই কারণ, আর টেবিলটি কার্য্য—এবং ঐ কারণগুলি এখানে টেবিলরূপে বর্ত্তমান। এই গেলাসটি একটি কার্য্য—উহার কতকগুলি কারণ ছিল, সেই কারণগুলি এই কার্য্যে এখনও বর্ত্তমান দেখিতেছি। 'গেলাস' (কাচ) নামক কতকটা জিনিস আর তৎসঙ্গে গঠনকারীর হস্তস্থ শক্তি এই দুইটি কারণ—নিমিত্ত ও উপাদান এই দুই কারণ মিলিয়া গেলাস নামক এই

আকারটি হইয়াছে। ঐ দুই কারণই বর্ত্তমান। যে শক্তিটি কোন যন্ত্রের চাকায় ছিল তাহা সংহতিশক্তিরূপে বর্ত্তমান—তাহা না থাকিলে গেলাসের ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডগুলির সব খসিয়া পড়িবে—এবং ঐ 'গেলাস'রূপ উপাদানটিও বর্ত্তমান। গেলাসটি কেবল ঐ সূক্ষ্ম কারণগুলির আর একরূপে পরিণতি এবং যদি এই গেলাসটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তবে যে শক্তিটি সংহতিরূপে উহাতে বর্ত্তমান ছিল, তাহা ফিরিয়া পুনঃ নিজ উপাদানে মিশিবে, আর গেলাসের ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি আবার পূর্ব্বরূপ ধরিবে ও সেইরূপেই থাকিবে, যতদিন না পুনরায় নবরূপ ধরে।

অতএব আমরা পাইলাম, কার্য্য কখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে। উহা সেই কারণের পুনরাবির্ভাব মাত্র। তাহার পর আমরা শিখিলাম এই ক্ষুদ্র বিশেষ বিশেষ রূপসকল, যাহাদিগকে আমরা উদ্ভিদ বা তির্য্যগ্‌জাতি বা মানব বলি, তাহারা অনন্তকাল ধরিয়া উঠিয়া পড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে। বীজ হইতে বৃক্ষ হইল। বৃক্ষ আবার বীজ হয়, আবার উহা আর এক বৃক্ষ হয়—আবার অন্য বীজ হয়, আবার আর এক বৃক্ষ হয়—এইরূপ চলিতেছে, ইহার শেষ নাই। জলবিন্দু পাহাড়ের গা গড়াইয়া সমুদ্রে যায়, আবার বাষ্প হইয়া উঠে—পাহাড়ে যায়, আবার নদীতে ফিরিয়া আসে। উঠিতেছে, পড়িতেছে—যুগচক্র চলিতেছে। সমুদয় জীবন সম্বন্ধেই এইরূপ—সমুদয় অস্তিত্ব, যাহা কিছু দেখিতে, ভাবিতে, শুনিতে বা কল্পনা করিতে পারি, যাহা কিছু আমাদের জ্ঞানের সীমার মধ্যে তাহাই এইরূপে চলিতেছে ঠিক যেমন মনুষ্যদেহে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস। সমুদয় সৃষ্টিই সুতরাং এইরূপে চলিয়াছে, একটি তরঙ্গ

উঠিতেছে, একটি পড়িতেছে, আবার উঠিয়া আবার পড়িতেছে। প্রত্যেক তরঙ্গেরই সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া অবনতি, প্রত্যেক অবনতির সঙ্গে সঙ্গে একটি করিয়া তরঙ্গ। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডেই উহার সমপ্রণালীকতাহেতু একই নিয়ম খাটিবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যেন এককালে স্বকারণে লীন হইতে বাধ্য; সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, পৃথিবী, মন, শরীর—যাহা কিছু এই ব্রহ্মাণ্ডে আছে সমস্ত বস্তুই নিজ সূক্ষ্ম কারণে লীন বা তিরোভূত হইবে—আপাতদৃষ্টিতে যেন বিনষ্ট হইবে। বাস্তবিক কিন্তু উহারা উহাদের কারণে সূক্ষ্মরূপে থাকিবে; উহা হইতে আবার তাহারা উহার বাহির হইবে, আবার পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, এমন কি সমগ্র জগৎ প্রসব করিবে।

এই উত্থান-পতন সম্বন্ধে আর একটি বিষয় জানিবার আছে। বীজ বৃক্ষ হইতে আসে। উহা অমনি তৎক্ষণাৎ বৃক্ষ হয় না। উহার কতকটা বিশ্রামের বা অতি সূক্ষ্ম অব্যক্ত কার্য্যের জন্য সময়ের আবশ্যক। বীজকে খানিকক্ষণ মাটির নীচে থাকিয়া কার্য্য করিতে হয়। উহার আপনাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতে হয়, যেন আপনাকে খানিকটা অবনত করিতে হয়, আর ঐ অবনতি হইতে উহার পুনরুন্নতি হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডকেই কিছু সময় অদৃশ্য অব্যক্তভাবে সূক্ষ্মরূপে কার্য্য করিতে হয়, যাহাকে প্রলয় বা সৃষ্টির পূর্ব্বাবস্থা বলে, তাহার পর আবার পুনঃসৃষ্টি হয়। জগৎপ্রবাহের একটি প্রকাশকে—অর্থাৎ সূক্ষ্ম ভাবে পরিণতি, কিছুকাল তদবস্থায় অবস্থান, আবার পুনরাবির্ভাব—ইহাকেই কল্প বলে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এইরূপে কল্পে কল্পে

চলিয়াছে। প্রকাণ্ডতম ব্রহ্মাণ্ড হইতে উহার অন্তর্বর্ত্তী প্রত্যেক পরমাণু পর্য্যন্ত সব জিনিসই এই তরঙ্গাকারে চলিয়াছে।

এক্ষণে আবার একটি গুরুতর প্রশ্ন আসিল—বিশেষতঃ বর্ত্তমান কালের পক্ষে। আমরা দেখিতেছি সূক্ষ্মতর রূপগুলি ধীরে ধীরে ব্যক্ত হইতেছে, ক্রমশঃ স্থূলাৎ স্থূলতর হইতেছে। আমরা দেখিয়াছি যে, কারণ ও কার্য্য অভেদ—কার্য্য কেবল কারণের রূপান্তর মাত্র। অতএব এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড শূন্য হইতে প্রসূত হইতে পারে না। কিছুই কারণ ব্যতীত আসিতে পারে না; শুধু তাহা নহে, কারণটিই কার্য্যের ভিতর সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান। তবে এই ব্রহ্মাণ্ড কোন্ বস্তু হইতে প্রসূত হইয়াছে? পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড হইতে। মানুষ কোন্ বস্তু হইতে প্রসূত? পূর্ব্ববর্ত্তী সূক্ষ্মরূপ হইতে। বৃক্ষ কাহা হইতে হইল? বীজ হইতে। বৃক্ষটি সমুদয় বীজে বর্ত্তমান ছিল—উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র। অতএব এই জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড এই জগতেরই সূক্ষ্মাবস্থা হইতে প্রসূত হইয়াছে। এক্ষণে উহা ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র, উহা পুনরায় ঐ সূক্ষ্মরূপে যাইবে, আবার ব্যক্ত হইবে। এক্ষণে আমরা দেখিলাম, সূক্ষ্মরূপগুলি ব্যক্ত হইয়া স্থূলাৎ স্থূলতর হয়, যতদিন না উহারা উহাদের চরম সীমায় পৌঁছে; চরমে পৌঁছিলে, তাহারা আবার পালটিয়া সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হয়। এই সূক্ষ্ম হইতে আবির্ভাব, ক্রমশঃ স্থূল হইতে স্থূলতররূপে পরিণতি কেবল যেন উহাদের অংশগুলির অবস্থান-পরিবর্ত্তন—ইহাকেই বর্ত্তমানকালে 'ক্রমবিকাশ'-বাদ বলে। ইহা অতি সত্য, সম্পূর্ণরূপে সত্য; আমরা আমাদের জীবনে ইহা দেখিতেছি; বিচারশীল কোন ব্যক্তিরই এই 'ক্রমবিকাশ'-

বাদীদের সহিত বিবাদের সম্ভাবনা নাই। কিন্তু আমাদিগকে আরও একটি বিষয় জানিতে হইবে—তাহা এই যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্ব্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্ত্তমান। বীজ বৃক্ষের জনক বটে, কিন্তু অপর এক বৃক্ষ আবার ঐ বীজের জনক। বীজই সেই সূক্ষ্মরূপ, যাহা হইতে বৃহৎ বৃক্ষটি আসিয়াছে, আবার আর একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষ ঐ বীজরূপে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছে। সমুদয় বৃক্ষটিই ঐ বীজে বর্ত্তমান। শূন্য হইতে কোন বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, কিন্তু আমরা দেখিতেছি বৃক্ষ বীজ হইতে উৎপন্ন হয়, আর বীজবিশেষ হইতে বৃক্ষবিশেষই উৎপন্ন হয়, অন্য বৃক্ষ হয় না। ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, সেই বৃক্ষের কারণ ঐ বীজ—কেবল ঐ বীজমাত্র; আর সেই বীজে সমুদয় বৃক্ষটিই রহিয়াছে। সমুদয় মানুষটাই ঐ এক জীবাণুর ভিতরে, ঐ জীবাণুই আবার ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া মানবাকারে পরিণত হয়। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ডে রহিয়াছে। সবই কারণে, উহার সূক্ষ্মরূপে রহিয়াছে। অতএব 'ক্রমবিকাশ'বাদ, স্থূলাৎ স্থূলতররূপে ক্রমপ্রকাশ—এই মত সত্য। উহা সম্পূর্ণরূপে সত্য; তবে ঐ সঙ্গে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্ব্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া রহিয়াছে; অতএব যে ক্ষুদ্র অণুটি পরে মহাপুরুষ হইল, উহা প্রকৃতপক্ষে সেই মহাপুরুষেরই ক্রমসঙ্কুচিত ভাব, উহাই পরে মহাপুরুষরূপে ক্রমবিকাশ প্রাপ্ত হয়। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে আমাদের ক্রমবিকাশবাদীদের ( Darwin's Evolution ) সহিত কোন বিবাদ নাই, কারণ আমরা ক্রমশঃ দেখিব, যদি তাঁহারা এই ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়াটি অঙ্গীকার

করেন, তবে তাঁহারা ধর্মের বিনাশকর্তা না হইয়া উহার প্রবল সহায়ক হইলেন।

এতদূর আমরা দেখিলাম শূন্য হইতে কিছুর উৎপত্তি হইল, এই হিসাবে সৃষ্টি হইতে পারে না। সকল জিনিসই অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে এবং অনন্তকাল ধরিয়া থাকিবে। কেবল তরঙ্গের ন্যায় একবার উঠিতেছে, আবার পড়িতেছে। সূক্ষ্ম অব্যক্তভাবে একবার গতি, আবার স্থূল ব্যক্তভাবে আগমন, সমুদয় প্রকৃতিতেই এই ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া চলিতেছে। সুতরাং সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশের পূর্ব্বে অবশ্যই ক্রমসঙ্কুচিত বা অব্যক্ত অবস্থায় ছিল, এক্ষণে বিভিন্নরূপে ব্যক্ত হইয়াছে—আবার ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অব্যক্তভাব ধারণ করিবে। উদাহরণস্বরূপ একটি ক্ষুদ্র উদ্ভিদের জীবন ধর। আমরা দেখি দুইটি বিষয় একত্র মিলিত হইয়াই ঐ উদ্ভিদকে এক অখণ্ড বস্তুরূপে প্রতীত করাইতেছে—উহার উৎপত্তি ও বিকাশ আর উহার ক্ষয় ও বিনাশ। এই দুইটি মিলিয়াই উদ্ভিদ্-জীবন নামক এই একত্ব বিধান করিতেছে। এইরূপে ঐ উদ্ভিদ্-জীবনকে প্রাণ-শৃঙ্খলের একটি পর্ব্ব বলিয়া ধরিয়া আমরা সমুদয় বস্তুরাশিকেই এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া কল্পনা করিতে পারি—জীবাণু হইতে উহার আরম্ভ এবং পূর্ণমানবে উহার সমাপ্তি। মানুষ ঐ শৃঙ্খলের একটি পর্ব্ব; আর যেমন ক্রমবিকাশবাদীরা বলেন—নানারূপ বানর, তার পর আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী এবং উদ্ভিদ্‌গণ যেন ঐ প্রাণ-শৃঙ্খলের অন্যান্য পর্ব্বসমূহ। এক্ষণে যে ক্ষুদ্রতম খণ্ড হইতে আমরা আরম্ভ করিয়াছিলাম, তথা হইতে এই সমুদয়কে এক প্রাণপ্রবাহ বলিয়া ধর

আর প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্ব্বেই যে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বিদ্যমান, ইতঃপূর্ব্ব-লব্ধ ঐ নিয়ম এস্থলে প্রয়োগ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, অতি নিম্নতম জন্তু হইতে সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতম মানুষ পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্যই অপর কিছুর ক্রমসঙ্কোচ হইবে। কিসের ক্রমসঙ্কোচভাব? ইহাই প্রশ্ন। কোন্ পদার্থ ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিল? ক্রমবিকাশবাদী তোমাদিগকে বলিবেন, তোমাদের ঈশ্বরধারণা ভুল। কারণ তোমরা বল, চৈতন্যই জগতের স্রষ্টা কিন্তু আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি যে, চৈতন্য অনেক পরে আসে। মানুষে ও উচ্চতর জন্তুতেই কেবল আমরা চৈতন্য দেখিতে পাই, কিন্তু এই চৈতন্য জন্মিবার পূর্ব্বে এই জগতে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে। যাহা হউক, তোমরা এই ক্রমবিকাশবাদীদেব কথায় ভয় পাইও না, তোমরাও এই মাত্র যে নিয়ম আবিষ্কার করিলে, তাহা প্রয়োগ করিয়া দেখ—কি সিদ্ধান্ত দাঁড়ায়। তোমরা ত দেখিয়াছ, বীজ হইতে বৃক্ষের উদ্ভব আবার বীজে উহার পরিণাম—সুতরাং আরম্ভ ও পরিণাম সমান। পৃথিবীর উৎপত্তি তাহার কারণ হইতে, আবার কারণেই উহার বিলয়। সকল বস্তু সম্বন্ধেই এই কথা—আমরা দেখিতেছি আদি অন্ত উভয়ই সমান। এই সমুদয় শৃঙ্খলের শেষ কি? আমরা জানি, আরম্ভ জানিতে পারিলে আমরা পরিণামও জানিতে পারিব। এইরূপে অন্ত জানিতে পারিলেই আদি জানিতে পারিব। এই সমুদয় 'ক্রমবিকাশশীল' জীব-প্রবাহের—যাহার এক প্রান্ত জীবাণু, অপর প্রান্ত পূর্ণমানব—এই সমুদয়কে একটি বস্তু বলিয়া ধর। এই শ্রেণীর অন্তে আমরা পূর্ণ মানবকে দেখিতেছি, সুতরাং

আদিতেও যে তিনি অবস্থিত, ইহা নিশ্চিত। অতএব ঐ জীবাণু অবশ্যই উচ্চতম চৈতন্যের ক্রমসঙ্কুচিত অবস্থা। তোমরা ইহা স্পষ্টরূপে না দেখিতে পার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেই ক্রমসঙ্কুচিত চৈতন্যই আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে, আর এইরূপে আপনাকে অভিব্যক্ত করিয়া চলিবে, যতদিন না উহা পূর্ণতম মানবরূপে অভিব্যক্ত হয়। এই তত্ত্ব গণিতের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা যাইতে পারে। যদি শক্তিসাতত্যের নিয়ম ( Law of Conservation of Energy ) সত্য হয়, তবে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, যদি তুমি কোন যন্ত্রে পূর্ব্ব হইতেই কোন শক্তিপ্রয়োগ না করিয়া থাক, তবে তুমি উহা হইতে কোন কার্য্যই পাইতে পার না। তুমি এঞ্জিনে জল ও কয়লারূপে যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ করিয়াছিলে, উহা হইতে ঠিক ততটুকু কার্য্য পাইয়া থাক—একচুল বেশীও নয়, কমও নয়। আমি আমার দেহের ভিতরে বায়ু, খাদ্য ও অন্যান্য পদার্থরূপে যতটুকু শক্তিপ্রয়োগ করিয়াছি, ঠিক ততটুকু কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেছি। কেবল ঐ শক্তিগুলি অন্যরূপে পরিণত হইয়াছে মাত্র। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একবিন্দু জড় বা এতটুকুও শক্তি বাড়াইতে অথবা কমাইতে পারা যায় না। যদি তাহাই হয়, তবে এই চৈতন্য কি? যদি উহা জীবাণুতে বর্ত্তমান না থাকে, তবে উহাকে অবশ্যই আকস্মিক উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে—তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, অসৎ ( কিছু না ) হইতে সতের ( কিছুর ) উৎপত্তি হয়, কিন্তু তাহা অসম্ভব। তাহা হইলে ইহা একেবারে নিঃসন্দিগ্ধভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে—যেমন অন্য অন্য বিষয়ে দেখি, যেখানে আরম্ভ, সেইখানেই শেষ; তবে

কখন অব্যক্ত, কখন বা ব্যক্ত—সেইরূপ পূর্ণমানব, মুক্তপুরুষ, দেবমানব, যিনি প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে গিয়াছেন, যিনি সমুদয় অতিক্রম করিয়াছেন, যাঁহাকে আর এই জন্মমৃত্যুর ভিতর দিয়া যাইতে হয় না, যাঁহাকে খ্রীষ্টীয়ানরা খ্রীষ্টমানব বলেন, বৌদ্ধগণ বুদ্ধমানব বলেন, যোগীরা মুক্ত বলেন, সেই পূর্ণমানব এই শৃঙ্খলের এক প্রান্ত, আর তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া শৃঙ্খলের অপর প্রান্তে জীবাণুরূপে প্রকাশিত।

এক্ষণে এই ব্রহ্মাণ্ডের কারণ সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্ত হইল—আলোচনা করা যাউক। এই জগতের শেষ পরিণাম কি ?—চৈতন্য। তাহা নয় কি ? জগতের সব শেষ হইতেছে চৈতন্য। আর যখন ঐ চৈতন্য ক্রমবিকাশবাদীদের মতে সৃষ্টির শেষ বস্তু হইল, তাহা হইলে চৈতন্যই আবার সৃষ্টির নিয়ন্তা—সৃষ্টির কারণ হইবে। মানুষ জগৎ-সম্বন্ধে চরম ধারণা কি করিতে পারে ? মানুষ এই ধারণা করিতে পারে যে, জগতের এক অংশ অপর অংশের সহিত সম্বদ্ধ—জগতের প্রত্যেক বস্তুতেই জ্ঞানের ক্রিয়া প্রকাশিত। প্রাচীন 'উদ্দেশ্য-বাদ' (Design Theory) এই ধারণারই অস্ফুট আভাস। আমরা জড়বাদীদের সহিত মানিয়া লইতেছি যে, চৈতন্যই জগতের শেষ বস্তু—সৃষ্টিক্রমের ইহাই শেষ বিকাশ, কিন্তু ঐ সঙ্গে আমরা ইহাও বলিয়া থাকি যে, ইহাই যদি শেষ বিকাশ হয় তবে আদিতেই ইহা বর্ত্তমান ছিল। জড়বাদী বলিতে পারেন, বেশ কথা কিন্তু মানুষ জন্মিবার পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ বর্ষ অতীত হইয়াছে, তখন ত জ্ঞানের অস্তিত্ব ছিল না। এ কথায় আমাদের উত্তর এই, ব্যক্ত চৈতন্য কখন ছিল না বটে কিন্তু অব্যক্ত চৈতন্য ছিল—আর সৃষ্টির

শেষ—পূর্ণমানবরূপে প্রকাশিত চৈতন্য; তবে আদি কি হইল? আদিও চৈতন্য। প্রথমে সেই চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হয়, শেষে আবার উহাই ক্রমবিকশিত হয়। অতএব এই জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এক্ষণে যে-সমুদয় জ্ঞানরাশি অভিব্যক্ত হইতেছে, তাহার সমষ্টি অবশ্যই সেই ক্রমসঙ্কুচিত সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের অভিব্যক্তি মাত্র। এই সর্ব্বব্যাপী বিশ্বজনীন চৈতন্যের নাম ঈশ্বর। উহাকে অন্য যে-কোন নামে অভিহিত কর না কেন, ইহা স্থির যে, আদিতে সেই অনন্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য ছিলেন। সেই বিশ্বজনীন চৈতন্য ক্রমসঙ্কুচিত হইয়াছিলেন, আবার তিনিই আপনাকে ক্রমশঃ অভিব্যক্ত করিতেছেন—যতদিন না তিনি পূর্ণমানব, খ্রীষ্টমানব, বুদ্ধমানবে পরিণত হন। তখন তিনি নিজ উৎপত্তিস্থানে ফিরিয়া আসেন। এই জন্য সকল শাস্ত্রই বলেন, "আমরা তাঁহাতে জীবিত, তাঁহাতেই থাকিয়া চলিতেছি, তাঁহাতেই আমাদের সত্তা।" এই জন্যই সকল শাস্ত্রই বলেন, আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি এবং তাহাতেই ফিরিয়া যাইব।" বিভিন্ন পরিভাষা দেখিয়া ভয় পাইও না—পরিভাষায় যদি ভয় পাও, তবে তোমরা দার্শনিক হইবার যোগ্য হইতে পারিবে না। এ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই ব্রহ্মবাদীরা ঈশ্বর বলিয়া থাকেন।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আপনি পুরাতন 'ঈশ্বর' ( God ) শব্দটি ব্যবহার করেন কেন? ইহার উত্তর এই, পূর্ব্বোক্ত বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বুঝাইতে যত শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে, তন্মধ্যে উহাই সর্ব্বোত্তম। উহা অপেক্ষা ভাল শব্দ আর খুঁজিয়া পাইবে না, কারণ মানুষের সকল আশা-ভরসা, সকল সুখ

ঐ এক শব্দের উপর কেন্দ্রীভূত। এখন ঐ শব্দ পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। যখন বড় বড় সাধুমহাত্মারা ঐরূপ শব্দ গড়েন, তখন তাঁহারা উহাদের অর্থ খুব ভালরূপেই বুঝিতেন। ক্রমে সমাজে যখন ঐ শব্দগুলি প্রচারিত হইয়া পড়িল, তখন অজ্ঞলোকে ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করিতে লাগিল। তাহার ফলে শব্দগুলির মহিমা হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। 'ঈশ্বর' শব্দটি স্মরণাতীত কাল হইতে আসিয়াছে, আর যাহা কিছু মহৎ ও পবিত্র, আর এক সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের ভাব, ঐ শব্দের ভিতর রহিয়াছে। কোন নির্ব্বোধ ঐ শব্দ-ব্যবহারে আপত্তি করিলেই কি উহা ত্যাগ করিতে বল? আর একজন আসিবে, বলিবে—আমার এই শব্দটি লও, অপরে আবার তাহার শব্দ লইতে বলিবে। এইরূপ হইলে ত এইরূপ বৃথা শব্দের কোন অন্ত পাইবে না। তাই বলি, সেই প্রাচীন শব্দটি ব্যবহার কর, কিন্তু মন হইতে কুসংস্কার দূর করিয়া দিয়া, এই মহৎ প্রাচীন শব্দের অর্থ কি উত্তমরূপে বুঝিয়া ঐ শব্দ আরও উত্তমরূপে ব্যবহার কর। যদি তোমরা 'ভাবসাহচর্য্য-বিধান' (Law of Association of Ideas) কাহাকে বলে বুঝ, তবে জানিবে এই শব্দের সহিত নানাপ্রকার মহান ওজস্বী ভাব সংযুক্ত রহিয়াছে, লক্ষ লক্ষ মানব এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছে, লক্ষ লক্ষ লোকে ঐ শব্দের পূজা করিয়াছে, আর উহার সহিত যাহা কিছু সর্ব্বোচ্চ ও সুন্দরতম, যাহা কিছু যুক্তিযুক্ত, যাহা কিছু প্রেমাস্পদ, মনুষ্যভাবে যাহা কিছু মহৎ ও সুন্দর, তাহাই যোগ করিয়াছে। অতএব উহা ঐসমস্ত ভাবের উদ্দীপক কারণস্বরূপ, সুতরাং উহাকে ত্যাগ করিতে

পারা যায় না। যাহা হউক, আমি যদি আপনাদিগকে শুধু এই বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম যে, ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা হইলে আপনাদের নিকট উহা কোনরূপ অর্থ প্রকাশ করিত না। তথাপি এইসমুদয় বিচারাদির পর আমরা সেই প্রাচীন পুরুষের নিকটেই পৌঁছিলাম।

তবে আমরা এক্ষণে কি দেখিলাম? দেখিলাম যে, জড়, শক্তি, মন, চৈতন্য বা অন্য নামে পরিচিত বিভিন্ন জাগতিক শক্তি সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যেরই প্রকাশ। আমরা ভবিষ্যতে তাঁহাকে পরমপ্রভু বলিয়া আখ্যাত করিব। যাহা কিছু দেখ, শুন বা অনুভব কর, সবই তাঁহার সৃষ্টি—ঠিক বলিতে গেলে, তাঁহারই পরিণাম—আরও ঠিক বলিতে গেলে বলিতে হয়, প্রভু স্বয়ং। তিনি সূর্য্য ও তারকারূপে উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পাইতেছেন, তিনিই জননী, ধরণী, তিনিই স্বয়ং সমুদ্র। তিনিই মৃদু বৃষ্টিধারারূপে পড়িতেছেন, তিনিই মৃদু বাতাস যাহা আমরা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিতেছি, তিনিই শরীরে শক্তিরূপে কার্য্য করিতেছেন। তিনিই বক্তৃতা, তিনিই বক্তা, তিনিই এই শ্রোতৃমণ্ডলী। তিনিই এই বেদী—যাহার উপর আমি দাঁড়াইয়া, তিনিই ঐ আলোক—যাহা দ্বারা আমি তোমাদের মুখ দেখিতেছি, এসবই তিনি। তিনি জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ, তিনিই ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া অণু হন, আবার ক্রমবিকশিত হইয়া পুনরায় ঈশ্বর হন; তিনিই অবনত হইয়া অতি নিম্নতম পরমাণু হন; আবার ধীরে ধীরে নিজস্বরূপ প্রকাশ করিয়া নিজেতে যুক্ত হন, ইহাই জগতের রহস্য। 'তুমিই পুরুষ, তুমিই স্ত্রী, তুমিই যৌবনগর্ব্বে

ভ্রমণশীল যুবা, তুমিই বৃদ্ধ—দণ্ড ধরিয়া বিচরণ করিতেছ, তুমিই সকল বস্তুতে—হে প্রভু, তুমিই সকল।' জগৎপ্রপঞ্চের এই ব্যাখ্যাতেই কেবল মানবযুক্তি, মানববুদ্ধি পরিতৃপ্ত। এক কথায় বলিতে গেলে, আমরা তাঁহা হইতেই জন্মগ্রহণ করি, তাঁহাতেই জীবিত এবং তাঁহাতেই আবার প্রত্যাবর্ত্তন করি।

# জগৎ

## ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড

মনুষ্যমন স্বভাবতঃই বাহিরে যাইতে চায়। মন যেন শরীরের বাহিরে ইন্দ্রিয়প্রণালী দিয়া উঁকি মারিতে চায়। চক্ষু অবশ্যই দেখিবে, কর্ণ অবশ্যই শুনিবে, ইন্দ্রিয়গণ অবশ্যই বহির্জ্জগৎ প্রত্যক্ষ করিবে। তাই স্বভাবতঃই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও মহত্ত্ব প্রথমেই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবাত্মা প্রথমেই বহির্জ্জগতের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—আকাশ, নক্ষত্রপুঞ্জ, অন্তরীক্ষস্থ অন্যান্য পদার্থনিচয়, পৃথিবী, নদী, পর্ব্বত, সমুদ্র প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছিল, আর আমরা সকল প্রাচীন ধর্ম্মেই ইহার কিছু পরিচয় দেখিতে পাই। প্রথমে মানবমন অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে, বাহিরে যাহা কিছু দেখিত তাহাই ধরিতে চেষ্টা করিত। এইরূপে সে নদীর একজন দেবতা, আকাশের অধিষ্ঠাত্রী আর একজন, মেঘের অধিষ্ঠাত্রী একজন, আবার বৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী আর এক দেবতায় বিশ্বাসী হইল। যেগুলিকে আমরা প্রকৃতির শক্তি বলিয়া জানি, তাহারাই সচেতন পদার্থরূপে পরিণত হইল। কিন্তু এই প্রশ্নের যতই গভীর হইতে গভীরতম অনুসন্ধান হইতে লাগিল, ততই এই বাহ্য দেবতাগণে মনুষ্যের আর তৃপ্তি হইল না। তখন মনুষ্যের সমুদয় শক্তি তাহার নিজ অন্তর্দ্দেশে প্রবাহিত

হইল—তাহার নিজ আত্মা সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল। বহির্জ্জগৎ হইতে ঐ প্রশ্ন গিয়া অন্তর্জ্জগতে পঁহুছিল। বহির্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিয়া শেষে মানুষ অন্তর্জ্জগৎ বিশ্লেষণ করিতে আরম্ভ করিল। এই ভিতরের মানুষ সম্বন্ধে প্রশ্ন—ইহা আসে উচ্চতর সভ্যতা হইতে, প্রকৃতির সম্বন্ধে গভীরতর অন্তর্দৃষ্টি হইতে, উন্নতির উচ্চতর ভূমিতে আরূঢ় হইলে।

এই ভিতরের মানুষই অদ্যকার অপরাহ্ণের আলোচ্য বিষয়। এই অন্তর্মানব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষের যতদূর প্রিয় ও তাহার হৃদয়ের যত সন্নিহিত, আর কিছুই তত নহে। কত লক্ষ বার, কত কত দেশে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে। কি অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, কি রাজা, কি দরিদ্র, কি ধনী, কি সাধু, কি পাপী, প্রত্যেক নর, প্রত্যেক নারী সকলেই কোন না কোন সময়ে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—এই ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে কি নিত্য কিছুই নাই? এই শরীর মরিলেও এমন কিছু কি নাই, যাহা মরে না? যখনই এই শরীর ধূলিমাত্রে পরিণত হয়, তখন কি কিছু জীবিত থাকে না? অগ্নি শরীরকে ভস্মসাৎ করিলে তাহার পর আর কিছু কি অবশিষ্ট থাকে না? যদি থাকে তবে তাহার নিয়তি কি? উহা যায় কোথায়? কোথা হইতেই বা উহা আসিয়াছিল? এই প্রশ্নগুলি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসিত হইয়াছে; আর যতদিন এই সৃষ্টি থাকিবে, যতদিন মানব-মস্তিষ্ক চিন্তা করিবে, ততদিনই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইবে। ইহার উত্তর যে কখনও পাওয়া যায় নাই, তাহা নহে; যখনই প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়াছে, তখনই উত্তর আসিয়াছে; আর যত সময় যাইবে ততই উহা উত্তরোত্তর অধিক বল সংগ্রহ করিবে।

বাস্তবিকপক্ষে সহস্র সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে ঐ প্রশ্নের উত্তর একবারেই প্রদত্ত হইয়াছিল, আর পরবর্ত্তী সময়ে ঐ উত্তরই পুনঃকথিত, পুনর্বিশদীকৃত হইয়া আমাদের বুদ্ধির নিকট উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হইয়াছে মাত্র। অতএব আমাদের কেবল ঐ উত্তরের পুনঃকথন করিতে হইবে মাত্র। আমরা এই সর্ব্বগ্রাসী সমস্যাগুলি সম্বন্ধে নূতন আলোক প্রক্ষেপ করিব, এরূপ ভান করি না। আমাদের আকাঙ্ক্ষা এই যে সেই সনাতন মহান্ সত্য বর্ত্তমান কালের ভাষায় প্রকাশ করিব, প্রাচীনদিগের চিন্তা আধুনিকদিগের ভাষায় ব্যক্ত করিব, দার্শনিকদিগের চিন্তা লৌকিক ভাষায় বলিব—দেবতাদের চিন্তা মানবের ভাষায় বলিব, ঈশ্বরের চিন্তা দুর্ব্বল মানবভাষায় প্রকাশ করিব, যাহাতে লোকে উহা বুঝিতে পারে। কারণ আমরা পরে দেখিব, যে ঐশী সত্তা হইতে ঐসকল ভাব প্রসূত, তাহা মানবেও বর্ত্তমান—যে সত্তা ঐ চিন্তাগুলিকে সৃজন করিয়াছিলেন, তিনিই মানুষে প্রকাশিত হইয়া নিজেই ইহা বুঝিবেন।

আমি তোমাদিগকে দেখিতেছি (perception)। এই দর্শনক্রিয়ার জন্য কতগুলি জিনিসের আবশ্যক? প্রথমতঃ চক্ষু—চক্ষু অবশ্য থাকাই চাই। আমার অন্যান্য ইন্দ্রিয় অবিকল থাকিতে পারে, কিন্তু যদি আমার চক্ষু না থাকে, তবে আমি তোমাদিগকে দেখিতে পাইব না। অতএব প্রথমতঃ আমার অবশ্যই চক্ষু থাকা আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, চক্ষুর পশ্চাতে আর একটা কিছু—যাহা প্রকৃতপক্ষে দর্শনেন্দ্রিয়—থাকা আবশ্যক। তাহা না থাকিলে দর্শনক্রিয়া অসম্ভব। চক্ষু বাস্তবিক ইন্দ্রিয় নহে, উহা দর্শনের যন্ত্রমাত্র;

যথার্থ ইন্দ্রিয়টি চক্ষুর পশ্চাতে অবস্থিত—উহা মস্তিষ্কস্থ স্নায়ুকেন্দ্র। যদি ঐ কেন্দ্রটি নষ্ট হয়, তবে মানুষের অতি নির্মল চক্ষুর্দ্বয় থাকিতে পারে, কিন্তু সে কিছুই দেখিতে পাইবে না। অতএব দর্শনক্রিয়ার জন্য ঐ প্রকৃত ইন্দ্রিয়টি থাকা বিশেষ আবশ্যক। আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেও তদ্রূপ। বাহিরের কর্ণ কেবল ভিতরে শব্দ লইয়া যাইবার যন্ত্রমাত্র। উহা মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে পৌঁছান চাই। তবু ইহাই দর্শনক্রিয়ার জন্য পর্য্যাপ্ত হইল না। কখন কখন এরূপ হয়, তুমি তোমার পুস্তকাগারে বসিয়া একাগ্রমনে কোন পুস্তক পড়িতেছ এমন সময় ঘড়িতে বারটা বাজিল, কিন্তু তুমি তাহা শুনিতে পাইলে না। কেন শুনিতে পাইলে না? এখানে কিসের অভাব ছিল? মন ঐ ইন্দ্রিয়ে সংযুক্ত ছিল না। অতএব আমরা দেখিতেছি, তৃতীয়তঃ, মন অবশ্যই থাকা চাই। প্রথম বাহ্য যন্ত্র; তার পর এই বাহ্য যন্ত্রটি ইন্দ্রিয়ের নিকট যেন ঐ বিষয়কে বহন করিয়া লইয়া যায়; তারপর আবার মন ইন্দ্রিয়ে যুক্ত হওয়া চাই। যখন মন ঐ মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে যুক্ত না থাকে, তখন কর্ণ-যন্ত্রে এবং মস্তিষ্কস্থ কেন্দ্রে বিষয়ের ছাপ পড়িতে পারে কিন্তু আমরা উহা বুঝিতে পারিব না। মনও কেবল বাহক মাত্র, উহাকে এই বিষয়ের ছাপ আরও ভিতরে বহন করিয়া বুদ্ধিকে প্রদান করিতে হয়। বুদ্ধি উহার সম্বন্ধে নিশ্চয় করে, তথাপি কিন্তু পর্য্যাপ্ত হইল না। বুদ্ধিকে আবার আরও ভিতরে লইয়া গিয়া এই শরীরের রাজা আত্মার নিকট উহাকে সমর্পণ করিতে হয়। তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি তবে আদেশ করেন—‘কর’ অথবা ‘করিও না’। তখন যে যে ক্রমে উহা ভিতরে গিয়াছিল, সেই সেই ক্রমে আবার

বহির্যন্ত্রে আসে—প্রথমে বুদ্ধিতে, তারপর মনে, তারপর মস্তিষ্ককেন্দ্রে, তারপর বহির্যন্ত্রে; তখনই বিষয়জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল, বলা যায়।

যন্ত্রগুলি মানুষের স্থূলদেহে অবস্থিত। মন কিন্তু তাহা নহে। বুদ্ধিও নহে। হিন্দুশাস্ত্রে উহাদের নাম সূক্ষ্ম শরীর, খ্রীষ্টিয়ান শাস্ত্রে আধ্যাত্মিক শরীর। উহা এই শরীর হইতে অনেক সূক্ষ্ম বটে, কিন্তু উহা আত্মা নহে। আত্মা এই সকলের অতীত। স্থূল শরীর অল্প দিনেই ধ্বংস হইয়া যায়—খুব সামান্য কারণে উহার ভিতরে গোলযোগ ঘটে ও উহার ধ্বংস হইতে পারে। সূক্ষ্ম শরীর এত সহজে নষ্ট হয় না কিন্তু উহাও কখন সবল, কখন বা দুর্ব্বল হয়। আমরা দেখিতে পাই—বৃদ্ধ লোকের ভিতর মনের তত বল থাকে না, আবার শরীর সবল থাকিলেও মনও সবল থাকে, নানাবিধ ঔষধ মনের উপর কার্য্য করে, বাহিরের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করে, আবার উহাও বাহ্য জগতের উপর কার্য্য করিয়া থাকে। যেমন শরীরের উন্নতি-অবনতি আছে, তেমনি মনেরও সবলতা-দুর্ব্বলতা আছে, অতএব মন কখনও আত্মা হইতে পারে না। কারণ আত্মা অবিমিশ্র ও ক্ষয়রহিত। আমরা কিরূপে উহা জানিতে পারি? আমরা কি করিয়া জানিতে পারি যে, মনের পশ্চাতে আরও কিছু আছে? স্বপ্রকাশ জ্ঞান কখন জড়ের ধর্ম্ম হইতে পারে না। এমন কোন জড় বস্তু দেখা যায় নাই, জ্ঞানই যাহার স্বরূপ। জড় ভূত কখন আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে পারে না। জ্ঞানই সমুদয় জড়কে প্রকাশ করে। এই যে সম্মুখে হল ( hall ) দেখিতেছ, জ্ঞানই ইহার

মূল বলিতে হইবে, কারণ কোন না কোন জ্ঞানের সহায়তা ব্যতিরেকে উহার অস্তিত্বই উপলব্ধ হইত না। এই শরীর স্বপ্রকাশ নহে। যদি তাহাই হইত, তবে মৃত ব্যক্তির দেহ স্বপ্রকাশ হইত। মন অথবা আধ্যাত্মিক শরীরও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। উহা জ্ঞানস্বরূপ নহে। যাহা স্বপ্রকাশ তাহার কখন ধ্বংস হয় না। যাহা অপরের আলোক লইয়া আলোকিত, তাহার আলোক কখন থাকে, কখন থাকে না। কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ, তাহার আলোকের আবির্ভাব-তিরোভাব, হ্রাস-বৃদ্ধি আবার কি? আমরা দেখিতে পাই, চন্দ্রের ক্ষয় হয়, আবার উহার কলাবৃদ্ধি হইতে থাকে—তাহার কারণ উহা সূর্য্যের আলোকে আলোকিত। যদি অগ্নিতে লৌহপিণ্ড ফেলিয়া দেওয়া যায়, আর যদি উহাকে লোহিতোত্তপ্ত করা যায়, তবে উহা আলোক বিকিরণ করিতে থাকিবে, কিন্তু ঐ আলোক অপরের বলিয়া উহা চলিয়া যাইবে। অতএব ক্ষয় কেবল সেই আলোকেই সম্ভব, যাহা অপরের নিকট হইতে গৃহীত, যাহা স্বপ্রকাশ আলোক নহে।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম, এই স্থূলদেহ স্বপ্রকাশ নহে, উহা আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। মনও আপনাকে আপনি জানিতে পারে না। কেন? কারণ মনের শক্তির হ্রাস-বৃদ্ধি আছে, কখন উহা সবল কখন আবার দুর্ব্বল হয়, কারণ বাহ্য সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিয়া উহাকে সবলও করিতে পারে, দুর্ব্বলও করিতে পারে। অতএব মনের মধ্য দিয়া যে আলোক আসিতেছে, তাহা উহার নিজের নহে; তবে উহা কাহার? উহা এমন কাহারও আলোক অবশ্য হইবে, যাহার পক্ষে উহা ধারকরা

আলোক নহে, অথবা যাহা অপর আলোকের প্রতিবিম্বও নহে, কিন্তু যাহা স্বয়ং আলোকস্বরূপ; অতএব সেই আলোক বা জ্ঞান সেই পুরুষের স্বরূপভূত বলিয়া তাহার কখন নাশ বা ক্ষয় হয় না, উহা কখন প্রবল, কখনও বা মৃদু হইতে পারে না। উহা স্বপ্রকাশ—উহা আলোকস্বরূপ। আত্মা জানেন তাহা নহে, আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ; আত্মার অস্তিত্ব আছে তাহা নহে, আত্মা অস্তিত্বস্বরূপ; আত্মা যে সুখী তাহা নহে, আত্মা সুখস্বরূপ। যে সুখী, তাহার সুখ অপর কাহারও নিকট প্রাপ্ত—উহা আর কাহারও প্রতিবিম্ব। যাহার জ্ঞান আছে, সে অপর কাহারও নিকট জ্ঞানলাভ করিয়াছে, উহা প্রতিবিম্বস্বরূপ। যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার সেই অস্তিত্ব অপর কাহারও অস্তিত্বের উপর নির্ভর করিতেছে। যেখানেই গুণ ও গুণীর ভেদ আছে, সেখানেই বুঝিতে হইবে সেই গুণগুলি গুণীর উপর প্রতিবিম্বিত হইয়াছে। কিন্তু জ্ঞান, অস্তিত্ব বা আনন্দ—এগুলি আত্মার ধর্ম্ম নহে, উহারা আত্মার স্বরূপ।

পুনরায় প্রশ্ন হইতে পারে আমরা একথা স্বীকার করিয়া লইব কেন? কেন আমরা স্বীকার করিব যে, আনন্দ, অস্তিত্ব, স্বপ্রকাশত্ব আত্মার স্বরূপ, আত্মার ধর্ম্ম নহে? ইহার উত্তর এই—আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, শরীরের প্রকাশ মনের প্রকাশে; যতক্ষণ মন থাকে ততক্ষণ উহার প্রকাশ, মন চলিয়া গেলে দেহেরও প্রকাশ আর থাকে না। চক্ষু হইতে মন চলিয়া গেলে আমি তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারি, কিন্তু তোমায় দেখিতে পাইব না, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় হইতে উহা চলিয়া গেলে তোমাদের কথা এক বিন্দুও শুনিতে পাইব না। সকল ইন্দ্রিয়সম্বন্ধেই

এইরূপ। সুতরাং আমরা দেখিতে পাইলাম, শরীরের প্রকাশ—মনের প্রকাশে। আবার মনসম্বন্ধেও তদ্রূপ। বহির্জ্জগতের সকল বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতেছে, সামান্য কারণেই উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটু সামান্য গোলযোগ হইলেই উহার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। অতএব মনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না, কারণ আমরা সমুদয় প্রতিকৃতিতেই দেখিতেছি, যাহা কোন বস্তুর স্বরূপ, তাহার পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কেবল যেগুলি অপর বস্তুর ধর্ম্ম, যাহা অপর বস্তুর প্রতিবিম্বস্বরূপ তাহারই পরিবর্ত্তন হয়। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে—আত্মার প্রকাশ, আত্মার জ্ঞান, আত্মার আনন্দও কেন ঐরূপ অপরের নিকট হইতে গৃহীত বলিয়া স্বীকার কর না? এইরূপ স্বীকারে দোষ এই হইবে যে, এরূপ স্বীকারের অন্ত কিছু পাওয়া যাইবে না;—এরূপ প্রশ্ন উঠিবে, উহা আবার কাহার নিকট হইতে আলোকপ্রাপ্ত হইল? যদি বল, অপর কোন আত্মা হইতে, তবে আবার প্রশ্ন উঠিবে,—উহাই বা কোথা হইতে আলোক পাইল? অতএব অবশেষে আমাদিগকে এমন এক জায়গায় থাকিতে হইবে, যাহার আলোক অপরের নিকট প্রাপ্ত নহে। অতএব ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত এই—যেখানে প্রথমেই স্বপ্রকাশত্ব দেখিতে পাওয়া যাইবে, সেইখানেই থামা, আর অধিক অগ্রসর না হওয়া।

অতএব আমরা দেখিলাম, মানুষের প্রথমতঃ এই স্থূল দেহ, তৎপরে সূক্ষ্ম শরীর, উহার পশ্চাতে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ—আত্মা রহিয়াছেন; আমরা দেখিয়াছি, স্থূলদেহের সমুদয় শক্তি মন হইতে গৃহীত—মন আবার আত্মার আলোকে আলোকিত।

আত্মার স্বরূপসম্বন্ধে আবার নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। আত্মা স্বপ্রকাশ, সচ্চিদানন্দই আত্মার স্বরূপ—এই যুক্তি হইতে যদি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে স্বভাবতঃই ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে, উহা শূন্য হইতে সৃষ্ট হইতে পারে না। যাহা স্বপ্রকাশ, অপর-বস্তু-নিরপেক্ষ, তাহা কখন শূন্য হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। আমরা দেখিয়াছি, এই জড়জগৎও শূন্য হইতে হয় নাই—আত্মা ত দূরের কথা। অতএব উহার সর্ব্বদাই অস্তিত্ব ছিল। এমন সময় কখন ছিল না, যখন উহার অস্তিত্ব ছিল না; কারণ যদি বল এক সময়ে আত্মার অস্তিত্ব ছিল না, তবে কাল কোথায় অবস্থিত ছিল? কাল ত আত্মার অভ্যন্তরেই অবস্থিত। যখন আত্মার শক্তি মনের উপর প্রতিবিম্বিত হয়, আর মন চিন্তা করে, তখনই কালের উৎপত্তি। যখন আত্মা ছিল না তখন সুতরাং চিন্তাও ছিল না, আর চিন্তা না থাকিলে কালও থাকিতে পারে না। অতএব যখন কাল আত্মাতে রহিয়াছে, তখন আত্মা যে কালে অবস্থিত, ইহা কি করিয়া বলা যাইতে পারে? উহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উহা কেবল বিভিন্ন সোপানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে মাত্র। উহা ধীরে ধীরে আপনাকে নিম্ন অবস্থা হইতে উচ্চ ভাবে প্রকাশ করিতেছে। উহা মনের ভিতর দিয়া শরীরের উপর কার্য্য করিয়া আপনার মহিমা বিকাশ করিতেছে, আর শরীরের দ্বারা বাহ্য জগৎ গ্রহণ করিতেছে ও উহাকে বুঝিতেছে। উহা একটি শরীর গ্রহণ করিয়া উহাকে ব্যবহার করিতেছে, আর যখন সেই শরীরের দ্বারা আর কোন কাজ হইবার সম্ভাবনা থাকে না, তখন আর এক শরীর গ্রহণ করে।

এক্ষণে আবার আত্মার পুনর্জ্জন্মসম্বন্ধে ( Transmigration Theory ) প্রশ্ন আসিল। অনেক সময় লোকে এই পুনর্জ্জন্মের কথা শুনিলেই ভয় পায়, আর লোকের কুসংস্কার এত প্রবল যে, চিন্তাশীল লোকেও বরং বিশ্বাস করিবে যে আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, তারপর আবার মহাযুক্তির সহিত সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবে যে, যদিও আমরা শূন্য হইতে উৎপন্ন, কিন্তু পরে আমরা অনন্তকাল ধরিয়া থাকিব। যাহারা শূন্য হইতে আসিয়াছে তাহারা অবশ্যই শূন্যে যাইবে। তুমি, আমি বা উপস্থিত কেহই শূন্য হইতে আসে নাই, সুতরাং যাইবে না। আমরা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছি এবং থাকিব, আর জগদ্ব্রহ্মাণ্ডে এমন কোন শক্তি নাই, যাহা তোমার অথবা আমার অস্তিত্ব উড়াইয়া দিতে পারে। এই পুনর্জ্জন্মবাদে ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, উহাই মানুষের নৈতিক উন্নতির প্রধান সহায়ক। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের ইহাই ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। যদি পরে তোমার অনন্তকাল অস্তিত্ব সম্ভব হয়, তবে ইহাও সত্য যে, তুমি অনন্তকাল ধরিয়া ছিলে; আর কোনরূপ হইতে পারে না। এই মতের বিরুদ্ধে যে কতগুলি আপত্তি শুনিতে পাওয়া যায়, তাহার নিরাকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছি। যদিও তোমরা অনেকে এই আপত্তিগুলিকে অকিঞ্চিৎকর বোধ করিবে, কিন্তু তথাপি আমাদিগকে উহাদের উত্তর দিতে হইবে, কারণ কখন কখন আমরা দেখিতে পাই, মহাচিন্তাশীল লোকও অতি মূর্খোচিত কথাসকল বলিয়া থাকে। লোকে যে বলিয়া থাকে, 'এমন অসঙ্গত মতই নাই, যাহা সমর্থন করিবার জন্য কোন না কোন দার্শনিক অগ্রসর হয় না'—এ কথা

অতি সত্য ; প্রথম আপত্তি এই—আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের কথা স্মরণ থাকে না কেন ? তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—আমরা আমাদের এই জন্মের অতীত ঘটনাই কি সব স্মরণ করিতে পারি ? তোমাদের মধ্যে কয় জনের শৈশবকালের কথা স্মরণ হয় ? শৈশবকালের কথা তোমাদের কাহারই স্মরণ হয় না ; আর যদি স্মৃতিশক্তির উপর অস্তিত্ব নির্ভর করে তবে তোমার উহা স্মরণ নাই বলিয়া, ঐ শৈশবাবস্থায় তোমার অস্তিত্বও ছিল না বলিতে হইবে। আমরা যদি স্মরণ করিতে পারি, তবেই পূর্ব্বজন্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিব, ইহা বলা কেবল বৃথা প্রলাপমাত্র। আমাদের পূর্ব্বজন্মের কথা স্মরণ থাকিবেই—ইহার কি কোন হেতু আছে ? সেই মস্তিষ্কও নাই, উহা একেবারে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে আর নূতনপ্রকার মস্তিষ্ক রচিত হইয়াছে। অতীতকালের সংস্কারসমূহের যে সমষ্টিভূত ফল তাহা আমাদের মস্তিষ্কে আসিয়াছে—উহা লইয়া মন এই শরীরে বাস করিতে আসিয়াছে।

আমি এক্ষণে যেরূপ, তাহা আমার অনন্ত অতীত কালের কর্ম্মফলস্বরূপ। আর সেই সমুদয় অতীত স্মরণ করিবারই বা আমার কি প্রয়োজন ? কুসংস্কারের এমনি প্রভাব যে, যাহারা এই পুনর্জ্জন্মবাদ অস্বীকার করে, তাহারাই আবার বিশ্বাস করে, এক সময়ে আমরা বানর ছিলাম ; কিন্তু তাহাদের বানরজন্ম কেন স্মরণ হয় না—এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে ভরসা করে না। যখন কোন প্রাচীন ঋষি বা সাধু সত্য প্রত্যক্ষ করিয়াছেন শুনি, আমরা তাঁহাকে ভ্রান্ত বলিয়া থাকি ; কিন্তু যদি কেহ বলে, হাক্স্‌লি ইহা বলিয়াছেন, টিণ্ড্যাল্ ইহা বলিয়াছেন, তবে আমরা বলি উহা

অবশ্যই সত্য হইবে—তখন আমরা উহা অমনি মানিয়া লই। প্রাচীন কুসংস্কারের পরিবর্ত্তে আমরা আধুনিক কুসংস্কার আনিয়াছি, ধর্ম্মের প্রাচীন পোপের পরিবর্ত্তে আমরা বিজ্ঞানের আধুনিক পোপ বসাইয়াছি। অতএব আমরা দেখিলাম, এই স্মৃতিসম্বন্ধে যে আপত্তি, তাহা সত্য নহে। আর এই পুনর্জ্জন্ম-সম্বন্ধে যে সকল আপত্তি উঠিয়া থাকে, তন্মধ্যে ইহাই একমাত্র আপত্তি, যৎসম্বন্ধে বিজ্ঞ লোকে আলোচনা করিতে পারেন। যদিও পুনর্জ্জন্মবাদ প্রমাণ করিতে হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও থাকিবে—ইহা প্রমাণ করার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা আমরা দেখিয়াছি; তথাপি আমরা ইহা দৃঢ়ভাবে বলিতে পারি যে, অনেকের এরূপ স্মৃতি আসিয়াছে, আর তোমরাও সকলে যে জন্মে মুক্তিলাভ করিবে, সেই জন্মে এই স্মৃতি লাভ করিবে। তখনই কেবল তুমি জানিতে পারিবে যে জগৎ স্বপ্নমাত্র, তখনই তুমি অন্তরের অন্তরে বুঝিবে যে, তোমরা এই জগতে নটমাত্র, আর এই জগৎ রঙ্গভূমিমাত্র, তখনই অনাসক্তির ভাব তোমাদের ভিতর বজ্রবেগে আসিবে, তখনই যত ভোগতৃষ্ণা—জীবনের উপর এই মহা আগ্রহ—এই সংসার চিরকালের জন্য চলিয়া যাইবে। তখন তুমি স্পষ্টই দেখিবে, তুমি জগতে কতবার আসিয়াছ, কত লক্ষ লক্ষ বার তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, স্বামী, স্ত্রী, বন্ধু, ঐশ্বর্য্য, শক্তি লইয়া কাটাইয়াছ। এই সকল কতবার আসিয়া কতবার চলিয়া গিয়াছে। কতবার তুমি সংসার-তরঙ্গের উচ্চ চূড়ায় উঠিয়াছ, আবার কতবার তুমি নৈরাশ্যের গভীর গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়াছ। যখন স্মৃতি তোমার নিকট এই সকল আনিয়া দিবে, তখনই

কেবল তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইবে আর জগৎ তোমায় ভ্রূভঙ্গী করিলে তুমি হাস্য করিবে। তখনই তুমি বীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে—"মৃত্যু, তোমাকেও আমি গ্রাহ্য করি না, তুমি আমাকে কি ভয় দেখাও?" যখন তুমি জানিতে পারিবে তোমার উপর মৃত্যুর কোন শক্তি নাই, তখনই তুমি মৃত্যুকে জয় করিতে পারিবে। আর সকলেই কালে এই মৃত্যুঞ্জয় অবস্থা লাভ করিবে।

আত্মার যে পুনর্জ্জন্ম হয়, তাহার কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রমাণ আছে? এতক্ষণ আমরা কেবল শঙ্কানিরাস করিতেছিলাম, দেখাইতেছিলাম যে এই পুনর্জ্জন্মবাদ অপ্রমাণ করিবার যে যুক্তিগুলি তাহা অকিঞ্চিৎকর। এক্ষণে উহার সপক্ষে যে-যে যুক্তি আছে, তাহা বিবৃত হইতেছে। পুনর্জ্জন্মবাদ ব্যতীত জ্ঞান অসম্ভব। মনে কর, আমি রাস্তায় গিয়া একটা কুকুরকে দেখিলাম। উহাকে কুকুর বলিয়া জানিলাম কিরূপে। যখনই উহার ছাপ আমার মনের উপর পড়িল, উহার সহিত মনের ভিতরকার পূর্ব্বসংস্কারগুলিকে মিলাইতে লাগিলাম। দেখিলাম—তথায় আমার সমুদয় পূর্ব্ব-সংস্কারগুলি স্তরে স্তরে সজ্জীকৃত রহিয়াছে। নূতন কোন বিষয় আসিবামাত্রই আমি ঐটিকে সেই প্রাচীন সংস্কারগুলির সহিত মিলাইলাম। যখনই দেখিলাম, সেইরূপ ভাবের আর কতকগুলি সংস্কার রহিয়াছে, অমনি আমি উহাদিগকে তাহাদের সহিত মিলাইলাম, তখনই আমার তৃপ্তি আসিল। আমি তখন উহাকে কুকুর বলিয়া জানিতে পারিলাম, কারণ উহা পূর্ব্বাবস্থিত কতকগুলি সংস্কারের সহিত মিলিল। যখন আমি উহার তুল্য

সংস্কার আমার ভিতরে না দেখিতে পাই, তখনই আমার অতৃপ্তি আসে। এইরূপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে 'জ্ঞান' বলে। যখন একটি আপেল (apple) পড়িল, তখনই মানুষের অতৃপ্তি আসিল। তাহার পর মানুষ ক্রমশঃ ঐরূপ কতকগুলি ঘটনা—যেন একটি শৃঙ্খল, দেখিতে পাইল। কি সে শৃঙ্খল? সেই শৃঙ্খল এই যে, সকল আপেলই পড়িয়া থাকে। মানুষ উহার 'মাধ্যাকর্ষণ' সংজ্ঞা দিল। অতএব আমরা দেখিলাম—পূর্ব্বে কতকগুলি অনুভূতি না থাকিলে নূতন অনুভূতি অসম্ভব—কারণ ঐ নূতন অনুভূতির সহিত মিলাইবার আর কিছু পাওয়া যাইবে না। অতএব কতকগুলি ইউরোপীয় দার্শনিকের মতানুযায়ী 'বালক ভূমিষ্ঠ হইবার সময় সংস্কারশূন্য মন লইয়া আসে'—এ কথা যদি সত্য হয়, তবে তাহাকে সংস্কারশূন্য মন লইয়া যাইতে হইবে। কারণ তাহার ঐ নূতন অনুভূতি মিলাইবার জন্য আর কোন সংস্কার রহিল না! অতএব দেখিলাম, এই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ব্যতীত নূতন কোন জ্ঞান হওয়া অসম্ভব। বাস্তবিক কিন্তু আমাদের সকলকেই পূর্ব্বসঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছে। জ্ঞান কেবল ভূয়োদর্শনলব্ধ, জানিবার আর কোন পথ নাই। যদি আমরা এখানে ঐ জ্ঞান লাভ না করিয়া থাকি, অবশ্যই আমরা অপর কোথাও উহা লাভ করিয়া থাকিব। মৃত্যুভয় সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই কেন? একটি কুক্কুট এইমাত্র ডিম হইতে বাহির হইয়াছে—একটি শ্যেন আসিল, অমনি সে ভয়ে মায়ের কাছে পলাইয়া গেল। কোথা হইতে ঐ কুক্কুটশাবকটি শিখিল যে, কুক্কুট শ্যেনের ভক্ষ্য? ইহার একটি পুরাতন ব্যাখ্যা আছে,

কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যাই বলা যাইতে পারে না। উহাকে স্বাভাবিক সংস্কার ( instinct ) বলা হইত। যে ক্ষুদ্র কুক্কুটটি এইমাত্র ডিম্ব হইতে বাহির হইয়াছে, তাহার এরূপ মরণভীতি আসে কোথা হইতে? সদ্য ডিম্ব হইতে বহির্গত হংস জলের নিকট আসিলেই, জলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে এবং সাঁতার দিতে থাকে কেন? উহা কখন সন্তরণ করে নাই, অথবা কাহাকেও সন্তরণ করিতে দেখে নাই। লোকে বলে উহা 'স্বাভাবিক জ্ঞান'। 'স্বাভাবিক জ্ঞান' বলিলে একটা খুব লম্বা-চৌড়া কথা বলা হইল বটে, কিন্তু উহা আমাদিগকে নূতন কিছুই শিখাইল না। এই স্বাভাবিক জ্ঞান কি তাহা আলোচনা করা যাক্। আমাদের নিজেদের ভিতরই শত প্রকারের স্বাভাবিক জ্ঞান রহিয়াছে। মনে কর, একব্যক্তি পিয়ানো বাজাইতে শিখিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তাঁহাকে প্রত্যেক পরদার দিকে নজর রাখিয়া তবে উহার উপর অঙ্গুলি প্রয়োগ করিতে হয়, কিন্তু অনেক মাস, অনেক বৎসর অভ্যাস করিতে করিতে উহা স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়, আপনা আপনি হইতে থাকে। এক সময়ে যাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছার প্রয়োজন হইত, তাহাতে আর উহার প্রয়োজন থাকে না, কিন্তু উহা জ্ঞানপূর্ব্বক ইচ্ছা ব্যতীতই নিষ্পন্ন হইতে পারে, উহাকেই বলে স্বাভাবিক জ্ঞান। প্রথমে উহা ইচ্ছাসহকৃত ছিল, পরিশেষে উহাতে আর ইচ্ছার প্রয়োজন রহিল না। কিন্তু স্বাভাবিক জ্ঞানের তত্ত্ব এখনও সম্পূর্ণ বলা হয় নাই, অর্দ্ধেক কথা বলিতে এখনও বাকি আছে। তাহা এই যে, যে-সকল কার্য্য এক্ষণে আমাদের স্বাভাবিক, তাহার প্রায় সবগুলিকেই আমাদের ইচ্ছার অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। শরীরের

প্রত্যেক পেশীই আমাদের অধীনে আনয়ন করা যাইতে পারে। এ বিষয়টি আজকাল সর্ব্বসাধারণের নিকট উত্তমরূপেই পরিজ্ঞাত। অতএব অন্বয়ী ও ব্যতিরেকী—দুই উপায়েই প্রমাণিত হইল যে, যাহাকে আমরা স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা ইচ্ছাকৃত কার্য্যের অবনত ভাব মাত্র। অতএব যখন সমুদয় প্রকৃতিতেই এক নিয়ম রাজত্ব করিতেছে, তখন সমগ্র সৃষ্টিতে 'উপমান' প্রমাণের প্রয়োগ করিয়া অবশ্যই সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়, তির্য্যগ্‌জাতিতে এবং মানুষে যাহা স্বাভাবিক জ্ঞান বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা ইচ্ছার অবনত ভাবমাত্র।

আমরা বহির্জ্জগতে যে নিয়ম পাইয়াছিলাম, অর্থাৎ 'প্রত্যেক ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ার পূর্ব্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া বর্ত্তমান, আর ক্রমসঙ্কোচ হইলেই তৎসঙ্গে ক্রমবিকাশও থাকিবে'—এই নিয়ম খাটাইয়া আমরা স্বাভাবিক জ্ঞানের কি ব্যাখ্যা পাইতে পারি? স্বাভাবিক জ্ঞান তাহা হইলে বিচারপূর্ব্বক কার্য্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইয়া দাঁড়াইল। অতএব মানুষে বা পশুতে যাহাকে স্বাভাবিক জ্ঞান বলি, তাহা অবশ্যই পূর্ব্ববর্ত্তী ইচ্ছাকৃত কার্য্যের ক্রমসঙ্কোচভাব হইবে। আর ইচ্ছাকৃত কার্য্য বলিলেই পূর্ব্বে আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলাম, স্বীকার করা হইল। পূর্ব্বকৃত কার্য্য হইতে ঐ সংস্কার আসিয়াছিল, আর ঐ সংস্কার এখনও বর্ত্তমান। এই মৃত্যুভীতি, এই জন্মিবামাত্র জলে সন্তরণ আর মনুষ্যের মধ্যে যাহা কিছু অনিচ্ছাকৃত স্বাভাবিক কার্য্য রহিয়াছে, সবই পূর্ব্ব কার্য্য ও পূর্ব্ব অনুভূতির ফল—উহারা এক্ষণে স্বাভাবিক জ্ঞানরূপে পরিণত হইয়াছে। এতক্ষণ আমরা বিচারে

বেশ অগ্রসর হইলাম, আর এতদূর পর্য্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সহায় রহিলেন। আধুনিক বিজ্ঞানবিদেরা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন ঋষিদের সহিত একমত হইতেছেন, এবং তাঁহাদের যতখানি প্রাচীন ঋষিদের সঙ্গে মিলে ততখানি কোন গোল নাই। বৈজ্ঞানিকেরা স্বীকার করেন যে, প্রত্যেক মানুষ এবং প্রত্যেক জন্তুই কতকগুলি অনুভূতির সমষ্টি লইয়া জন্মগ্রহণ করে; তাঁহারা ইহাও মানেন যে, মনের এই সকল কার্য্য পূর্ব্ব অনুভূতির ফল। কিন্তু তাঁহারা এইখানে আর এক শঙ্কা তুলিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ঐ অনুভূতিগুলি যে আত্মার, ইহা বলিবার আবশ্যকতা কি? উহা কেবল শরীরেরই ধর্ম্ম বলিলেই ত হয়। উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চার বলিলেই ত হয়। ইহাই শেষ প্রশ্ন। আমি যেসকল সংস্কার লইয়া জন্মিয়াছি, তাহা আমার পূর্ব্বপুরুষদের সঞ্চিত সংস্কার, ইহাই বল না কেন? ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ম্মসংস্কার আমার ভিতরে রহিয়াছে, কিন্তু উহা বংশানুক্রমিক সঞ্চারের বশেই আমাতে আসিয়াছে। এইরূপ হইলে আর কি গোল থাকে? এই প্রশ্নটি অতি সূক্ষ্ম। আমরা এই বংশানুক্রমিক সঞ্চারের কতক অংশ মানিয়াও থাকি। কতটুকু মানি? মানি কেবল আত্মার বাসোপযোগী গৃহ দান করা পর্য্যন্ত। আমরা আমাদের পূর্ব্ব কর্ম্মের দ্বারা শরীর-বিশেষ আশ্রয় করিয়া থাকি। আর যাঁহারা আপনাদিগকে সেই আত্মাকে সন্তানরূপে লাভ করিবার উপযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট হইতেই তিনি উপযুক্ত উপাদান গ্রহণ করিয়া থাকেন।

বংশানুক্রমিক সঙ্কারবাদ ( Doctrine of Heredity ) বিনা প্রমাণেই একটি অদ্ভুত প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া থাকে যে, মনের সংস্কাররাশির ছাপ জড়ে থাকিতে পারে। যখন আমি তোমার দিকে তাকাই, তখন আমার চিত্তহ্রদে একটি তরঙ্গ উঠে। ঐ তরঙ্গ চলিয়া যায়, কিন্তু সূক্ষ্মরূপে তরঙ্গাকার থাকে। আমরা ইহা বুঝিতে পারি। ভৌতিক সংস্কার যে শরীরে থাকিতে পারে, তাহাও আমরা বুঝি। কিন্তু শরীর ভগ্ন হইলে যে মানসিক সংস্কার শরীরে বাস করে, তাহার প্রমাণ কি? কিসের দ্বারা ঐ সংস্কার সঞ্চারিত হয়? মনে কর, যেন মনের প্রত্যেক সংস্কার শরীরে বাস করা সম্ভব; মনে কর আদিম মনুষ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বংশানুক্রমে সকল পূর্ব্বপুরুষের সংস্কার আমার পিতার শরীরে রহিয়াছে এবং পিতার শরীর হইতে আমাতে আসিতেছে। কিরূপে? তোমরা বলিবে—জীবাণুকোষের ( bio-plasmic cell ) দ্বারা। কিন্তু কি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে, যেহেতু পিতার শরীর ত সন্তানে সম্পূর্ণ আসে না? একই পিতামাতার অনেকগুলি সন্তানসন্ততি থাকিতে পারে। সুতরাং এই বংশানুক্রমিক সঙ্কারবাদ স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করা অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে যে, ( কারণ তাঁহাদের মতে সঙ্কারক ও সঙ্কার্য্য এক, অর্থাৎ ভৌতিক ) পিতামাতা প্রত্যেক সন্তানের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের নিজ মনোবৃত্তির কিঞ্চিদংশ খোয়াইবেন; আর যদি বল, তাঁহাদের সমুদয় মনোবৃত্তিই সঞ্চারিত হয়, তবে বলিতে হয় প্রথম সন্তানের জন্মের পরই তাঁহাদের মন সম্পূর্ণরূপে শূন্য হইয়া যাইবে।

আবার যদি জীবাণুকোষে চিরকালের অনন্ত সংস্কারসমষ্টি থাকে, তবে জিজ্ঞাস্য এই, উহা কোথায় ও কিরূপেই বা থাকে? ইহা একটি অত্যন্ত অসম্ভব প্রতিজ্ঞা। আর যতদিন না এই জড়বাদীরা প্রমাণ করিতে পারেন, কি করিয়া ঐ সংস্কার ঐ কোষে থাকিতে পারে, আর কোথায়ই বা থাকিতে পারে, এবং 'মনোবৃত্তি ভৌতিক কোষে নিদ্রিত থাকে', এই বাক্যের অর্থ কি, ইহা যতদিন না তাঁহারা বুঝাইতে পারেন, ততদিন তাঁহাদের প্রতিজ্ঞা স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে না। এইটুকু বেশ স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সংস্কার মনেরই মধ্যে বাস করে, মনই জন্মজন্মান্তর গ্রহণ করিতে আসে; মনই আপন উপযোগী উপাদান গ্রহণ করে, আর ঐ মন যে শরীর বিশেষ ধারণ করিবার উপযুক্ত কর্ম্ম করিয়াছে, যতদিন পর্যান্ত না উহা তন্নির্ম্মাণোপযোগী উপাদান পাইতেছে, ততদিন উহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইহা আমরা বুঝিতে পারি। অতএব আত্মার দেহগঠনোপযোগী উপাদান প্রস্তুত করা পর্য্যন্তই বংশানুক্রমিক-সঞ্চারবাদ স্বীকার করা যাইতে পারে। আত্মা কিন্তু দেহের পর দেহ গ্রহণ করেন —শরীরের পর শরীর প্রস্তুত করেন; আর আমরা যে-কোন চিন্তা করি, যে-কোন কার্য্য করি, তাহাই সূক্ষ্মভাবে রহিয়া যায়, আবার সময় হইলেই উহারা স্থূল ব্যক্তভাবধারণোন্মুখ হয়। আমার যাহা বক্তব্য তাহা তোমাদিগকে আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। যখনই আমি তোমাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনই আমার মনে একটি তরঙ্গ উঠে। উহা যেন চিত্তহ্রদের ভিতর ডুবিয়া যায়, সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতর হইতে থাকে, কিন্তু উহার একেবারে

নাশ হইয়া যায় না। উহা মনের মধ্যেই যে কোন মুহূর্ত্তে স্মৃতি-রূপ তরঙ্গাকারে উঠিতে প্রস্তুত হইয়া বর্ত্তমান থাকে। এইরূপেই এই সমুদয় সংস্কারসমষ্টি আমার মনেই বর্ত্তমান রহিয়াছে, আর মৃত্যুকালে উহাদের সমবেত সমষ্টি আমার সঙ্গেই বাহির হইয়া যায়। মনে কর, এই ঘরে একটি বল রহিয়াছে, আর আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই হাতে একটি ছড়ি লইয়া সব দিক হইতে ইহাকে মারিতে আরম্ভ করিলাম; বলটি ঘরের এক ধার হইতে আর এক ধারে যাইতে লাগিল, দরজার কাছে পঁহুছিবামাত্র বাহিরে চলিয়া গেল। উহা কোন্ শক্তিতে বাহিরে চলিয়া যায়?—যতগুলি ছড়ি মারা হইতেছিল, তাহাদের সমবেত শক্তিতে। উহার কোন্ দিকে গতি হইবে, তাহাও ঐসকলের সমবেত ফলে নির্ণীত হইবে। এইরূপ, শরীরের পতন হইলে আত্মার কোন্ দিকে গতি হইবে, তাহার নির্ণায়ক কে? উহা যেসকল কার্য্য করিয়াছে, যেসকল চিন্তা করিয়াছে, সেইগুলিই উহাকে কোন বিশেষ দিকে পরিচালিত করিবে। ঐ আত্মা আপন অভ্যন্তরে ঐ সকলের ছাপ লইয়া নিজ গন্তব্যাভিমুখে অগ্রসর হইবে। যদি সমবেত কর্ম্মফল এরূপ হয় যে, পুনর্ব্বার ভোগের জন্য উহাকে একটি নূতন শরীর গড়িতে হয়, তবে উহা এমন পিতামাতার নিকট যাইবে, যাহাদের নিকট হইতে সেই শরীরগঠনের উপযোগী উপাদান পাওয়া যাইতে পারে, আর সেইসকল উপাদান লইয়া উহা একটি নূতন শরীর গ্রহণ করিবে। এইরূপে ঐ আত্মা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবে, কখন স্বর্গে যাইবে আবার পৃথিবীতে আসিয়া মানবদেহ পরিগ্রহ করিবে; অথবা অন্য কোন উচ্চতর

বা নিম্নতর জীবশরীর পরিগ্রহ করিবে। এইরূপে উহা অগ্রসর হইতে থাকিবে, যতদিন না উহার ভোগ শেষ হইয়া আবার ঘুরিয়া উহার পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়। তখনই উহা নিজের স্বরূপ জানিতে পারে, নিজে যথার্থ কি তাহা বুঝিতে পারে। তখন সমুদয় অজ্ঞান চলিয়া যায়, উহার শক্তিসমূহ প্রকাশিত হয়। তিনি তখন সিদ্ধ হইয়া যান, পূর্ণতা লাভ করেন, তখন তাঁহার পক্ষে স্থূলশরীরের সাহায্যে কার্য্য করিবার কোন আবশ্যকতা থাকে না—সূক্ষ্মশরীরের দ্বারা কার্য্য করিবারও আবশ্যকতা থাকে না। তিনি তখন স্বয়ংজ্যোতিঃ ও মুক্ত হইয়া যান, তাঁহার আর জন্ম বা মৃত্যু কিছুই হয় না।

আমরা এ সম্বন্ধে এক্ষণে আর সবিশেষ আলোচনা করিব না। কিন্তু এই পুনর্জ্জন্মবাদ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াই নিবৃত্ত হইব। এই মতই কেবল জীবাত্মার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া থাকে। এই মতই কেবল আমাদের সমুদয় দুর্ব্বলতার দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপায় না। নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানটা মানুষের সাধারণ দুর্ব্বলতা। আমরা নিজেদের দোষ দেখিতে পাই না। চক্ষু কখনও আপনাকে দেখিতে পায় না। উহা অপর সকলের চক্ষু দেখিতে পায়। মানব আমরা, আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা, নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করিতে বড় নারাজ, যতক্ষণ আমাদের অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ সাধারণতঃ নিজের দোষগুলি, নিজের ভ্রমত্রুটিগুলি তাহার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাইতে চায়; তাহা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে দোষ চাপায়; তাহা না হইলে

অদৃষ্ট নামক একটি ভূতের কল্পনা করে এবং তাহারই উপর দোযারোপ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়; কিন্তু কথা এই, 'অদৃষ্ট' নামধেয় এই বস্তুটি কিংস্বরূপ এবং উহা থাকেই বা কোথায়? আমরা ত যাহা বপন করি, তাহাই পাইয়া থাকি।

আমরাই আমাদের অদৃষ্টের সৃষ্টিকর্ত্তা। আমাদের অদৃষ্ট মন্দ হইলেও কাহাকেও দোষ দিবার নাই, আবার ভাল হইলেও কাহাকেও প্রশংসা করিবার নাই। বাতাস সর্ব্বদাই বহিতেছে। যেসকল জাহাজের পাল খাটানো থাকে, সেইগুলিতেই বাতাস লাগে—তাহারাই পালভরে অগ্রসর হয়। যাহাদের কিন্তু পাল গুটানো থাকে, তাহাদিগের উপর বাতাস লাগে না। ইহা কি বায়ুর দোষ? আমরা যে কেহ সুখী, কেহ বা দুঃখী, ইহা কি সেই করুণাময় পিতার দোষ, যাঁহার কৃপা-পবন দিবারাত্র অবিরত বহিতেছে—যাঁহার দয়ার শেষ নাই? আমরাই আমাদের অদৃষ্টের রচয়িতা। তাঁহার সূর্য্য দুর্ব্বল বলবান সকলের জন্য উদিত। তাঁহার বায়ু সাধু পাপী সকলের জন্যই সমান বহিতেছে। তিনি সকলের প্রভু, সকলের পিতা, দয়াময়, সমদর্শী। তোমরা কি মনে কর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তু আমরা যে দৃষ্টিতে দেখি তিনিও সেই দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন? ভগবৎ-সম্বন্ধে ইহা কি ক্ষুদ্র ধারণা। আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুক্কুরশাবকের ন্যায় এখানে নানা বিষয়ের জন্য অতি আগ্রহের সহিত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, আর নির্ব্বোধের মত মনে করিতেছি ভগবানও ঐ বিষয়গুলি ঠিক সেইরূপ সত্য বলিয়াই গ্রহণ করিবেন। এই কুক্কুরশাবকের খেলার অর্থ কি, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানেন।

তাঁহার প্রতি সব দোষ চাপান, তাঁহাকে দণ্ড-পুরস্কারের কর্ত্তা বলা কেবল নির্ব্বোধের কথামাত্র। তিনি কাহারও দণ্ডবিধানও করেন না, কাহাকেও পুরস্কারও দেন না। সর্ব্ব দেশে, সর্ব্ব কালে, সর্ব্ব অবস্থায় তাঁহার অনন্ত দয়া পাইবার সকলেই অধিকারী। উহার ব্যবহার কিরূপে করিব, তাহা আমাদের উপর নির্ভর করিতেছে। মানুষ, ঈশ্বর বা অপর কাহারও উপর দোষারোপ করিও না। যখন নিজে কষ্ট পাও, তখন তাহার জন্য আপনাকেই দোষী বলিয়া স্থির কর এবং যাহাতে আপনার মঙ্গল হয়, তাহারই চেষ্টা কর।

পূর্ব্বোক্ত সমস্যার ইহাই মীমাংসা। যাহারা নিজেদের দুঃখ-কষ্টের জন্য অপরের উপর দোষারোপ করে (দুঃখের বিষয়, এরূপ লোকের সংখ্যাই দিন দিন বাড়িতেছে), তাহারা সাধারণতঃ হতভাগা দুর্ব্বলমস্তিষ্ক লোক; তাহারা নিজেদের কর্ম্মদোষে এ অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, এক্ষণে তাহারা অপরের উপর দোষারোপ করিতেছে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের অবস্থার কিছু-মাত্র পরিবর্ত্তন হয় না, উহাতে তাহাদের কিছুমাত্র উপকার হয় না বরং অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার এই চেষ্টাতে তাহাদিগকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। অতএব কাহাকেও তোমার নিজের দোষের জন্য নিন্দা করিও না, নিজের পায় নিজে দাঁড়াও, সমুদয় দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ কর। বল, আমি যে কষ্ট ভোগ করিতেছি তাহা আমারই কৃতকর্ম্মের ফল। উহা স্বীকার করিলে, সেই সঙ্গে ইহাও প্রমাণ হয় যে, উহা আবার আমার দ্বারাই নষ্ট হইতে পারে। যাহা আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা

আমি ধ্বংস করিতে পারি; যাহা অপর কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা আমি কখন নাশ করিতে সমর্থ হইব না। অতএব উঠ, সাহসী হও, বীর্য্যবান হও। সমুদয় দায়িত্ব আপনার ঘাড়ে লও—জানিয়া রাখ, তুমিই তোমার অদৃষ্টের সৃজনকর্ত্তা। তুমি যে কিছু বল বা সহায়তা চাও, তাহা তোমার ভিতরেই রহিয়াছে। অতএব তুমি এক্ষণে এই জ্ঞানবলে বলীয়ান হইয়া নিজের ভবিষ্যৎ গঠন করিতে থাক। 'গতস্য শোচনা নাস্তি'—এক্ষণে সমুদয় অনন্ত ভবিষ্যৎ তোমার সম্মুখে। সর্ব্বদাই ইহা মনে রাখিবে যে, তোমার প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক কার্য্যই সঞ্চিত থাকিবে; আর ইহাও স্মরণ রাখিবে যে, যেমন তোমার কৃত প্রত্যেক অসৎ চিন্তা ও অসৎ কার্য্য তোমার উপর ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া পড়িতে উদ্যত, সেইরূপ তোমার সৎচিন্তা ও সৎকার্য্যগুলি সহস্র দেবতার বলসম্পন্ন হইয়া তোমাকে সদা রক্ষা করিতে উদ্যত।

# অমৃতত্ব

জীবাত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন মানুষ যতবার জিজ্ঞাসা করিয়াছে, ঐ তত্ত্বের রহস্য-উদ্‌ঘাটন করিতে মানুষ সমুদয় জগৎ যত খুঁজিয়াছে, ঐ প্রশ্ন মানব-হৃদয়ের এত অন্তরতর ও প্রিয়তর, ঐ প্রশ্ন আমাদের অস্তিত্বের সহিত এত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত আর কোন্ প্রশ্ন তদ্রূপ? কবিদিগের ইহা কল্পনার বিষয়, সাধু মহাত্মা জ্ঞানী—সকলেরই ইহা মহা চিন্তার বিষয়, সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইহার বিচার করিয়াছেন, পথিমধ্যস্থ অতি দরিদ্রও এই অমরত্বের স্বপ্ন দেখিয়াছে। শ্রেষ্ঠ মানবগণ এই প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছেন—অতি হীন মানবগণও ইহার আশা করিয়াছে। এই বিষয়ে লোকের আগ্রহ এখনও নষ্ট হয় নাই এবং যতদিন মানবপ্রকৃতি বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন নষ্ট হইবেও না। জগতে এই সম্বন্ধে অনেকে অনেক উত্তর দিয়াছেন। আবার প্রত্যেক ঐতিহাসিক যুগে দেখা যায় যে, সহস্র সহস্র ব্যক্তি এই প্রশ্ন একেবারে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি উহা সেইরূপই নূতন রহিয়াছে। অনেক সময় জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত থাকিয়া এই প্রশ্ন যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। হঠাৎ কেহ কালগ্রাসে পতিত হইল—এমন কেহ যাহাকে আমি হয়ত খুব ভালবাসিতাম, যে আমরা প্রাণের প্রিয়তম ছিল, হঠাৎ যম তাহাকে আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইল, তখন যেন মুহূর্তের জন্য এই সংসারের

কোলাহল, সব গোলমাল থামিয়া গেল, সব যেন নিস্তব্ধ হইল, আর আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে সেই প্রাচীন প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতে লাগিল—এই জীবনের অবসানে কি থাকে? দেহান্তে আত্মার কি গতি হয়? ঠেকিয়াই মানুষ সমুদয় শিক্ষা করে। না ঠেকিলে—সুখ দুঃখ সব বিষয় উপলব্ধি না করিলে, আমরা কোন বিষয়ে শিক্ষা করিতে পারি না। আমাদের বিচার, আমাদের জ্ঞান এই সকল বিভিন্নপ্রকার উপলব্ধি-সামঞ্জস্যের উপর—সাধারণ ভাবের উপর নির্ভর করে। আমাদের চতুর্দ্দিকে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া আমরা কি দেখিতে পাই? ক্রমাগত পরিবর্ত্তন! বীজ হইতে বৃক্ষ হয়, আবার উহা ঘুরিয়া বীজরূপে পরিণত হয়। কোন জীব উৎপন্ন হইল—কিছুদিন রহিল—আবার মরিয়া গেল—এইরূপে যেন একটি বৃত্ত সম্পূর্ণ হইল। মানুষের সম্বন্ধেও তদ্রূপ। এমন কি, পর্ব্বতসমূহ পর্য্যন্ত ধীরে অথচ নিশ্চিতরূপে গুঁড়াইয়া যাইতেছে, নদীসকল ধীরে অথচ নিশ্চিত শুকাইয়া যাইতেছে। সমুদ্র হইতে বৃষ্টি আসিতেছে, আবার উহা সমুদ্রে যাইতেছে। সর্ব্বত্রই একটি একটি বৃত্ত—জন্ম, বৃদ্ধি ও নাশ যেন গণিতের ন্যায় সঠিকভাবে একটির পর আর একটি আসিতেছে। ইহাই আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা। তথাপি ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে আরম্ভ করিয়া উচ্চতম সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত লক্ষ লক্ষ প্রকারে বিভিন্ন নামরূপযুক্ত বস্তুরাশির অভ্যন্তরে ও অন্তরালে আমরা এক অখণ্ডভাব দেখিতে পাই। প্রতিদিনই আমরা দেখিতে পাই, যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর এক পদার্থ হইতে আর এক পদার্থকে পৃথক করিতেছে বলিয়া লোকে ভাবিত, তাহা ভগ্ন হইয়া যাইতেছে—আর আধুনিক বিজ্ঞান

সমুদয় ভূতকেই এক পদার্থ বলিয়া বুঝিতেছে—কেবল যেন সেই এক প্রাণশক্তিই নানা রূপে ও নানা আকারে প্রকাশ পাইতেছে—উহা যেন সমুদয়ের মধ্যে এক শৃঙ্খলরূপে বিদ্যমান—এই সকল বিভিন্ন রূপ যেন তাহার এক একটি অংশ—অনন্তরূপে বিস্তৃত অথচ সেই এক শৃঙ্খলেরই অংশ। ইহাকেই ক্রমোন্নতিবাদ বলে। এই ধারণা অতি প্রাচীন—মনুষ্যসমাজ যত প্রাচীন, এই ধারণাও তত প্রাচীন। কেবল মানুষের জ্ঞান যত বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই উহা যেন আমাদের চক্ষে আরও উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাত হইতেছে। প্রাচীনেরা আর একটি বিষয় বিশেষরূপে বুঝিতেন—ক্রমসঙ্কোচ। কিন্তু আধুনিকেরা এই তত্ত্বটি তত ভালরূপ বুঝেন না। বীজই বৃক্ষ হয়, একবিন্দু বালুকণা কখন বৃক্ষ হয় না। পিতাই পুত্র হয়, মৃত্তিকাখণ্ড কখন সন্তানরূপে জন্মে না। প্রশ্ন এই—এই ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়া আরম্ভ হইবার পূর্ব্বাবস্থাটি কি? বীজ পূর্ব্বে কি ছিল? উহা সেই বৃক্ষরূপে ছিল। ঐ বীজে ভবিষ্যৎ একটি বৃক্ষের সম্ভাবনীয়তা রহিয়াছে। ক্ষুদ্র শিশুতে ভবিষ্যৎ মানুষের সমুদয় শক্তি অন্তর্নিহিত রহিয়াছে। সর্ব্বপ্রকার ভবিষ্যৎ জীবনই অব্যক্তভাবে উহাদের বীজে রহিয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি? ভারতের প্রাচীন দার্শনিকেরা ইহাকে ‘ক্রমসঙ্কোচ’ বলিতেন। অতএব আমরা দেখিতে পাইতেছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের আদিতেই একটি ‘ক্রমসঙ্কোচ’-প্রক্রিয়া রহিয়াছে। যাহা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান নহে, তাহার কখন ক্রমবিকাশ হইতে পারে না। এখানেও আধুনিক বিজ্ঞান আমাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। গণিতের যুক্তি দ্বারা সঠিকভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে

যে, জগতে যত শক্তির বিকাশ দেখা যায়, তাহাদের সমষ্টি সর্ব্বদাই সমান। তুমি একবিন্দু জড় বা একবিন্দু শক্তি বাড়াইতে বা কমাইতে পার না। অতএব শূন্য হইতে কখনই ক্রমবিকাশ হয় না। তবে কোথা হইতে হইল? অবশ্য ইহার পূর্ব্বে ক্রমসঙ্কোচ-প্রক্রিয়া হইয়া থাকিবে। পূর্ণবয়স্ক মানুষের ক্রমসঙ্কোচে শিশুর উৎপত্তি, আবার শিশু হইতে ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ায় মানুষের উৎপত্তি। সর্ব্বপ্রকার জীবনের উৎপত্তির সম্ভাবনীয়তা তাহাদের বীজে রহিয়াছে। এখন এই সমস্যা যেন কিছু সরল হইয়া আসিতেছে। এখন এই তত্ত্বটির সঙ্গে পূর্ব্বকথিত সমুদয় জীবনের অখণ্ডত্বের বিষয় আলোচনা কর। ক্ষুদ্রতম জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত বাস্তবিক এক সত্তা—এক জীবনই বর্ত্তমান। যেমন এক জীবনেই আমরা শৈশব, যৌবন, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা দেখিতে পাই, সেইরূপ শৈশব অবস্থার পশ্চাতে কি আছে তাহা দেখিবার জন্য বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া দেখ, যতক্ষণ না তুমি জীবাণুতে উপনীত হও। এইরূপে ঐ জীবাণু হইতে পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত যেন এক জীবনসূত্র বিরাজমান। ইহাকেই ক্রমবিকাশ বলে এবং আমরা দেখিয়াছি, প্রত্যেক ক্রমবিকাশের পূর্ব্বেই একটি ক্রমসঙ্কোচ রহিয়াছে। যে জীবনীশক্তি এই ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া ধীরে ধীরে পূর্ণতম মানব বা পৃথিবীতে আবির্ভূত ঈশ্বরাবতাররূপে ক্রমবিকশিত হয়—এই সমুদয়গুলি অবশ্যই জীবাণুতে সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করিতেছিল। এই সমুদয় শ্রেণীটি সেই এক জীবনেরই অভিব্যক্তিমাত্র, আর এই সমুদয় ব্যক্ত জগৎ সেই এক জীবাণুতেই

অব্যক্তভাবে নিহিত ছিল। এই সমুদয় জীবনীশক্তি—এমন কি মর্ত্ত্যে অবতীর্ণ ঈশ্বর পর্য্যন্ত উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলেন। অবতার-শ্রেণীর মানব পর্য্যন্ত উহার মধ্যে অন্তর্নিহিত ছিলেন ; কেবল ধীরে ধীরে, অতি ধীরে ক্রমশঃ সেগুলির অভিব্যক্তি হইয়াছে মাত্র। সর্ব্বোচ্চ চরম অভিব্যক্তি যাহা, তাহাও অবশ্যই জীবভাবে সূক্ষ্মাকারে উহার ভিতরে বর্ত্তমান ছিল—তাহা হইলে যে এক শক্তি হইতে সমগ্র শ্রেণী বা শৃঙ্খলটি আসিয়াছে, উহা কাহার ক্রমসঙ্কোচ হইল ? সেই সর্ব্বব্যাপিনী জগন্ময়ী জীবনীশক্তির ক্রমসঙ্কোচ আর এই যে ক্ষুদ্রতম জীবাণু নানা জটিল-যন্ত্রসমন্বিত উচ্চতম বুদ্ধিশক্তির আধাররূপ মানবাকারে অভিব্যক্ত হইতেছে, কোন্ বস্তু ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া ঐ জীবাণু-আকারে অবস্থিতি করিতেছিল ? উহা সর্ব্বব্যাপী জগন্ময় চৈতন্য—উহাই ঐ জীবাণুতে ক্রমসঙ্কুচিত হইয়া বর্ত্তমান ছিল। উহা সমুদয়ই প্রথম হইতে পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল। উহা যে একটু একটু করিয়া বাড়িতেছে, তাহা নহে। বৃদ্ধিভাব মন হইতে একেবারে দূর করিয়া দাও। বৃদ্ধি বলিলেই যেন বোধ হয়, বাহির হইতে কিছু আসিতেছে। ইহা মানিলে পূর্ব্বোক্ত গণিতের সিদ্ধান্ত অর্থাৎ জগতে শক্তিসমষ্টি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র সমান, ইহা অস্বীকার করিতে হয়। এই জাগতিক সর্ব্বব্যাপী চৈতন্যের কখন বৃদ্ধি হয় না, উহা সর্ব্বদাই পূর্ণভাবে বর্ত্তমান ছিল, কেবল এখানে অভিব্যক্ত হইল মাত্র। বিনাশের অর্থ কি ? এই একটি গ্লাস রহিয়াছে। আমি উহা ভূমিতে ফেলিয়া দিলাম, উহা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। প্রশ্ন এই—গ্লাসটির কি হইল ? উহা সূক্ষ্মরূপে পরিণত হইল মাত্র। তবে বিনাশের কি অর্থ

হইল? স্থূলের সূক্ষ্মভাবে পরিণতি। উহার উপাদান পরমাণুগুলি একত্র হইয়া গ্লাস নামক এই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। উহারা আবার উহাদের কারণে চলিয়া যায়, আর ইহারই নাম নাশ—কারণে লয়। কার্য্য কি? না, কারণের ব্যক্তভাব। নতুবা কার্য্য ও কারণে স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। আবার ঐ গ্লাসের কথাই ধর। উহার উপাদানগুলি এবং উহার নির্ম্মাতার ইচ্ছার সহযোগে উহা উৎপন্ন। এই দুইটিই উহার কারণ এবং উহাতে বর্ত্তমান। নির্ম্মাতার ইচ্ছাশক্তি এক্ষণে উহাতে কি ভাবে বর্ত্তমান?—সংহতিশক্তিরূপে। ঐ শক্তি না থাকিলে, উহার প্রত্যেক পরমাণু পৃথক পৃথক হইয়া যাইত। তবে এক্ষণে কার্য্যটি কি হইল? না, উহা কারণের সহিত অভেদ, কেবল উহা আর একরূপ ধরিয়াছে মাত্র। যখন কারণ নির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বা নির্দ্দিষ্ট স্থানের ভিতর পরিণত, ঘনীভূত সীমাবদ্ধভাবে অবস্থান করে, তখন ঐ কারণটিকেই কার্য্য বলে। আমাদের ইহা মনে করিয়া রাখা উচিত। এই তত্ত্বটিকে আমাদের জীবনের ধারণা সম্বন্ধে প্রযুক্ত করিয়া দেখিতে পাই যে, জীবাণু হইতে সম্পূর্ণতম মানব পর্য্যন্ত সমুদয় শ্রেণীই অবশ্য সেই বিশ্বব্যাপিনী প্রাণশক্তির সহিত অভেদ। কিন্তু অমৃতত্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন এখানেও মিটিল না। আমরা কি পাইলাম? আমরা পূর্ব্বোক্ত বিচার হইতে এইটুকু মাত্র পাইলাম যে, জগতের কিছুরই ধ্বংস হয় না। নূতন কিছুই নাই—কিছুই হইবে না। সেই একই প্রকারের বস্তুরাশি চক্রের ন্যায় পুনঃ পুনঃ উপস্থিত হইতেছে। জগতে যত গতি আছে, সবই তরঙ্গাকারে একবার উঠিতেছে, একবার পড়িতেছে।

কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড সূক্ষ্মতর রূপ হইতে প্রসূত হইতেছে—স্থূল রূপ ধারণ করিতেছে। আবার লয় হইয়া সূক্ষ্মভাব ধারণ করিতেছে। আবার ঐ সূক্ষ্মভাব হইতে তাহাদের স্থূলভাবে আগমন—কিছুদিনের জন্য তদবস্থায় অবস্থান, আবার ধীরে ধীরে সেই কারণে গমন। যায় কি? না—রূপ আকৃতি। সেই রূপটি নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু উহা আবার আসে। একভাবে ধরিতে গেলে, এই শরীর পর্য্যন্ত অবিনাশী। একভাবে, দেহসকল এবং রূপসকলও নিত্য। মনে কর, আমরা পাশা খেলিতেছি। মনে কর ৬।৩।৯ পড়িল। আমরা আবার খেলিতে লাগিলাম। এইরূপে ক্রমাগত খেলিতে খেলিতে এমন এক সময় নিশ্চয় আসিবে, যখন উহা আবার ৬।৩।৯ এই ক্রমে পড়িবে। আবার খেলিতে থাক, আবার উহা পড়িবে, কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে। আমি এই জগতের প্রত্যেক পরমাণুকেই এক একটি পাশার সহিত তুলনা করিতেছি। এইগুলিকেই বার বার ফেলা হইতেছে, উহারা বারংবার নানাভাবে পড়িতেছে। এই তোমাদের সম্মুখে যেসকল পদার্থ রহিয়াছে, তাহারা পরমাণুগুলির এক বিশেষ প্রকার সন্নিবেশে উৎপন্ন। এই এখানে গেলাস, টেবিল, জলের কুঁজা প্রভৃতি রহিয়াছে। উহারা ঐ পরমাণুগুলির সমবায়বিশেষ—মুহূর্ত্তেক পরেই হয়ত ঐ সমবায়গুলি নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমন এক সময় অবশ্যই আসিবে যখন আবার ঠিক ঐ সমবায়গুলি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যখন তোমরা এখানে উপস্থিত থাকিবে, এই কুঁজা ও অন্যান্য যাহা কিছু রহিয়াছে, তাহারাও ঠিক তাহাদের যথাস্থানে থাকিবে, আর ঠিক এই

বিষয়েই আলোচনা হইবে। অনন্ত বার এইরূপ হইয়াছে এবং অনন্ত বার এইরূপ হইবে। তাহা আমরা স্থূল, বাহ্য বস্তুসমূহের আলোচনা করিয়া উহা হইতে কি তত্ত্ব পাইলাম? পাইলাম এই যে, এই ভৌতিক পদার্থসমূহের বিভিন্ন সমবায় অনন্তকাল ধরিয়া পুনরাবৃত্তি হইতেছে।

এই সঙ্গে আর একটি প্রশ্ন আসে—ভবিষ্যৎ জানা সম্ভব কি না। আপনারা অনেকে হয়ত এমন লোক দেখিয়াছেন, যিনি কোন ব্যক্তির ভূত ভবিষ্যৎ সব বলিয়া দিতে পারেন। যদি ভবিষ্যৎ কোন নিয়মের অধীন না হয়, তবে ভবিষ্যৎসম্বন্ধে বলা কিরূপে সম্ভব হইবে? কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, অতীত ঘটনারই ভবিষ্যতে পুনরাবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহা হউক, ইহাতে কিন্তু আত্মার কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। নাগরদোলার কথা মনে কর। উহা অনবরত ঘুরিতেছে। একদল লোক আসিতেছে—তাহার এক একটাতে বসিতেছে। সেটি ঘুরিয়া আবার নীচে আসিতেছে। সেই দল নামিয়া গেল—আর একদল আসিল। ক্ষুদ্রতম জন্তু হইতে উচ্চতম মানব পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই প্রত্যেক রূপটিই যেন এই একটি দল, আর প্রকৃতিই এই বৃহৎ নাগরদোলা ও প্রত্যেক শরীর বা রূপ এই নাগরদোলার এক একটি ঘরস্বরূপ। এক এক দল নূতন আত্মা উহাদের উপর আরোহণ করিতেছে এবং যতদিন না পূর্ণ হইতেছে, ততদিন উচ্চ হইতে উচ্চতর পথে যাইতেছে এবং ঐ নাগরদোলা হইতে বাহির হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ নাগরদোলা থামিতেছে না, উহা সর্ব্বদা চলিতেছে—সর্ব্বদাই অপরকে গ্রহণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া

আছে ; এবং যতদিন শরীর এই চক্রের ভিতর, এই নাগরদোলার ভিতর রহিয়াছে, ততদিন নিশ্চিতভাবে, গণিতের ন্যায় সঠিকভাবে বলা যাইতে পারে যে, উহা কোথায় যাইবে, কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে তাহা বলা অসম্ভব। অতএব প্রকৃতির ভূত ভবিষ্যৎ নিশ্চিতরূপে গণিতের ন্যায় সঠিকভাবে বলা অসম্ভব নহে।

আমরা এক্ষণে দেখিলাম, জড় পরমাণুসকল এখন যেভাবে সংহত রহিয়াছে, সময়বিশেষে পুনরায় তাহাদের তদ্রূপ সংহতি হইয়া থাকে। অনন্তকাল ধরিয়া জগতের এইরূপ প্রবাহরূপে নিত্যতা চলিয়াছে। কিন্তু ইহাতে ত আত্মার অমরত্ব প্রতিপন্ন হইল না। আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, কোন শক্তিরই নাশ হয় না, কোন জড়বস্তুকে কখনও শূন্যে পর্য্যবসিত করা যাইতে পারে না। তবে উহাদের কি হয় ? উহাদের নানারূপ পরিণাম হইতে থাকে, অবশেষে যেখান হইতে উহাদের উৎপত্তি হইয়াছিল তথায়ই উহারা পুনরাবৃত্ত হয়। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। প্রত্যেক বস্তুই ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার পূর্ব্বস্থানে প্রত্যাবৃত্ত হয়, কারণ সরলরেখা অনন্তভাবে বাড়াইলে বৃত্তরূপে পরিণত হয়। তাহাই যদি হইল, তবে কোন আত্মারই অনন্তকালের জন্য অবনতি হইতে পারে না—উহা হইতেই পারে না। এই জগতে প্রত্যেক জিনিসই শীঘ্র বা বিলম্বে নিজ নিজ বৃত্তগতি সম্পূর্ণ করিয়া আবার নিজ উৎপত্তিস্থানে উপনীত হয়। তুমি, আমি, আর এই সকল আত্মাগণ কি ? আমরা পূর্ব্বে ক্রমসঙ্কোচ ও ক্রমবিকাশতত্ত্ব আলোচনার সময় দেখিয়াছি, তুমি, আমি সেই বিরাট বিশ্বব্যাপী চৈতন্য বা প্রাণ বা মনের অংশবিশেষ ; আমরা

উহারই ক্রমসঙ্কোচস্বরূপ। সুতরাং আমরা আবার ঘুরিয়া ক্রমবিকাশ-প্রক্রিয়ানুসারে সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যে ফিরিয়া যাইব— ঐ বিশ্বব্যাপী চৈতন্যই ঈশ্বর। সেই বিশ্বব্যাপী চৈতন্যকেই লোক প্রভু, ভগবান, খ্রীষ্ট, বুদ্ধ বা ব্রহ্ম বলিয়া থাকে—জড়বাদীরা উহাকেই শক্তিরূপে উপলব্ধি করে এবং অজ্ঞেয়বাদীরা ইহাকেই সেই অনন্ত অনির্ব্বচনীয় সর্ব্বাতীত পদার্থ বলিয়া ধারণা করে। উহাই সেই বিশ্বব্যাপী প্রাণ, উহাই বিশ্বব্যাপী চৈতন্য, উহাই বিশ্বব্যাপিনী শক্তি এবং আমরা সকলেই উহার অংশস্বরূপ।

কিন্তু আত্মার অমরত্ব-প্রমাণে ইহাও পর্য্যাপ্ত হইল না। এখনও অনেক সংশয়, অনেক আশঙ্কা রহিয়া গেল। কোন শক্তির নাশ নাই, একথা শুনিতে খুব মিষ্ট বটে কিন্তু বাস্তবিক আমরা যত শক্তি দেখিতে পাই, সবই মিশ্রণোৎপন্ন, যত রূপ দেখিতে পাই. তাহাও মিশ্রণোৎপন্ন। যদি তুমি শক্তিসম্বন্ধে বিজ্ঞানের মত ধরিয়া উহাকে কতকগুলি শক্তির সমষ্টিমাত্র বল, তবে তোমার আমিত্ব থাকে কোথায়? যাহা কিছু মিশ্রণে উৎপন্ন, তাহাই শীঘ্র বা বিলম্বে ইহাদের কারণীভূত পদার্থে লয় হইবে; যাহা কিছু কতকগুলি কারণের সমবায়ে উৎপন্ন, তাহারই মৃত্যু, তাহারই বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। শীঘ্র বা বিলম্বে উহা বিশ্লিষ্ট হইবে, ভগ্ন হইবে, উহাদের কারণীভূত পদার্থে পরিণত হইবে। আত্মা কোন ভৌতিক শক্তি বা চিন্তাশক্তি নহে। উহা চিন্তাশক্তির স্রষ্টা; কিন্তু উহা চিন্তাশক্তি নহে। উহা শরীরের গঠনকর্ত্তা, কিন্তু উহা শরীর নহে। কেন? শরীর কখন আত্মা হইতে পারে না; কারণ উহা চৈতন্যবান নহে। মৃত ব্যক্তি অথবা

কসাই-এর দোকানের একখণ্ড মাংস কখন চৈতন্যবান নহে। আমরা 'চৈতন্য' শব্দে কি বুঝি?—প্রতিক্রিয়াশক্তি।

আর একটু গভীর ভাবে এই তত্ত্বটি আলোচনা করা যাক। সম্মুখে এই কুঁজাটি দেখিতেছি। এখানে ঘটিতেছে কি? ঐ কুঁজা হইতে কতকগুলি আলোককিরণ আসিয়া আমার চক্ষে প্রবেশ করিতেছে। উহারা আমার অক্ষিজালের (retina) উপর একটি চিত্র প্রক্ষেপ করিতেছে। আর ঐ ছবি যাইয়া আমার মস্তিষ্কে উপনীত হইতেছে। শারীরবিধানবিদ্‌গণ যাহাদিগকে অনুভবাত্মক স্নায়ু বলেন, তাহাদিগের দ্বারা ঐ চিত্র ভিতরে মস্তিষ্কে নীত হয়। কিন্তু তথাপি তখন পর্য্যন্ত দর্শনক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। কারণ এ পর্য্যন্ত ভিতর হইতে কোন প্রতিক্রিয়া আসে নাই। মস্তিষ্কাভ্যন্তরীণ স্নায়ুকেন্দ্র উহাকে মনের নিকট লইয়া যাইবে, আর মন উহার উপর প্রতিক্রিয়া করিবে। এই প্রতিক্রিয়া হইবামাত্র ঐ কুঁজা আমার সম্মুখে ভাসিতে থাকিবে। একটি সহজ উদাহরণের দ্বারা ইহা অনায়াসেই উপলব্ধ হইবে। মনে কর, তুমি খুব একাগ্র হইয়া আমার কথা শুনিতেছ, আর একটি মশক তোমার নাসিকাগ্রে দংশন করিতেছে, কিন্তু তুমি আমার কথা শুনিতে এতদূর তন্মনস্ক যে, তুমি মশার কামড় মোটেই অনুভব করিতেছ না। এখানে কি ব্যাপার হইতেছে? মশকটি তোমার চামড়ার খানিকটা দংশন করিয়াছে; সেই স্থানে অবশ্য কতকগুলি স্নায়ু আছে; ঐ স্নায়ুগুলি মস্তিষ্কে সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গিয়াছে; সেই বস্তুর চিত্র তথায় রহিয়াছে; কিন্তু মন অন্যদিকে নিযুক্ত থাকাতে প্রতিক্রিয়া করে নাই, সুতরাং তুমি

মশকের দংশন টের পাও নাই। আমাদের সমক্ষে নূতন চিত্র আসিল, কিন্তু মন প্রতিক্রিয়া করিল না—এরূপ হইলে আমরা উহার সম্বন্ধে জানিতেই পারিব না, কিন্তু প্রতিক্রিয়া হইলেই উহাদের জ্ঞান আসিবে—তখনই আমরা দেখিতে শুনিতে এবং অনুভব প্রভৃতি করিতে সমর্থ হইব। এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানের প্রকাশ হইয়া থাকে। অতএব আমরা বুঝিতেছি, শরীর কখন প্রকাশে সমর্থ নহে, কারণ আমরা দেখিতেছি যে, যখন আমার মনোযোগ ছিল না, তখন আমি অনুভব করি নাই। এমন ঘটনা জানা গিয়াছে, যাহাতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, একজন ব্যক্তি যে ভাষা কখন শিখে নাই, সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইয়াছে। পরে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি অতি শৈশবাবস্থায় এমন জাতির ভিতর বাস করিত, যাহারা সেই ভাষা কহিত—সেই সংস্কার তার মস্তিষ্কের মধ্যে রহিয়া গিয়াছিল। সেইগুলি তথায় সঞ্চিত ছিল; তৎপর কোন কারণে মন প্রতিক্রিয়া করিল—তখনই জ্ঞান আসিল। আর সেই ব্যক্তি সেই ভাষা কহিতে সমর্থ হইল। ইহাতেই আবার দেখা যাইতেছে, কেবল মনই পর্য্যাপ্ত নহে, মনও কাহারও হস্তে যন্ত্র মাত্র; ঐ লোকটির বাল্যাবস্থায় তাহার মনের ভিতর সেই ভাষা গূঢ়ভাবে ছিল—কিন্তু সে উহা জানিত না, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিল, যখন সে উহা জানিতে পারিল। ইহা দ্বারা এই প্রমাণিত হইতেছে যে, মন ছাড়া আর কেহ আছেন—লোকটির শৈশব-অবস্থায় সেই 'আর কেহ' ঐ শক্তির ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু যখন সে বড় হইল তখন তিনি উহার ব্যবহার করিলেন। প্রথম—এই শরীর, তৎপরে

মন অর্থাৎ চিন্তার যন্ত্র, তৎপরে এই মনের পশ্চাতে সেই আত্মা। আধুনিক দার্শনিকগণ চিন্তাকে মস্তিষ্কস্থ পরমাণুর বিভিন্ন প্রকার পরিবর্ত্তনের সহিত অভেদ বলিয়া মানেন, সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ ঘটনাবলীর ব্যাখ্যায় অশক্ত; সেই জন্য তাঁহারা সাধারণতঃ ঐ সকল একেবারে অস্বীকার করিয়া থাকেন।

যাহা হউক, মনের সহিত কিন্তু মস্তিষ্কের বিশেষ সম্বন্ধ এবং শরীরের বিনাশ হইলে উহা কার্য্য করিতে পারে না। আত্মাই একমাত্র প্রকাশক—মন উহার হস্তে যন্ত্রস্বরূপ; বাহিরের চক্ষুরাদি যন্ত্রে বিষয়ের চিত্র পতিত হয়, উহারা আবার ঐ চিত্রকে ভিতরের মস্তিষ্ককেন্দ্রে লইয়া যায়—কারণ ইহা তোমাদের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেবল ঐ চিত্রের গ্রাহকমাত্র; ভিতরের যন্ত্র অর্থাৎ মস্তিষ্ককেন্দ্রসমূহই কার্য্য করিয়া থাকে। সংস্কৃত ভাষায় ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্রসকলকে ইন্দ্রিয় বলে—তাহারা ঐ চিত্রগুলিকে লইয়া মনের নিকট সমর্পণ করে; মন আবার উহাদিগকে বুদ্ধির নিকট এবং বুদ্ধি উহাদিগকে আপন সিংহাসনে অবস্থিত মহামহিমান্বিত রাজার রাজা আত্মাকে প্রদান করে। তিনি তখন দেখিয়া যাহা আবশ্যক, তাহা আদেশ করেন। তখন মন ঐ মস্তিষ্ককেন্দ্র অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গুলির উপর কার্য্য করে, আবার উহারা স্থূল শরীরের উপর কার্য্য করে। মানুষের আত্মাই বাস্তবিক এই সমুদয়ের অনুভবকর্ত্তা, শাস্তা, স্রষ্টা—সবই। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা শরীরও নহে, মনও নহে। আত্মা কোন যৌগিক পদার্থ হইতে পারে না। কেন? কারণ যাহা কিছু যৌগিক পদার্থ, তাহাই হয় আমাদের দর্শনের বিষয়, আমাদের কল্পনার বিষয়। যে

জিনিস আমরা দর্শন বা কল্পনা করিতে পারি না, যাহাকে আমরা ধরিতে পারি না, যাহা ভূতও নহে, শক্তিও নহে, যাহা কার্য্য, কারণ অথবা কার্য্যকারণসম্বন্ধ কিছুই নহে, তাহা যৌগিক বা মিশ্র হইতে পারে না। অন্তর্জ্জগৎ পর্য্যন্তই মিশ্র পদার্থের অধিকার—তাহার বাহিরে আর নহে। মিশ্র পদার্থ সমুদয়ই নিয়মের রাজ্যের মধ্যে—নিয়মের রাজ্যের বাহিরে উহারা থাকিতে পারে না। আরও পরিষ্কার করিয়া বলা যাক্। এই গেলাস একটি যোগোৎপন্ন পদার্থ—ইহার কারণগুলি মিলিত হইয়া এই কার্য্যরূপে পরিণত হইয়াছে। সুতরাং এই কারণগুলির সংহতিস্বরূপ গেলাস নামক যৌগিক পদার্থটি কার্য্যকারণনিয়মের অন্তর্গত। এইরূপে যেখানে যেখানে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ দেখা যাইবে—সেখানে সেখানেই যৌগিকপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইবে। তাহার বাহিরে উহার অস্তিত্বের কথা কহা বাতুলতামাত্র। উহাদের বাহিরে আর কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ খাটিতে পারে না—আমরা যে জগৎ-সম্বন্ধে চিন্তা অথবা কল্পনা করিতে পারি, অথবা যাহা দেখিতে শুনিতে পারি, তাহারই ভিতরে কেবল নিয়ম খাটিতে পারে। আমরা আরও দেখিয়াছি যে, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা অনুভব বা কল্পনা করিতে পারি তাহাই আমাদের জগৎ—বাহ্যবস্তু আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, আর ভিতরের বস্তু মানস-প্রত্যক্ষ বা কল্পনা করিতে পারি, অতএব যাহা আমাদের শরীরের বাহিরে তাহা ইন্দ্রিয়ের বাহিরে এবং যাহা কল্পনার বাহিরে তাহা আমাদের মনের বাহিরে, সুতরাং আমাদের জগতের বাহিরে। অতএব কার্য্যকারণসম্বন্ধের বহির্দ্দেশে স্বাধীন শাস্তা আত্মা রহিয়াছে। তাহা হইলেই, তিনি নিয়মের অন্তর্গত

সমুদয় বস্তুর নিয়মন করিতেছেন। এই আত্মা নিয়মের অতীত, সুতরাং অবশ্যই তিনি মুক্তস্বভাব ; উহা কোনরূপ মিশ্রণোৎপন্ন পদার্থ হইতে পারে না অথবা কোন কারণের কার্য্য হইতে পারে না। উহার কখন বিনাশ হইতে পারে না, কারণ বিনাশ-অর্থে কোন যৌগিক পদার্থের স্বীয় উপাদানগুলিতে পরিণতি। সুতরাং যাহা কখনো সংযোগোৎপন্ন ছিল না, তাহার বিনাশ কিরূপে হইবে ? উহার মৃত্যু হয় বা বিনাশ হয় বলা কেবল অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র।

কিন্তু এখানেই প্রশ্নের চূড়ান্ত মীমাংসা হইল না। এইবারে আমরা বড় কঠিন জায়গায় আসিয়া পৌছিয়াছি—বড় সূক্ষ্ম সমস্যায় আসিয়া পড়িয়াছি। তোমাদের মধ্যে অনেকে হয় ত ভয় পাইবে। আমরা দেখিয়াছি, আত্মা ভূত, শক্তি ও চিন্তারূপ ক্ষুদ্র জগতের অতীত বলিয়া একটি মৌলিক পদার্থ—সুতরাং উহার বিনাশ অসম্ভব। এইরূপ উহার জীবনও অসম্ভব। কারণ যাহার বিনাশ নাই, তাহার জীবন কি করিয়া থাকিবে ? মৃত্যু কি ? না, এ-পিঠ ; জীবন তাহারই ও-পিঠ। মৃত্যুর আর এক নাম জীবন এবং জীবনের আর এক নাম মৃত্যু। অভিব্যক্তির রূপবিশেষকে আমরা জীবন বলি, আবার উহারই অপর রূপবিশেষকে মৃত্যু বলি। যখন তরঙ্গ উচ্চে উঠে তখন উহাকে বলে জীবন, আর যখন উহা নামিয়া যায় তখন বলে মৃত্যু। যদি কোন বস্তু মৃত্যুর অতীত হয়, তবে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তাহা জন্মেরও অতীত। প্রথম সিদ্ধান্তই এক্ষণে স্মরণ কর যে, মানবাত্মা সেই সর্ব্বব্যাপিনী জগন্ময়ী শক্তি অথবা ঈশ্বরের প্রকাশমাত্র। আমরা এক্ষণে পাইলাম, উহা জন্মমৃত্যু উভয়েরই অতীত। তোমার কখনও জন্ম হয় নাই, তোমার

মৃত্যুও কখন হইবে না। জন্মমৃত্যু কি, কাহারই বা হয়? জন্ম-মৃত্যু দেহের—আত্মা ত সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান। এ কিরূপ হইল? আমরা এই এখানে এতগুলি লোক বসিয়া রহিয়াছি, আর আপনি বলিতেছেন আত্মা সর্ব্বব্যাপী। এইটুকু বুঝ যে, যে জিনিস নিয়মের বাহিরে, কার্য্যকারণসম্বন্ধের বাহিরে, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? এই গেলাসটি সসীম—ইহা সর্ব্বব্যাপী নহে, কারণ চতুর্দ্দিকস্থ জড়রাশি উহাকে ঐরূপ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া থাকিতে বাধ্য করিয়াছে—উহাকে সর্ব্বব্যাপী হইতে দিতেছে না। চতুর্দ্দিকস্থ সমুদয় বস্তুই উহার উপর প্রভাব বিস্তার করিতেছে—এই হেতু উহা সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যাহা সমুদয় নিয়মের বাহিরে, যাহার উপর কার্য্য করিবার কেহই নাই, তাহাকে কিসে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে? উহা অবশ্যই সর্ব্বব্যাপী হইবে। তুমি জগতের সর্ব্বত্রই অবস্থিত রহিয়াছ। তবে আমি জন্মিলাম, মরিব—এ সকল ভাব কি? এগুলি অজ্ঞানের কথা মাত্র, বুঝিবার ভুল। তুমি কখন জন্মাও নাই, মরিবেও না। তোমার জন্ম হয় নাই, পুনর্জ্জন্মও কখনও হইবে না। যাওয়া-আসার অর্থ কি? কেবল পাগলামী মাত্র। তুমি সর্ব্বত্রই রহিয়াছ। তবে এই যাওয়া-আসার অর্থ কি? উহা কেবল সূক্ষ্ম শরীর—যাহাকে তোমরা মন বল, তাহারই নানাবিধ পরিণাম-প্রসূত ভ্রমমাত্র। যেন আকাশের উপর দিয়া একখণ্ড মেঘ যাইতেছে। উহা যখন চলিতে থাকে, তখন মনে হয় আকাশই চলিতেছে। অনেক সময় তোমরা দেখিয়া থাকিবে, চাঁদের উপর মেঘ চলিতেছে। তোমরা মনে কর যে, চাঁদই এখান

হইতে ওখানে যাইতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে মেঘই চলিতেছে। আরও দেখ, যখন রেলগাড়ীতে তোমরা গমন কর, তোমাদের মনে হয় সম্মুখের গাছপালা ভূমি—সব যেন দৌড়াইতেছে; যখন নৌকায় চলিতে থাক, তখন মনে হয় যে জলই চলিতেছে। বাস্তবিকপক্ষে, তুমি কোথাও যাইতেছ না, আসিতেছও না—তোমার জন্ম হয় নাই, কখন হইবেও না, তুমি অনন্ত, সর্ব্বব্যাপী, সকল কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, নিত্যমুক্ত, অজ ও অবিনাশী। যখন জন্মই নাই, তখন বিনাশের আবার অর্থ কি? বাজে কথা মাত্র—তোমরা সকলেই সর্ব্বব্যাপী।

কিন্তু নির্দ্দোষ যুক্তিসঙ্গত সিদ্ধান্ত লাভ করিতে হইলে, আমাদিগকে আর এক সোপান অগ্রসর হইতে হইবে। বাড়ীর দিকে অর্দ্ধেক গিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। তোমরা দার্শনিক, তোমরা যদি খানিক দূর বিচারে অগ্রসর হইয়া বল, 'আর পারি না, ক্ষমা করুন,' তাহা তোমাদের পক্ষে সাজে না। তবে যদি আমরা সমুদয় নিয়মের বাহিরে হইলাম, তবে অবশ্যই আমরা সর্ব্বজ্ঞ, নিত্যানন্দস্বরূপ; অবশ্যই সকল জ্ঞানই আমাদের ভিতরে আছে, সর্ব্বপ্রকার শক্তি—সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ আমাদের মধ্যে নিহিত আছে। অবশ্যই তোমরা সকলেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী হইলে; কিন্তু এরূপ পুরুষ কি জগতে বহু থাকিতে পারে? কোটি কোটি সর্ব্বব্যাপী পুরুষ থাকিবে কিরূপে? অবশ্যই থাকিতে পারে না। তবে আমাদের কি হইল? বাস্তবিক একজনই আছেন, একটি আত্মাই আছেন, আর সেই এক আত্মা তুমিই। সেই ক্ষুদ্র প্রকৃতির পশ্চাতে রহিয়াছে আত্মা। এক পুরুষই

আছেন—যিনি একমাত্র সত্তা, যিনি নিত্যানন্দস্বরূপ, যিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বজ্ঞ, জন্ম ও মৃত্যুরহিত। তাঁহার আজ্ঞায় আকাশ বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার আজ্ঞায় বায়ু বহিতেছে, সূর্য্য কিরণ দিতেছে, সকলেই প্রাণধারণ করিতেছে। তিনিই প্রকৃতির ভিত্তিস্বরূপ; প্রকৃতি সেই সত্যস্বরূপের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই সত্য প্রতীয়মান হইতেছে। তিনি তোমার আত্মারও ভিত্তিভূমিস্বরূপ। শুধু তাহাই নহে, তুমিই তিনি। তুমি তাঁহার সহিত অভেদ। যেখানেই দুই সেখানেই ভয়, সেইখানেই বিপদ, সেইখানেই দ্বন্দ্ব, সেইখানেই গোল। যখন সবই এক তখন কাহাকে ঘৃণা করিব, কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিব? যখন সবই তিনি তখন কাহার সহিত যুদ্ধ করিব? ইহাতেই জীবনসমস্যার মীমাংসা হইয়া যায়, ইহাতেই বস্তুর স্বরূপ ব্যাখ্যাত হইয়া যায়। সিদ্ধি বা পূর্ণতা ইহাই এবং ইহাই ঈশ্বর। যখন তুমি বহু দেখিতেছ তখনই বুঝিতে হইবে, তুমি অজ্ঞানের ভিতর রহিয়াছ। এই বহুত্বপূর্ণ জগতের ভিতর, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতের ভিতর অবস্থিত নিত্য পুরুষকে যিনি নিজের আত্মার আত্মা বলিয়া জানিতে পারেন, নিজের স্বরূপ বলিয়া জানিতে পারেন তিনিই মুক্ত, তিনিই পূর্ণানন্দে বিভোর হইয়া থাকেন, তিনিই সেই পরমপদ লাভ করিয়াছেন। অতএব জানিয়া রাখ যে, তুমিই তিনি, তুমিই জগতের ঈশ্বর—'তত্ত্বমসি'; আর এই যে আমাদের বিভিন্ন ধারণা—যথা, আমি পুরুষ বা স্ত্রী, দুর্ব্বল, সবল, সুস্থ, অসুস্থ, অথবা আমি অমুককে ঘৃণা করি বা অমুককে ভালবাসি, আমার ক্ষমতা অল্প অথবা আমার অনেক শক্তি আছে, এগুলি ভ্রমমাত্র। উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। তোমাকে কিসে দুর্ব্বল করিতে পারে? কিসে

তোমাকে ভীত করিতে পারে? একমাত্র তুমিই জগতে বিরাজ করিতেছ। কিসে তোমায় ভয় দেখাইতে পারে? অতএব উঠ, মুক্ত হও। জানিয়া রাখ, যে-কোন চিন্তা বা বাক্য আমাদিগকে দুর্ব্বল করে তাহাই একমাত্র অশুভ; যাহাই মানুষকে দুর্ব্বল করে, যাহাই তাহাকে ভীত করে তাহাই একমাত্র অশুভ, তাহারই পরিহার করিতে হইবে। কিসে তোমাকে ভীত করিতে পারে? যদি শত শত সূর্য্য জগতে পতিত হয়, যদি কোটি কোটি চন্দ্র গুঁড়াইয়া যায়, কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড যদি বিনষ্ট হয়, তাহাতে তোমার কি? অচলবৎ দণ্ডায়মান হও, তুমি অবিনাশী। তুমি জগতের আত্মা, ঈশ্বর। 'শিবোঽহং শিবোঽহম্' বল, আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ, যেমন সিংহ লতা-পাতা-নির্ম্মিত ক্ষুদ্র খাঁচা ভগ্ন করিয়া ফেলে, সেইরূপ এই বন্ধন ছিঁড়িয়া ফেল ও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হও। কিসে তোমাকে ভয় দেখাইতে পারে? কিসে তোমাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে? কেবল অজ্ঞান, কেবল ভ্রম; আর কিছুই তোমাকে বাঁধিতে পারে না; তুমি শুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়।

নির্ব্বোধেরাই উপদেশ দিয়া থাকে—তোমরা পাপী, অতএব এক কোণে বসিয়া হা-হুতাশ করে। এরূপ উপদেশদাতৃগণের এরূপ উপদেশদানে নির্ব্বুদ্ধিতা ও দুষ্টামিই প্রকাশ পায়। তোমরা সকলেই ঈশ্বর। ঈশ্বর না দেখিয়া মানুষ দেখিতেছ। অতএব যদি তোমরা সাহসী হও, তবে এই বিশ্বাসের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমুদয় জীবনকে ঐ ছাঁচে গঠন কর। যদি কোন ব্যক্তি তোমার গলা কাটিতে আসে, তাহাকে 'না' বলিও না, কারণ তুমি নিজেই নিজের গলা কাটিতেছ। কোন গরীব লোকের কিছু উপকার যদি কর, তাহা হইলে বিন্দুমাত্র

অহঙ্কৃত হইও না। উহা তোমার পক্ষে উপাসনামাত্র; উহাতে অহঙ্কারের বিষয় কিছুই নাই। সমুদয় জগৎই কি তুমি নও? এমন কোথায় কি জিনিস আছে, যাহা তুমি নও? তুমি জগতের আত্মা। তুমিই সূর্য্য, চন্দ্র, তারা। সমুদয় জগৎই তুমি। কাহাকে ঘৃণা করিবে বা কাহার সহিত দ্বন্দ্ব করিবে? অতএব জানিয়া রাখ, তিনিই তুমি—আর সমুদয় জীবন ঐ ছাঁচে গঠন কর। যে ব্যক্তি এই তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া তাহার সমুদয় জীবন এই ভাবে গঠন করে, সে আর কখনও অন্ধকারে ভ্রমণ করিবে না।

# বহুত্বে একত্ব

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূস্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্ ।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদাবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥

কঠোপনিষৎ—দ্বিতীয়াধ্যায়, প্রথমবল্লী

"স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া বিধান করিয়াছেন, সেইজন্যই মনুষ্য সম্মুখদিকে ( বিষয়ের প্রতি ) দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। কোন কোন জ্ঞানী ব্যক্তি বিষয় হইতে নিবৃত্তচক্ষু এবং অমৃতত্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া অন্তরস্থ আত্মাকে দেখিতে থাকেন।" আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে এবং আরও অন্যান্য গ্রন্থে জগতের যে তত্ত্বানুসন্ধান হইতেছিল তাহাতে বহিঃপ্রকৃতির তত্ত্বালোচনা করিয়াই জগৎকারণের অনুসন্ধানচেষ্টা হইয়াছিল, তাহার পর এই সত্যানুসন্ধিৎসুগণের হৃদয়ে এক নূতন আলোকের প্রকাশ হইল; তাঁহারা বুঝিলেন বহির্জ্জগতে অনুসন্ধান দ্বারা বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ জানিবার উপায় নাই। তবে কি করিয়া জানিতে হইবে? না, বাহির হইতে চক্ষু ফিরাইয়া অর্থাৎ ভিতরে দৃষ্টি করিয়া। আর এখানে আত্মার বিশেষণ-স্বরূপে যে 'প্রত্যক্' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও একটি বিশেষ ভাবব্যঞ্জক। 'প্রত্যক্' কি না, যিনি ভিতর দিকে গিয়াছেন—আমাদের অন্তরতম বস্তু হৃদয়কেন্দ্র, সেই পরমবস্তু

যাহা হইতে সমুদয়ই যেন বাহির হইয়াছে, সেই মধ্যবর্ত্ত সূর্য্য, মন, শরীর, ইন্দ্রিয় এবং আর যাহা কিছু আমাদে আছে, সবই যাঁহার কিরণজাল-স্বরূপ। ‘পরাচঃ কামানমুয বালাস্তে মৃত্যোর্যন্তি বিততস্য পাশম্। অথ ধীরা অমৃতত্ব বিদিত্বা ধ্রুবমধ্রুবেষ্বিহ ন প্রার্থয়ন্তে॥’ কঠ—ঐ। ‘বালকবুদ্ধি ব্যক্তিরা বাহিরের কাম্যবস্তুর অনুসরণ করে। এই জন্যই তাহারা সর্ব্বতোব্যাপ্ত মৃত্যুর পাশে আবদ্ধ হয়, কিন্তু জ্ঞানীর অমৃতত্বকে জানিয়া অনিত্যবস্তুসমূহের মধ্যে নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান করেন না।’ এখানেও ঐ একই ভাব পরিস্ফুট হইল যে, সসীমবস্তুপূর্ণ বাহ্যজগতে অনন্তকে দেখিবার চেষ্টা করা বৃথা—অনন্তকে অনন্তেই অন্বেষণ করিতে হইবে এবং আমাদের অন্তর্ব্বর্ত্তী আত্মাই একমাত্র অনন্ত বস্তু। শরীর, মন, যে জগৎপ্রপঞ্চ আমরা দেখিতেছি, অথবা আমাদের চিন্তারাশি, কিছুই অনন্ত হইতে পারে না। উহাদের সকলগুলিরই কালে উৎপত্তি ও কালে বিলয়। যে দ্রষ্টা সাক্ষী পুরুষ ঐ সবগুলিকে দেখিতেছেন, অর্থাৎ মানুষের আত্মা, যিনি সদা জাগ্রত, তিনিই একমাত্র অনন্ত, তিনিই জগতের কারণস্বরূপ; অনন্তকে অনুসন্ধান করিতে হইলে আমাদিগকে তথায় যাইতে হইবে—সেই অনন্ত আত্মাতেই আমরা জগতের কারণকে দেখিতে পাইব। ‘যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ। মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥’ কঠ—ঐ। ‘যিনি এখানে, তিনিই সেখানে; যিনি সেখানে, তিনিই এখানে। যিনি এখানে নানারূপ দেখেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন।’ সংহিতাভাগে দেখিতে পাই, আর্য্যগণের

স্বর্গে যাইবার বিশেষ ইচ্ছা। যখন তাঁহারা জগৎপ্রপঞ্চে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, তখন স্বভাবতঃই তাঁহাদের এমন একস্থানে যাইবার ইচ্ছা হইল, যেখানে দুঃখসম্পর্কশূন্য কেবল সুখ। এই স্থানগুলির নাম স্বর্গ—যেখানে কেবল আনন্দ, যেখানে শরীর অজর অমর হইবে, মনও তদ্রূপ হইবে, তাঁহারা সেখানে চিরকাল পিতৃগণের সহিত বাস করিবেন। কিন্তু দার্শনিক চিন্তার অভ্যুদয়ে এইরূপ স্বর্গের ধারণা অসঙ্গত ও অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 'অনন্ত একদেশ ব্যাপিয়া বিদ্যমান'—এই বাক্যই যে স্ববিরোধী। কোন স্থানবিশেষের অবশ্যই কালে উৎপত্তি ও নাশ হয়, সুতরাং তাহাদিগকে অনন্ত স্বর্গের ধারণা ত্যাগ করিতে হইল। তাঁহারা ক্রমশঃ বুঝিলেন, এই স্বর্গনিবাসী দেবগণ এককালে এই জগতে মনুষ্য ছিলেন, পরে হয়ত কোন সৎকর্ম্মবশে দেবতা হইয়াছেন; সুতরাং এই দেবত্ব বিভিন্ন পদের নাম মাত্র। বৈদিক কোন দেবতাই ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে।

ইন্দ্র বা বরুণ কোন ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। উঁহারা বিভিন্ন পদের নাম। তাঁহাদের মতে যিনি পূর্ব্বে ইন্দ্র ছিলেন এক্ষণে তিনি আর ইন্দ্র নহেন, তাঁহার এক্ষণে আর ইন্দ্রত্বপদ নাই, আর একজন এখান হইতে গিয়া সেই পদ অধিকার করিয়াছেন। সকল দেবতার সম্বন্ধেই এইরূপ বুঝিতে হইবে। যে-সকল মানুষ কর্ম্মবলে দেবত্বপ্রাপ্তির যোগ্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই এইসকল পদে সময়ে সময়ে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু ইঁহাদেরও বিনাশ আছে। প্রাচীন ঋগ্বেদে দেবগণ-সম্বন্ধে এই 'অমরত্ব' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাই বটে, কিন্তু পরবর্ত্তী

কালে উহা একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে, কারণ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন এই অমরত্ব দেশকালের অতীত বলিয়া কোন ভৌতিক বস্তু সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, সেই বস্তু যতই সূক্ষ্ম হউক। উহা যতই সূক্ষ্ম হউক না কেন, দেশকালে উহার উৎপত্তি, কারণ আকারের উৎপত্তির প্রধান উপাদান দেশ। দেশ ব্যতীত আকারের বিষয় ভাবিতে চেষ্টা কর, উহা অসম্ভব। দেশই আকার নির্ম্মাণ করিবার একটি বিশিষ্ট উপাদান—এই আকৃতির নিরন্তর পরিবর্ত্তন হইতেছে। দেশ ও কাল মায়ার ভিতরে। আর স্বর্গ যে এই পৃথিবীরই মত দেশকালে সীমাবদ্ধ, এই ভাবটি উপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকাংশে ব্যক্ত হইয়াছে—'যদেবেহ তদমুত্র যদমুত্র তদন্বিহ'—'যাহা এখানে তাহা সেখানে, যাহা সেখানে তাহা এখানে।' যদি এই দেবতারা থাকেন, তবে এখানে যে নিয়ম সেই নিয়ম সেখানেও খাটিবে; আর সকল নিয়মের চরম উদ্দেশ্য—বিনাশ ও অবশেষে পুনঃ পুনঃ নূতন নূতন রূপ-পরিগ্রহ। এই নিয়মের দ্বারা সমুদয় জড় বিভিন্নরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, আবার ভগ্ন হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পুনঃ সেই জড়কণায় পরিণত হইতেছে। যে-কোন বস্তুর উৎপত্তি আছে, তাহারই বিনাশ হইয়া থাকে। অতএব যদি স্বর্গ থাকে, তবে তাহাও এই নিয়মের অধীন হইবে।

আমরা দেখিতে পাই, এই জগতে সর্ব্বপ্রকার সুখের ছায়াস্বরূপ কোন না কোনরূপ দুঃখ রহিয়াছে। জীবনের পশ্চাতে উহার ছায়াস্বরূপ মৃত্যু রহিয়াছে। উহারা সর্ব্বদা একসঙ্গেই থাকে। কারণ উহারা পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, উহারা

দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা নহে, উহারা একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ, সেই এক বস্তুই জীবন-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ প্রভৃতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ভাল আর মন্দ এই দুইটি যে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, আর উহারা যে অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে, এ ধারণা একেবারেই অসঙ্গত। উহারা বাস্তবিকই একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ—উহা কখন ভালরূপে, কখন বা মন্দরূপে প্রতিভাত হইতেছে মাত্র। বিভিন্নতা প্রকারগত নহে, পরিমাণগত। উহাদের প্রভেদ বাস্তবিক মাত্রার তারতম্যে। আমরা বাস্তবিক দেখিতে পাই, একই স্নায়ুপ্রণালী ভাল-মন্দ উভয়বিধ প্রবাহই বহন করিয়া থাকে। কিন্তু স্নায়ুমণ্ডলী যদি কোনরূপে বিকৃত হয়, তাহা হইলে কোনরূপ অনুভূতিই হইবে না। মনে কর, কোন একটি বিশেষ স্নায়ু পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইল, তখন তাহার মধ্য দিয়া যে সুখকর অনুভূতি আসিত তাহা আসিবে না, আবার দুঃখকর অনুভূতিও আসিবে না। এই সুখ-দুঃখ কখনই পৃথক নয়, উহারা সর্ব্বদাই যেন একত্র রহিয়াছে। আবার একই বস্তু জীবনে বিভিন্ন সময়ে কখন সুখ, কখন বা দুঃখ উৎপাদন করে। একই বস্তু কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ উৎপাদন করে। মাংসভোজনে ভোক্তার সুখ হয় বটে, কিন্তু যাহার মাংস খাওয়া হয় তাহার ত ভয়ানক কষ্ট। এমন কোন বিষয়ই নাই, যাহা সকলকে সমান ভাবে সুখ দিয়াছে। কতকগুলি লোক সুখী হইতেছে, আবার কতকগুলি লোক অসুখী হইতেছে। এইরূপ চলিবে। অতএব স্পষ্টতঃই দেখা গেল, দ্বৈতভাব বাস্তবিক মিথ্যা। ইহা হইতে কি পাওয়া গেল? আমি পূর্ব্ব বক্তৃতায়ই ইহা বলিয়াছি যে, জগতে

এমন অবস্থা কখন আসিতে পারে না, যখন সবই ভাল হইয়া যাইবে, মন্দ কিছুই থাকিবে না। ইহাতে অনেকের চিরপোষিত আশা চূর্ণ হইতে পারে বটে, অনেকে ইহাতে ভয়ও পাইতে পারেন বটে, কিন্তু ইহা স্বীকার করা ব্যতীত আমি অন্য উপায় দেখিতেছি না। অবশ্য আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে, উহা সত্য তবে আমি বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু যতদিন না বুঝিতে পারিতেছি ততদিন আমি কিরূপে উহা বলিব?

আমার এই বাক্যের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত এই এক তর্ক আছে যে, ক্রমবিকাশের গতিক্রমে কালে যাহা কিছু অশুভ দেখিতেছি সব চলিয়া যাইবে—ইহার ফল এই হইবে যে, এইরূপ কমিতে কমিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে এমন এক সময় আসিবে, যখন সমুদয় অশুভের উচ্ছেদ হইয়া কেবল শুভমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। ইহা আপাততঃ খুব অখণ্ডনীয় যুক্তি বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা সত্য হইলে বড়ই সুখের হইত, কিন্তু এই যুক্তিতে একটি দোষ আছে। তাহা এই যে, উহা শুভ ও অশুভ—এই দুইটির পরিমাণ চিরনির্দ্দিষ্ট বলিয়া ধরিয়া লইতেছে। উহা স্বীকার করিয়া লইতেছে যে, একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ অশুভ আছে, ধর তাহা যেন ১০০, আবার এইরূপ নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শুভও আছে, আর এই অশুভটি ক্রমশঃ কমিতেছে ও কেবল শুভটি অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে; কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাই? জগতের ইতিহাস সাক্ষ্য দিতেছে যে, শুভের ন্যায় অশুভও একটি ক্রমবর্দ্ধমান সামগ্রী। সমাজের খুব নিম্নস্তরের ব্যক্তির কথা ধর—সে জঙ্গলে বাস করে, তাহার

ভোগসুখ অতি অল্প, সুতরাং তাহার দুঃখও অল্প। তাহার দুঃখ কেবল ইন্দ্রিয়বিষয়েই আবদ্ধ। যদি সে প্রচুর আহার না পায়, তবে সে অসুখী হয়। তাহাকে প্রচুর খাদ্য দাও, তাহাকে স্বাধীনভাবে ভ্রমণ ও শিকার করিতে দাও, সে সম্পূর্ণরূপে সুখী হইবে। তাহার সুখ-দুঃখ সবই কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ। মনে কর সেই ব্যক্তির জ্ঞানের উন্নতি হইল। তাহার সুখ বাড়িতেছে, তাহার বুদ্ধি খুলিতেছে, সে পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ে যে সুখ পাইত, এক্ষণে বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া সেই সুখ পাইতেছে। সে এখন একটি সুন্দর কবিতা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব সুখ আস্বাদন করে। গণিতের যে-কোন সমস্যার মীমাংসায় তাহার সারা জীবন কাটিয়া যায়, তাহাতেই সে পরম সুখ ভোগ করে। কিন্তু ইহার সঙ্গে সঙ্গে অসভ্য অবস্থায় যে তীব্র যন্ত্রণা সে অনুভব করে নাই, তাহার স্নায়ুগণ সেই তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিতে ক্রমশঃ অভ্যস্ত হইয়াছে, অতএব সে তীব্র মানসিক কষ্ট ভোগ করে। একটি খুব সোজা উদাহরণ লও—তিব্বতদেশে বিবাহ নাই, সুতরাং সেখানে প্রেমের ঈর্ষ্যাও নাই, কিন্তু তথাপি আমরা জানি বিবাহ অপেক্ষাকৃত উন্নত সমাজের পরিচায়ক। তিব্বতীরা নিষ্কলঙ্ক স্বামী ও নিষ্কলঙ্ক স্ত্রীর বিশুদ্ধ দাম্পত্যপ্রেমের সুখ জানে না। কিন্তু তাহারা একজন ভ্রষ্ট বা ভ্রষ্টা হইলে অপরের মনে যে কি ভয়ানক ঈর্ষ্যা, কি ভয়ানক অন্তর্দ্দাহ উপস্থিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে তাহাও জানে না। একপক্ষে এই উচ্চ ধারণায় সুখের বৃদ্ধি হইল বটে, কিন্তু অপর দিকে ইহাতে দুঃখের বৃদ্ধি হইল।

তোমাদের নিজেদের দেশের কথাই ধর—পৃথিবীতে ইহার

মত ধনীর দেশ, বিলাসীর দেশ আর নাই—আবার দুঃখকষ্ট এখানে কি প্রবলভাবে বিরাজ করিতেছে তাহাও আলোচনা কর। অন্যান্য জাতির তুলনায় এদেশে পাগলের সংখ্যা কত অধিক। ইহার কারণ এখানকার লোকের বাসনাসমূহ অতি তীব্র, অতি প্রবল। এখানে লোককে সর্ব্বদাই উঁচু চাল বজায় রাখিয়া চলিতে হয়। তোমরা এক বছরে যত টাকা খরচ কর, একজন ভারতবাসীর পক্ষে তাহা সারাজীবনের সম্পত্তিস্বরূপ। আর তোমরা অপরকে উপদেশ দিতে পার না যে, উহা অপেক্ষা অল্প টাকায় জীবনযাত্রানির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা কর, কারণ এখানে পারিপার্শ্বিক অবস্থাই এইরূপ যে, স্থানবিশেষে এত টাকার কমে চলিবেই না—নতুবা সামাজিক চক্রে তোমায় নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে। এই সামাজিক চক্র দিবারাত্র ঘুরিতেছে—উহা বিধবার অশ্রু বা অনাথ-অনাথার চীৎকারে কর্ণপাতও করিতেছে না। তোমাকেও এই সমাজে অগ্রসর হইয়া চলিতে হইবে, নতুবা তোমাকে এই চক্রের নিম্নে নিষ্পিষ্ট হইতে হইবে। এখানে সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। তোমাদের ভোগের ধারণাও অনেক পরিমাণে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছে, তোমাদের সমাজও অন্যান্য সমাজ হইতে লোকের অধিক আকর্ষণের বস্তু। তোমাদের ভোগেরও নানাবিধ উপায় আছে। কিন্তু যাহাদের ঐরূপ ভোগের উপকরণ অল্প, তাহাদের আবার তোমার অপেক্ষা অল্প দুঃখ। এরূপই তুমি সর্ব্বত্র দেখিতে পাইবে। তোমার মনে যতদূর উচ্চাভিলাষ থাকিবে, তোমার তত বেশী সুখ, আবার সেই পরিমাণেই অসুখ। একটি যেন অপরটির ছায়াস্বরূপ

স্বরূপ। অশুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহা সত্য হইতে পারে, কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে শুভ চলিয়া যাইতেছে, ইহাও বলিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক যেমন দুঃখ একদিকে কমিতেছে, তেমনি কি আবার অপর দিকে কোটিগুণ বাড়িতেছে না? বাস্তবিক কথা এই, সুখ যদি যোগখড়ির নিয়মানুসারে বাড়িতে থাকে, তাহা হইলে দুঃখ গুণখড়ির নিয়মানুসারে বাড়িতেছে বলিতে হইবে। ইহার নামই মায়া। ইহা কেবল সুখবাদ নহে; কেবল দুঃখবাদও নহে। বেদান্ত কহেন না যে জগৎ কেবল দুঃখময়। এইরূপ বলাই ভুল। আবার এই জগৎ সুখে স্বচ্ছন্দে পরিপূর্ণ, এরূপ বলাও ঠিক নহে। বালকদিগকে এই জগৎ কেবল মধুময়—এখানে কেবল সুখ, এখানে কেবল ফুল, এখানে কেবল সৌন্দর্য্য, কেবল মধু—এরূপ শিক্ষা দেওয়া ভুল। আমরা সারা জীবনটাই এই ফুলের স্বপ্ন দেখিতেছি। আবার কোন একজন ব্যক্তি অপরের অপেক্ষা অধিক দুঃখভোগ করিয়াছে বলিয়া সবই দুঃখময় বলাও তেমনি ভুল। জগৎ এই দ্বৈতভাবপূর্ণ ভালমন্দের খেলা। বেদান্ত আবার ইহার উপর আর এক কথা বলেন। মনে করিও না যে, ভাল মন্দ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু, বাস্তবিক উহারা একই বস্তু, সেই এক বস্তুই ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন আকারে আবির্ভূত হইয়া এক ব্যক্তিরই মনে ভিন্ন ভিন্ন ভাব উৎপাদন করিতেছে। অতএব বেদান্তের প্রথম কার্য্যই এই, এই আপাতভিন্নপ্রতীয়মান বাহ্যজগতের মধ্যে একত্ব আবিষ্কার করা। পারসীকদের মত এই যে, দুইটি দেবতা মিলিয়া জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন; এ মতটি অবশ্য অতি অনুন্নত মনের পরিচায়ক। তাঁহাদের মতে ভাল দেবতা যিনি, তিনি সব সুখ বিধান

করিতেছেন, আর অসৎ দেবতা সব অসৎ বিষয় বিধান করিতেছেন। ইহা যে অসম্ভব, তাহা ত স্পষ্টই বোধ হইতেছে; কারণ বাস্তবিক এই নিয়মে কার্য্য হইলে প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়মেরই দুইটি করিয়া অংশ থাকিবে—কখন একজন দেবতা উহা চালাইতেছেন, তিনি সরিয়া গেলেন, আবার আর একজন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা দেখিতে পাই, যে শক্তি আমাদিগকে আমাদের খাদ্য দিতেছে, আবার তাহাই দৈবদুর্বিপাক দ্বারা অনেক লোককে সংহার করিতেছে। এই মত স্বীকারে আর একটি গোল এই যে, একই সময়ে দুই জন দেবতা কার্য্য করিতেছেন। একস্থানে একজন কাহারও উপকার করিতেছেন, অপর স্থানে অপরে অন্য কাহারও অপকার করিতেছেন। অথচ দুইজনে আপনাদের মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখিতেছেন—ইহা কি করিয়া হইতে পারে? অবশ্য এ মত জগতের দ্বৈততত্ত্ব প্রকাশ করিবার খুব অপরিণত প্রণালীমাত্র—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এক্ষণে উচ্চতর দর্শনসমূহে এই বিষয়ের কিরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা আলোচনা করা যাউক। ঐগুলিতে স্থূল তত্ত্বের কথা ছাড়িয়া দিয়া সূক্ষ্ম ভাবের দিক দিয়া বলা হয়, জগৎ কতক ভাল, কতক মন্দ। পূর্ব্বে যে যুক্তিপরম্পরা বিবৃত হইয়াছে, তদনুসারে ইহাও অসম্ভব।

অতএব দেখিতেছি, কেবল সুখবাদ বা কেবল দুঃখবাদ—কোন মতের দ্বারাই জগতের ব্যাখ্যা বা যথার্থ বর্ণনা হয় না। কতকগুলি ঘটনা সুখবাদের পোষক, কতকগুলি আবার দুঃখবাদের।

কিন্তু ক্রমশঃ আমরা দেখিব, বেদান্তে সমুদয় দোষ প্রকৃতির স্কন্ধ হইতে তুলিয়া লইয়া আমাদের নিজেদের উপর দেওয়া হইতেছে। আবার উহাতে আমাদিগকে বিশেষ আশাও দিতেছে। বেদান্ত বাস্তবিক অমঙ্গল অস্বীকার করে না। উহা জগতের সমুদয় ঘটনার সর্ব্বাংশ বিশ্লেষণ করে—কোন বিষয় গোপন করিতে চাহে না, উহা একেবারে মানুষকে নিরাশা-সাগরে ভাসাইয়া দেয় না। উহা অজ্ঞেয়বাদও নহে। উহা এই সুখদুঃখ-প্রতীকারের উপায় আবিষ্কার করিয়াছে, আর ঐ প্রতীকারোপায় বজ্রদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। উহা এমন উপায়ের কথা বলে না, যাহাতে কেবল ছেলেদের মুখ বন্ধ করিয়া দিতে পারে এবং সে যাহা সহজেই ধরিয়া ফেলিবে, এমন স্পষ্ট অসত্যের দ্বারা তাহার দৃষ্টিকে অন্ধ করিয়া দিতে পারে। আমার স্মরণ আছে যখন আমি বালক ছিলাম, কোন যুবকের পিতা মরিয়া গেল, তাহাতে সে অতি দরিদ্র হইয়া গেল, অনেক পরিবার তাহার ঘাড়ে পড়িল। সে দেখিল, তাহার পিতার বন্ধুগণই বাস্তবিক তাহার প্রধান শত্রু। একদিন একজন ধর্ম্মযাজকের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহার নিজ দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল—তিনি তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য বলিলেন, “যাহা হইতেছে, সবই মঙ্গল; যাহা কিছু হয়, সব ভালর জন্যই হয়।” পুরাতন ক্ষতকে সোনার কাপড় দিয়া মুড়িয়া রাখা যেমন, ধর্ম্মযাজকের পূর্ব্বোক্ত বাক্যও ঠিক তদ্রূপ। ইহা আমাদের নিজেদের দুর্ব্বলতা ও অজ্ঞানের পরিচয়মাত্র। ছয় মাস বাদে সেই ধর্ম্মযাজকের একটি সন্তান হইল, তদুপলক্ষে যে উৎসব হইল, তাহাতে

সেই যুবাটি নিমন্ত্রিত হইল। ধর্ম্মযাজকটি ভগবানের উপাসনা আরম্ভ করিয়া বলিতে লাগিলেন, "ঈশ্বরের কৃপার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।" তখন যুবকটি উঠিয়া বলিল, "সে কি বলিতেছেন—তাঁহার কৃপা কোথায়? এ যে ঘোর অভিশাপ।" ধর্ম্মযাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরূপ?" যুবক উত্তর দিল, "যখন আমার পিতার মৃত্যু হইল, তখন তাহা আপাততঃ অমঙ্গল হইলেও উহাকে মঙ্গল বলিয়াছেন। এক্ষণে আপনার সন্তানের জন্মও আপাততঃ মঙ্গলকর বলিয়া প্রতীত হইতেছে বটে, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে উহা আমার চক্ষে মহা অমঙ্গল বলিয়া বোধ হইতেছে।" এইরূপ ভাবে জগতের দুঃখ, অমঙ্গলের বিষয় চাপিয়া রাখাই কি জগতের দুঃখ-নিবারণের উপায়? নিজে ভাল হও এবং যাহারা কষ্ট পাইতেছে, তাহাদের উপর দয়া প্রকাশ কর। জোড়াতাড়া দিয়া রাখিবার চেষ্টা করিও না, তাহাতে ভবরোগ আরোগ্য হইবে না। বাস্তবিকপক্ষে, আমাদিগকে জগতের বাহিরে যাইতে হইবে।

এই জগৎ সর্ব্বদাই ভালমন্দের মিশ্রণ। যেখানে ভাল দেখিবে, জানিবে—তাহার পশ্চাতে মন্দও রহিয়াছে। কিন্তু এই সমুদয় ব্যক্ত ভাবের পশ্চাতে—এই সমুদয় বিরোধী ভাবের পশ্চাতে—বেদান্ত সেই একত্বকে প্রাপ্ত হয়। বেদান্ত বলেন, মন্দ ত্যাগ কর, আবার ভালও ত্যাগ কর। তাহা হইলে বাকি কি রহিল? বেদান্ত বলেন, শুধু ভালমন্দেরই অস্তিত্ব আছে, তাহা নহে। ইহাদের পশ্চাতে এমন জিনিস বাস্তবিক রহিয়াছে, যাহা প্রকৃতপক্ষে তোমার, যাহা বাস্তবিকই তুমি, যাহা সর্ব্বপ্রকার শুভ ও সর্ব্বপ্রকার অশুভের বাহিরে—সেই বস্তুই শুভ বা অশুভরূপে

প্রকাশ পাইতেছে। প্রথমে ইহা জ্ঞাত হও—তখন, কেবল তখনই তুমি পূর্ণ সুখবাদী হইতে পারিবে। তাহার পূর্ব্বে নহে। তাহা হইলেই তুমি সমুদয় জয় করিতে পারিবে। এই আপাতপ্রতীয়মান ব্যক্তভাবগুলিকে আপনার আয়ত্ত কর, তাহা হইলে তুমি সেই সত্যবস্তুকে যেরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিতে পারিবে। তখনই তুমি উহাকে শুভরূপেই হউক, আর অশুভরূপেই হউক, যেরূপে ইচ্ছা, প্রকাশ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথমে তোমাকে নিজে নিজের প্রভু হইতে হইবে। উঠ, আপনাকে মুক্ত কর, এই সমুদয় নিয়মের রাজ্যের বাহিরে যাও, কারণ এই নিয়মগুলি প্রকৃতির সর্ব্বাংশব্যাপী নহে, উহারা তোমার প্রকৃত স্বরূপের অতি সামান্যই প্রকাশ করে মাত্র। প্রথমে নিজে জ্ঞাত হও যে, তুমি প্রকৃতির দাস নহ, কখন ছিলে না, কখন হইবেও না—প্রকৃতিকে আপাততঃ অনন্ত বলিয়া মনে করিতেছ বটে, কিন্তু বাস্তবিক উহা সসীম, উহা সমুদ্রের এক বিন্দুমাত্র, তুমিই বাস্তবিক সমুদ্রস্বরূপ, তুমি চন্দ্র সূর্য্য তারা—সকলেরই অতীত। তোমার অনন্ত স্বরূপের তুলনায় উহারা বুদ্বুদমাত্র। ইহা জানিলে তুমি ভালমন্দ উভয়ই জয় করিবে। তখনই তোমার সমুদয় দৃষ্টি একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে, তখন তুমি দাঁড়াইয়া বলিতে পারিবে, "মঙ্গল কি সুন্দর এবং অমঙ্গল কি অদ্ভুত।"

বেদান্ত ইহাই করিতে বলেন। বেদান্ত বলেন না, সোনার পাত মুড়িয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখ, আর যতই ক্ষত পচিতে থাকে, আরও অধিক সোনার পাতা দিয়া মুড়। এই জীবন একটা কঠিন সমস্যা, সন্দেহ নাই। যদিও ইহা বজ্রবৎ দুর্ভেদ্য প্রতীত হয়,

তথাপি যদি পার, সাহসপূর্ব্বক ইহার বাহিরে যাইবার চেষ্টা কর—আত্মা এই দেহ অপেক্ষা অনন্তগুণে শক্তিমান। বেদান্ত তোমার কর্ম্মফলের জন্য অপর দেবতার উপর দায়িত্ব নিক্ষেপ করেন না, কিন্তু বলেন, তুমি নিজেই তোমার অদৃষ্টের নির্ম্মাতা। তুমি নিজ কর্ম্মফলে ভালমন্দ উভয়ই ভোগ করিতেছ, তুমি নিজেই নিজের চক্ষে হাত দিয়া বলিতেছ—অন্ধকার। হাত সরাইয়া লও—আলোক দেখিতে পাইবে। তুমি জ্যোতিঃস্বরূপ—তুমি পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ। এখন আমরা—'মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি' এই শ্রুতির অর্থ বুঝিতে পারিতেছি।

কি করিয়া আমরা এই তত্ত্ব জানিতে পারিব? এই মন যাহা এত ভ্রান্ত, এত দুর্ব্বল, যাহা এত সহজে বিভিন্ন দিকে প্রধাবিত হয়, এই মনকেও সবল করা যাইতে পারে—যাহাতে উহা সেই জ্ঞানের—সেই একত্বের আভাস পায়। তখন সেই জ্ঞানই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা করে। 'যথোদকং দুর্গে বৃষ্টং পর্ব্বতেষু বিধাবতি। এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুবিধাবতি ॥'—কঠ, ২য় অঃ, ১মা বল্লী, ১৪ শ্লোক। 'উচ্চ দুর্গম ভূমিতে বৃষ্টি হইলে জল যেমন পর্ব্বতসমূহ দিয়া বিকীর্ণভাবে ধাবিত হয়, সেইরূপ যে গুণসমূহকে পৃথক করিয়া দেখে সে তাহাদেরই অনুবর্ত্তন করে।' বাস্তবিক শক্তি এক, কেবল মায়াতে পড়িয়া বহু হইয়াছে। বহুর জন্য ধাবমান হইও না, সেই একের দিকে অগ্রসর হও। 'হংসঃ শুচিষদ্বসুরন্তরিক্ষসদ্ধোতা বেদিষদতিথির্দুরোণসৎ। নৃষদ্বরসদৃতসদ্ব্যোমসদব্জা গোজা ঋতজা অদ্রিজা ঋতং বৃহৎ ॥'—কঠ, ২য় অঃ, ২য়া বল্লী, ২য় শ্লোক। 'তিনি (সেই আত্মা)

আকাশবাসী সূর্য্য, অন্তরীক্ষবাসী বায়ু, বেদিবাসী অগ্নি ও কলসবাসী সোমরস। তিনি মনুষ্য, দেবতা, যজ্ঞ ও আকাশে আছেন। তিনি জলে, পৃথিবীতে, যজ্ঞে এবং পর্ব্বতে উৎপন্ন হয়েন; তিনি সত্য ও মহান্।' 'অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥' 'বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥' —কঠ, ২য় অঃ, ২য়া বল্লী, ৯ম ও ১০ম শ্লোক। 'যেমন একই অগ্নি ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তুর রূপভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করেন, তেমনি এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই বস্তুরূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং সমুদয়ের বাহিরেও আছেন। যেমন একই বায়ু ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া নানাবস্তুভেদে তদ্রূপ হইয়াছেন, তেমনি সেই এক সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা নানাবস্তুভেদে সেই সেই রূপ হইয়াছেন এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।' যখন তুমি এই একত্ব উপলব্ধি করিবে, তখনই এই অবস্থা হয়, তাহার পূর্ব্বে নহে। ইহাই প্রকৃত সুখবাদ—সর্ব্বত্র তাঁহার দর্শন। এক্ষণে প্রশ্ন এই, যদি ইহা সত্য হয়, যদি সেই শুদ্ধস্বরূপ অনন্ত আত্মা এই সকলের ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া থাকেন, তবে তিনি কেন সুখ-দুঃখ ভোগ করেন, কেন তিনি অপবিত্র হইয়া দুঃখভোগ করেন? উপনিষদ্ বলেন, তিনি দুঃখানুভব করেন না। 'সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ॥'—কঠ, ২য় অঃ, ২য়া বল্লী, ১১শ শ্লোক। 'সর্ব্বলোকের চক্ষুস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষুর্গ্রাহ্য বাহ্য অশুচি

বস্তুর সহিত লিপ্ত হয়েন না, তেমনি একমাত্র সর্ব্বভূতান্তরাত্মা জগৎসম্বন্ধী দুঃখের সহিত লিপ্ত হয়েন না, কারণ তিনি আবার জগতের অতীত। আমার এমন রোগ থাকিতে পারে যাহাতে আমি সবই পীতবর্ণ দেখিতে পারি, কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের কিছুই হয় না। 'একো বশী সর্ব্বভূতান্তবাত্মা একং রূপং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেযাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥'—কঠ, ২য় অঃ, ২য়া বল্লী, ১২শ শ্লোক। 'যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বকীয় একরূপকে বহুপ্রকার করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন কবেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে।' 'নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্॥' - কঠ, ২য় অঃ, ২য়া বল্লী, ১৩শ শ্লোক। যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবান্‌দিগের মধ্যে চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্য বস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।' বাহ্য জগতে তাঁহাকে কোথায় পাওয়া যাইবে? সূর্য্য চন্দ্র বা তারায় তাঁহাকে কিরূপে পাইবে? 'ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোহয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥'—কঠ, ২য় অঃ, ২য়া বল্লী, ১৫শ শ্লোক। 'সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না, চন্দ্রতারকা কিরণ দেয় না, এই বিদ্যুৎসমূহও প্রকাশ পায় না, এ অগ্নি কোথায়? সমুদয় বস্তু সেই দীপ্যমানের প্রকাশে অনুপ্রকাশিত, তাঁহারই দীপ্তিতে সকল দীপ্তি পাইতেছে। 'ঊর্দ্ধমূলোহবাক্‌শাখ এষোহশ্বত্থঃ সনাতনঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম

তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিঁল্লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ এতদ্বৈ তৎ।'—কঠ, ২য় অঃ, ৩য়া বল্লী, ১ম শ্লোক। 'ঊর্দ্ধমূল ও নিম্নগামী শাখাযুক্ত এই চিরন্তন অশ্বত্থবৃক্ষ (অর্থাৎ সংসারবৃক্ষ) রহিয়াছে। তিনিই উজ্জ্বল, তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃতরূপ উক্ত হয়েন। সমুদয় লোক তাঁহাতে আশ্রিত হইয়া রহিয়াছে। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইনিই সেই আত্মা।'

বেদের ব্রাহ্মণভাগে নানাবিধ স্বর্গের কথা আছে। উপনিষদের মত এই যে, এই স্বর্গে যাইবার বাসনা ত্যাগ করিতে হইবে। ইন্দ্রলোকে, বরুণলোকে যাইলেই যে ব্রহ্মদর্শন হয়, তাহা নহে, বরং এই আত্মার ভিতরেই এই ব্রহ্মদর্শন সুস্পষ্টরূপে হইয়া থাকে। 'যথাদর্শে তথাত্মনি যথা স্বপ্নে তথা পিতৃলোকে। যথাপ্সু পরীব দদৃশে তথা গন্ধর্ব্বলোকে ছায়াতপয়োরিব ব্রহ্মলোকে॥'—কঠ, ২য় অঃ, ৩য়া বল্লী, ৫ম শ্লোক। 'যেমন আরশিতে লোকে আপনার প্রতিবিম্ব পরিষ্কাররূপে দেখিতে পায়, তেমনি আত্মাতে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন স্বপ্নে আপনাকে অস্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়, তেমনি পিতৃলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন জলে লোকে আপনার রূপ দর্শন করে, তেমনি গন্ধর্ব্বলোকে ব্রহ্মদর্শন হয়। যেমন আলোক ও ছায়া পরস্পর পৃথক, সেইরূপ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম ও জগতের পার্থক্য স্পষ্ট উপলব্ধ হয়।' কিন্তু তথাপি পূর্ণরূপে ব্রহ্মদর্শন হয় না। অতএব বেদান্ত বলেন, আমাদের নিজ আত্মাই সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ, মানবাত্মাই পূজার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির, উহা সর্ব্বপ্রকার স্বর্গ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ এই আত্মার মধ্যে যেভাবে সেই সত্যকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়, আর কোথাও তত স্পষ্ট অনুভব হয়

না। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গেলেই যে এই আত্মদর্শন সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সাহায্য হয় তাহা নহে। ভারতবর্ষে যখন ছিলাম তখন মনে হইত, কোন গুহায় বাস করিলে হয়ত খুব স্পষ্ট ব্রহ্মানুভূতি হইবে, তাহার পর দেখিলাম, তাহা নহে। তাহার পর ভাবিলাম, হয়ত বনে গেলে সুবিধা হইবে, তাহার পর কাশীর কথা মনে হইল। সব স্থানই একরূপ, কারণ আমরা নিজেরাই নিজেদের জগৎ গঠন করিয়া লই। যদি আমি অসাধু হই, সমুদয় জগৎ আমার পক্ষে অসাধু প্রতীয়মান হইবে। উপনিষদ্ ইহাই বলেন। আর সেই একই নিয়ম সর্ব্বত্র খাটিবে। যদি আমার এখানে মৃত্যু হয় এবং যদি আমি স্বর্গে যাই, সেখানেও এখানকারই মত দেখিব। যতক্ষণ তুমি না পবিত্র হইতেছ, ততক্ষণ গুহা, অরণ্য, বারাণসী অথবা স্বর্গে যাওয়ার বিশেষ কিছু লাভ নাই; আর যদি তুমি তোমার চিত্তদর্পণকে নির্ম্মল করিতে পার, তবে তুমি যেখানেই থাক না কেন, তুমি প্রকৃত সত্য অনুভব করিবে। অতএব এখানে ওখানে যাওয়া বৃথা শক্তিক্ষয় মাত্র—সেই শক্তি যদি চিত্তদর্পণের নির্ম্মলতাসাধনে ব্যয়িত হয়, তবেই ঠিক হয়। নিম্নলিখিত শ্লোকে আবার ঐ ভাব বর্ণিত হইয়াছে:

'ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য
ন চক্ষুষা পশ্যতি কশ্চনৈনম্।
হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তো
য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি ॥'

—কঠ, ২য় অঃ, ৩য়া বল্লী, ৯ম শ্লোক

'ইহার রূপ দর্শনের বিষয় হয় না। কেহ তাঁহাকে চক্ষুদ্বারা দেখিতে পায় না। হৃদয়, সংশয়রহিত বুদ্ধি এবং মনন দ্বারা তিনি প্রকাশিত হয়েন। যাঁহারা এই আত্মাকে জানেন, তাঁহারা অমর হয়েন।' যাঁহারা আমার রাজযোগের বক্তৃতাগুলি শুনিয়াছেন, তাঁহাদিগের জ্ঞাতার্থে বলিতেছি যে, সে যোগ জ্ঞানযোগ হইতে কিছু ভিন্ন রকমের। জ্ঞানযোগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে, যথা :—

'যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ।
বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥'

—কঠ, ২য় অঃ, ৩য়া বল্লী, ১০ শ্লোক

অর্থাৎ, যখন সমুদয় ইন্দ্রিয়গুলি সংযত হয়, মানুষ যখন ঐগুলিকে আপনার দাসের মত করিয়া রাখে, যখন উহারা আর মনকে চঞ্চল করিতে পারে না, তখনই যোগী চরমগতি লাভ করেন।

'যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥
যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যেতাবদ্ধ্যনুশাসনম্॥'

—কঠ, ২য় অঃ, ৩য়া বল্লী, ১৪শ ও ১৫শ শ্লোক

অর্থাৎ, 'যে-সকল কামনা মর্ত্ত্যজীবের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া আছে, সেই সমুদয় যখন বিনষ্ট হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয় এবং এখানেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। যখন ইহলোকে হৃদয়ের গ্রন্থিসমূহ ছিন্ন হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, এইমাত্র উপদেশ।'

সাধারণতঃ লোকে বলিয়া থাকে বেদান্ত. শুধু বেদান্ত কেন, ভারতীয় সকল দর্শন ও ধর্ম্মপ্রণালীই এই জগৎ ছাড়িয়া উহার বাহিরে যাইতে বলিতেছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয় হইতেই প্রমাণিত হইবে যে, তাঁহারা স্বর্গ অথবা আর কোথাও যাইতে চাহিতেন না, বরং তাঁহারা বলেন, স্বর্গের ভোগ, সুখ, দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। যতদিন আমরা দুর্ব্বল থাকিব, ততদিন আমাদিগকে স্বর্গ নরকে ঘুরিতেই হইবে, কিন্তু আত্মাই বাস্তবিক একমাত্র সত্য। তাঁহারা ইহাও বলেন, আত্মহত্যা দ্বারা এই জন্মমৃত্যুপ্রবাহ অতিক্রম করা যায় না। তবে অবশ্য প্রকৃত পথ পাওয়া বড় কঠিন। পাশ্চাত্যদিগের ন্যায় হিন্দুরাও সব হাতে হাতড়ে করিতে চান; তবে উভয়ের দৃষ্টি ভিন্ন ভিন্ন। পাশ্চাত্যগণ বলেন, বেশ ভাল একখানি বাড়ী কর, উত্তম ভোজন, উত্তম পরিচ্ছদ সংগ্রহ কর, বিজ্ঞানের চর্চ্চা কর, বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতি কর। এইগুলি করিবার সময় তিনি খুব কাজের লোক। কিন্তু হিন্দুরা বলেন, জগতের জ্ঞান-অর্থে আত্মজ্ঞান—তিনি সেই আত্মজ্ঞানানন্দে বিভোর হইয়া থাকিতে চাহেন। আমেরিকায় একজন বিখ্যাত অজ্ঞেয়বাদী বক্তা আছেন—তিনি খুব ভাল লোক এবং একজন সুন্দর বক্তা। তিনি ধর্ম্মসম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। তাহাতে তিনি বলেন, ধর্ম্মের কোন আবশ্যকতা নাই, পরলোক লইয়া মাথা ঘামাইবার আমাদের কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। তাঁহার মত বুঝাইবার জন্য তিনি এই উপমাটি প্রয়োগ করিয়াছিলেন:—জগৎরূপ এই কমলালেবুটি আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহার সব রসটা আমরা বাহির করিয়া লইতে চাই। আমার সঙ্গে তাঁহার একবারমাত্র

সাক্ষাৎ হয়। আমি তাঁহাকে বলি, "আপনার সঙ্গে আমার একমত, আমারও নিকট এই ফল রহিয়াছে—আমিও ইহার রসটুকু সব লইতে চাই। তবে আমাদের মতভেদ কেবল ঐ ফলটি কি, এই বিষয় লইয়া। আপনি মনে করিতেছেন উহাকে কমলালেবু—আমি ভাবিতেছি আম। আপনি বোধ করেন, জগতে আসিয়া বেশ করিয়া খাইতে পরিতে পারিলে এবং কিছু বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানিতে পারিলেই ব্যস্, চূড়ান্ত হইল; কিন্তু আপনার বলিবার কোনই অধিকার নাই যে, উহা ছাড়া মানুষের আর কিছু কর্ত্তব্য নাই। আমার পক্ষে ঐ ধারণা একেবারে অকিঞ্চিৎকর।"

যদি কেবল আপেল ভূমিতে পড়ে কিরূপে, অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিরূপে স্নায়ুকে উত্তেজিত করে, ইহা জানাই জীবনের একমাত্র কার্য্য হয় তবে আমি ত এখনই আত্মহত্যা করি। আমার সংকল্প—আমি সকল বস্তুর মর্ম্মস্থল অনুসন্ধান করিব—জীবনের প্রকৃত রহস্য কি তাহা জানিব। তোমরা প্রাণের ভিন্ন-ভিন্ন বিকাশের আলোচনা কর, আমি প্রাণের স্বরূপ জানিতে চাই। আমি এই জীবনেই সমুদয় রসটি শুষিয়া লইতে চাই। আমার দর্শন বলে—জগৎ ও জীবনের সমুদয় রহস্যই জানিতে হইবে—স্বর্গ নরক প্রভৃতি সব কুসংস্কার তাড়াইয়া দিতে হইবে, যদি তাহাদের এই পৃথিবীর মত ব্যবহারিক সত্তা থাকে। আমি এই আত্মার অন্তরাত্মাকে জানিব—উহার প্রকৃত স্বরূপ জানিব—উহা কি—তাহা জানিব; শুধু উহা কিরূপে কার্য্য করিতেছে এবং উহার প্রকাশ কি, তাহা জানিলেই আমার তৃপ্তি হইবে না।

আমি সকল জিনিসের 'কেন' জানিতে চাই—'কেমন করিয়া হয়', এই অনুসন্ধান বালকেরা করুক। বিজ্ঞান আর কি? তোমাদের একজন বড়লোক বলিয়াছেন, 'সিগারেট খাইবার সময় যাহা যাহা ঘটে, তাহা যদি আমি লিখিয়া রাখি, তাহাই সিগারেটের বিজ্ঞান হইবে।' অবশ্য বিজ্ঞানবিৎ হওয়া খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে—ঈশ্বর ইঁহাদিগকে ইঁহাদের অনুসন্ধানে সহায়তা ও আশীর্ব্বাদ করুন; কিন্তু যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চ্চাই সর্ব্বস্ব, ইহা ছাড়া জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, তখন সে নির্ব্বোধের ন্যায় কথাবার্ত্তা কহিতেছে বুঝিতে হইবে। বুঝিতে হইবে—সে কখনও জীবনের মূল রহস্য জানিতে চেষ্টা করে নাই, প্রকৃত বস্তু কি, সে সম্বন্ধে সে কখনও আলোচনা করে নাই। আমি অনায়াসেই তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিতে পারি যে, তোমার যত কিছু জ্ঞান, সব ভিত্তিহীন। তুমি প্রাণের বিভিন্ন বিকাশগুলি লইয়া আলোচনা করিতেছ, কিন্তু যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, প্রাণ কি, তুমি বলিবে, আমি জানি না। অবশ্য তোমার যাহা ভাল লাগে তাহা করিতে তোমায় কেহ বাধা দিতেছে না, কিন্তু আমাকে আমার ভাবে থাকিতে দাও।

আর ইহাও লক্ষ্য করিও যে, আমি আমার নিজের ভাব যেটি সেটি কার্য্যে পরিণত করিয়া থাকি। অতএব অমুক কাজের লোক নয়, অমুক কাজের লোক, এ সব বাজে কথা মাত্র। তুমি কাজের লোক একভাবে, আমি আর একভাবে। এক প্রকৃতির লোক আছেন, তাঁহাদিগকে যদি বলা যায়, এক পায় দাঁড়াইয়া থাকিলে সত্য পাইবে, তবে তিনি এক পায়েই দাঁড়াইয়া

থাকিবেন। আর এক প্রকৃতির লোক আছেন—তাঁহারা শুনিয়াছেন, অমুক জায়গায় সোনার খনি আছে, কিন্তু উহার চতুর্দ্দিকে অসভ্য লোকের বাস। তিনজন লোক যাত্রা করিল। দুইজন হয় ত মারা গেল—একজন কৃতকার্য্য হইল। সেই ব্যক্তি শুনিয়াছেন —আত্মা বলিয়া কিছু আছে, কিন্তু সে পুরোহিতবর্গের উপর উহার মীমাংসার ভার দিয়াই নিশ্চিন্ত। কিন্তু প্রথমোক্ত ব্যক্তি সোনার জন্য অসভ্যদিগের কাছে যাইতে রাজি নন। তিনি বলেন, উহাতে বিপদাশঙ্কা আছে, কিন্তু যদি তাঁহাকে বলা যায়, এভারেষ্ট পর্ব্বতের শিখরে, সমুদ্রসমতলের ৩০,০০০ ফিট উপরে এমন একজন আশ্চর্য্য সাধু আছেন, যিনি তাঁহাকে আত্মজ্ঞান দিতে পারেন, অমনি তিনি কাপড়-চোপড় অথবা কিছুমাত্র না লইয়াই একেবারে যাইতে প্রস্তুত; এই চেষ্টায় হয়ত ৪০,০০০ লোক মারা যাইতে পারে, একজন কিন্তু সত্য লাভ করিল। ইহারাও একদিকে খুব কাজের লোক—তবে লোকের ভুল হয় এইটুকু, তুমি যেটুকুকে জগৎ বল সেইটুকুই সব, এই চিন্তা করা। তোমার জীবন ক্ষণস্থায়ী ইন্দ্রিয়ভোগমাত্র—উহাতে নিত্য কিছুই নাই, বরং উহা ক্রমাগত উত্তরোত্তর দুঃখ আনয়ন করে। আমার পথে অনন্ত শান্তি, তোমার পথে অনন্ত দুঃখ।

আমি বলি না যে, তুমি যাহাকে প্রকৃত কাজের পথ বলিতেছ, তাহা ভ্রম। তুমি নিজে যেরূপ বুঝিয়াছ, তাই কর। ইহাতে পরম মঙ্গল হইবে—লোকের মহৎ হিত হইবে—কিন্তু তা বলিয়া আমার পক্ষে দোষারোপ করিও না। আমার পথও আমার ভাবে আমার পক্ষে কার্য্যকর পথ। এস আমরা সকলে নিজ নিজ

প্রণালীতে কার্য্য করি। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি আমরা উভয় দিকেই একরূপ কাজের লোক হইতাম, তাহা হইলে বড় ভাল ছিল। আমি এমন অনেক বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছি, যাঁহারা বিজ্ঞান ও অধ্যাত্মতত্ত্ব উভয়দিকেই কাজের লোক—আর আমি আশা করি কালে সমুদয় মানবজাতি এই সকল বিষয়েই কাজের লোক হইবে। মনে কর, এক কড়া জল গরম হইতেছে—সে সময় কি হইতেছে তাহা যদি তুমি লক্ষ্য কর, তুমি দেখিবে এক কোণে একটি বুদ্বুদ উঠিতেছে, অপর কোণে আর একটি উঠিতেছে। এই বুদ্বুদগুলি ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে—চার-পাঁচটি একত্র হইল, অবশেষে সবগুলি একত্র হইয়া এক প্রবল গতি আরম্ভ হইল। এই জগৎও এইরূপ। প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন এক একটি বুদ্বুদ, আর বিভিন্ন জাতি যেন কতকগুলি বুদ্বুদ-সমষ্টিস্বরূপ। ক্রমশঃ জাতিতে জাতিতে সম্মিলন হইতেছে—আমার নিশ্চয় ধারণা, এমন এক দিন আসিবে, যখন জাতি বলিয়া কোন বস্তু থাকিবে না—জাতিতে জাতিতে প্রভেদ চলিয়া যাইবে। আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমরা যে একত্বের দিকে অগ্রসর হইতে চলিয়াছি, তাহা একদিন না একদিন প্রকাশিত হইবেই হইবে। বাস্তবিক আমাদের সকলের মধ্যে ভ্রাতৃসম্বন্ধ স্বাভাবিক—কিন্তু আমরা এক্ষণে সকলে পৃথক হইয়া পড়িয়াছি। এমন সময় অবশ্য আসিবে যখন এই সকল বিভিন্ন ভাব একত্র মিলিত হইবে—প্রত্যেক ব্যক্তিই বৈজ্ঞানিক বিষয়ে যেমন, আধ্যাত্মিক বিষয়েও তেমনি কাজের লোক হইবে—তখন সেই একত্ব, সেই সম্মিলন জগতে ব্যক্ত হইবে। তখন সমুদয় জগৎ জীবন্মুক্ত হইবে। আমাদের ঈর্ষ্যা, ঘৃণা, সম্মিলন

ও বিরোধের মধ্য দিয়া আমরা সেই একদিকে চলিতেছি। একটি প্রবল নদী সমুদ্রের দিকে চলিতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুক্‌রা, খড়কুটা প্রভৃতি উহাতে ভাসিতেছে। উহারা এদিকে ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু অবশেষে তাহাদিগকে অবশ্যই সমুদ্রে যাইতে হইবে। এইরূপ তুমি, আমি, এমন কি সমুদয় প্রকৃতিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজের টুক্‌রার ন্যায় সেই অনন্ত পূর্ণতার সাগর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হইতেছে—আমরাও এদিক ওদিক যাইবার জন্য চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু অবশেষে আমরাও সেই জীবন ও আনন্দের অনন্ত সমুদ্রে পহুছিব।

# সর্ব্ব বস্তুতে ব্রহ্মদর্শন

আমরা দেখিয়াছি, আমরা দুঃখনিবারণ করিতে যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের জীবনের অধিকাংশই অবশ্য দুঃখপূর্ণ থাকিবে। আর এই দুঃখরাশি বাস্তবিক আমাদের পক্ষে একরূপ অনন্ত। আমরা অনাদি কাল হইতে এই দুঃখ-প্রতিকারের চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু বাস্তবিক উহা যেমন তেমনই রহিয়াছে। আমরা যতই দুঃখ-প্রতিকারের উপায় বাহির করি, ততই দেখিতে পাই জগতের ভিতর আরও কত দুঃখ গুপ্তভাবে অবস্থান করিতেছে। আমরা আরও দেখিয়াছি, সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন এই দুঃখ-চক্রের বাহিরে যাইবার একমাত্র উপায় ঈশ্বর। সকল ধর্ম্মই বলিয়া থাকেন, আজকালকার প্রত্যক্ষবাদীদের মতানুযায়ী জগৎকে যেমন দেখা যাইতেছে তেমনি লইলে, ইহাতে দুঃখ ব্যতীত আর কিছু অবশিষ্ট থাকিবে না। কিন্তু সকল ধর্ম্মই বলেন—এই জগতের অতীত আরও কিছু আছে। এই পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জীবন, এই ভৌতিক জীবন, ইহাই কেবল পর্য্যাপ্ত নহে—উহা প্রকৃত জীবনের অতি সামান্য অংশ মাত্র, বাস্তবিক উহা অতি স্থূল ব্যাপার মাত্র। উহার পশ্চাতে, উহার অতীত প্রদেশে সেই অনন্ত রহিয়াছেন, যেখানে দুঃখের লেশমাত্রও নাই—উঁহাকে কেহ গড্, কেহ আল্লা, কেহ জিহোভা, কেহ জোভ্, কেহ বা আর কিছু বলিয়া থাকেন। বেদান্তীরা উঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া থাকেন। কিন্তু

জগতের অতীত প্রদেশে যাইতে হইবে, এ কথা সত্য হইলেও আমাদিগকে এই জগতে জীবনধারণ করিতে ত হইবে? এক্ষণে ইহার মীমাংসা কোথায়?

জগতের বাহিরে যাইতে হইবে, সকল ধর্ম্মের এই উপদেশে আপাততঃ এই ভাবই মনে উদিত হয় যে, আত্মহত্যা করাই বুঝি শ্রেয়ঃ। প্রশ্ন এই—এই জীবনের দুঃখরাশির প্রতিকার কি? আর তাহার যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহাতে আপাততঃ ইহাই বোধ হয় যে, জীবনটাকে ত্যাগ করাই ইহার একমাত্র প্রতিকার। এর উত্তরে আমাদের একটি প্রাচীন গল্পের কথা মনে উদিত হয়। একটা মশা একটি লোকের মাথায় বসিয়াছিল, তাহার এক বন্ধু ঐ মশাটাকে মারিতে গিয়া তাহার মস্তকে এমন তীব্র আঘাত করিল যে, সেই লোকটিও মারা গেল, মশাটিও মরিল। পূর্ব্বোক্ত প্রতিকারের উপায়ও যেন ঠিক সেইরূপ প্রণালীর উপদেশ দিতেছে।

জীবন যে দুঃখপূর্ণ, জগৎ যে দুঃখপূর্ণ, তাহা যে ব্যক্তি জগৎকে বিশেষরূপে জানিয়াছে, সে আর অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সকল ধর্ম্ম ইহার প্রতিকারের উপায় কি বলেন? তাঁহারা বলেন, জগৎ কিছুই নহে; এই জগতের বাহিরে এমন কিছু আছে যাহা প্রকৃত সত্য। এইখানেই বাস্তবিক বিবাদ। এই উপায়টিতে যেন আমাদের যাহা কিছু আছে, সমুদয় নষ্ট করিয়া ফেলিতে উপদেশ দিতেছে। তবে উহা কি করিয়া প্রতিকারের উপায় হইবে? তবে কি কোন উপায়ই নাই? প্রতিকারের আর একটি উপায় যাহা কথিত হইয়া থাকে তাহা এই—বেদান্ত বলেন, বিভিন্ন ধর্ম্মে যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু ঐ কথার ঠিক ঠিক তাৎপর্য্য

কি তাহা বুঝিতে হইবে। অনেক সময় লোকে বিভিন্ন ধর্ম্মসমূহের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীত বুঝিয়া থাকে, আর উহারাও ঐ বিষয়ে বড় স্পষ্ট করিয়া কিছু বলে না। আমাদের হৃদয় ও মস্তিষ্ক উভয়ই আবশ্যক। হৃদয় অবশ্য খুব শ্রেষ্ঠ—হৃদয়ের ভিতর দিয়া জীবনের উচ্চপথে পরিচালক মহান ভাবসমূহের স্ফুরণ হইয়া থাকে। হৃদয়শূন্য কেবল মস্তিষ্ক অপেক্ষা যদি আমার কিছুমাত্র মস্তিষ্ক না থাকে অথচ একটু হৃদয় থাকে, তাহা আমি শত শত বার পছন্দ করি। যাহার হৃদয় আছে তাহারই জীবন সম্ভব, তাহারই উন্নতি সম্ভব; কিন্তু যাহার কিছুমাত্র হৃদয় নাই, কিন্তু কেবল মস্তিষ্ক আছে, সে শুষ্কতায় মরিয়া যায়।

কিন্তু ইহাও আমরা জানি যে, যিনি কেবল নিজের হৃদয় দ্বারা পরিচালিত হন, তাঁহাকে অনেক অসুখ ভোগ করিতে হয়, কারণ তাঁহার প্রায়ই ভ্রমে পড়িবার সম্ভাবনা। আমরা চাই—হৃদয় ও মস্তিষ্কের সম্মিলন। আমার বলার ইহা তাৎপর্য্য নহে যে, খানিকটা হৃদয় ও খানিকটা মস্তিষ্ক লইয়া পরস্পর সামঞ্জস্য করি, কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিরই অনন্ত হৃদয় ও ভাব থাকুক এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত পরিমাণ বিচারবুদ্ধিও থাকুক।

এই জগতে আমরা যাহা কিছু চাই, তাহার কি কোন সীমা আছে? জগৎ কি অনন্ত নহে? জগতে অনন্তপরিমাণ ভাববিকাশের এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনন্তপরিমাণ শিক্ষা ও বিচারের অবকাশ আছে। উহারা উভয়েই অনন্তপরিমাণে আসুক—উহারা উভয়েই সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হইতে থাকুক।

অধিকাংশ ধর্ম্মই, জগতে যে দুঃখরাশি বিদ্যমান—এ ব্যাপারটি

বুঝেন এবং স্পষ্ট ভাষাতেই উহার উল্লেখ করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু সকলেই বোধ হয় একই ভ্রমে পড়িয়াছেন, তাঁহারা সকলেই হৃদয়ের দ্বারা, ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকেন। জগতে দুঃখ আছে, অতএব সংসারত্যাগ কর—ইহা খুব শ্রেষ্ঠ উপদেশ এবং একমাত্র উপদেশ, সংশয় নাই। 'সংসারত্যাগ কর।' সত্য জানিতে হইলে অসত্য ত্যাগ করিতে হইবে—ভাল পাইতে হইলে মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে, জীবন পাইতে হইলে মৃত্যু ত্যাগ করিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোন মতদ্বৈধ হইতে পারে না।

কিন্তু যদি এই মতবাদের ইহাই তাৎপর্য্য হয় যে, পঞ্চেন্দ্রিয়গত জীবন—আমরা যাহাকে জীবন বলিয়া জানি, আমরা জীবন বলিতে যাহা বুঝি তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে, তবে আর আমাদের থাকে কি? যদি আমরা উহা ত্যাগ করি, তবে আমাদের আর কিছুই থাকে না।

যখন আমরা বেদান্তের দার্শনিক অংশের আলোচনা করিব, তখন আমরা এই তত্ত্ব আরও উত্তমরূপে বুঝিব, কিন্তু আপাততঃ আমি কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, বেদান্তেই কেবল এই সমস্যার যুক্তিসঙ্গত মীমাংসা পাওয়া যায়। এখানে কেবল বেদান্তের প্রকৃত উপদেশ কি তাহাই বলিব—বেদান্ত শিক্ষা দেন জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন করিতে।

বেদান্ত প্রকৃতপক্ষে জগৎকে একেবারে উড়াইয়া দিতে চাহে না। বেদান্তে যেমন চূড়ান্ত বৈরাগ্যের উপদেশ আছে, আর কোথাও তদ্রূপ নাই, কিন্তু ঐ বৈরাগ্যের অর্থ আত্মহত্যা নহে—নিজেকে শুকাইয়া ফেলা নহে। বেদান্তে বৈরাগ্যের অর্থ জগতের

ব্রহ্মভাব—জগৎকে আমরা যেভাবে দেখি, উহাকে আমরা যেমন জানি, উহা যেরূপে প্রতিভাত হইতেছে তাহা ত্যাগ কর এবং উহার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হও। উহাকে ব্রহ্মস্বরূপে দেখ—বাস্তবিকও উহা ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে; এই কারণেই আমরা প্রাচীনতম উপনিষদে—বেদান্তসম্বন্ধে যাহা কিছু লেখা হইয়াছিল, তাহার প্রথম পুস্তকেই—আমরা দেখিতে পাই, 'ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ' (ঈশ-উঃ-১ম শ্লোক)। 'জগতে যাহা কিছু আছে তাহা ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে।'

সমুদয় জগৎকে ঈশ্বরের দ্বারা আচ্ছাদিত করিতে হইবে—জগতে যে অশুভ দুঃখ আছে তাহার দিকে না চাহিয়া, মিছামিছি সবই মঙ্গলময়, সবই সুখময়, বা সবই ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য, এরূপ ভ্রান্ত সুখবাদ অবলম্বন করিয়া নহে, কিন্তু বাস্তবিক প্রত্যেক বস্তুর অভ্যন্তরে ঈশ্বরদর্শন করিয়া। এইরূপে আমাদিগকে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে—আর যখন সংসারত্যাগ হয়, তখন অবশিষ্ট থাকে কি?—ঈশ্বর। এই উপদেশের তাৎপর্য্য কি? তাৎপর্য্য এই—তোমার স্ত্রী থাকুক, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই, তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই কিন্তু ঐ স্ত্রীর মধ্যে তোমার ঈশ্বরদর্শন করিতে হইবে। সন্তানসন্ততিকে ত্যাগ কর—ইহার অর্থ কি? ছেলেগুলিকে লইয়া কি রাস্তায় ফেলিয়া দিতে হইবে—যেমন সকল দেশে নর-পশুরা করিয়া থাকে? কখনই নহে; উহা তো পৈশাচিক কাণ্ড—উহা ত ধর্ম্ম নহে। তবে কি? সন্তানসন্ততিগণের মধ্যে ঈশ্বরদর্শন কর। এইরূপ

সকল বস্তুতেই, জীবনে-মরণে, সুখে-দুঃখে—সকল অবস্থাতেই সমুদয় জগৎ ঈশ্বরপূর্ণ। কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তাঁহাকে দর্শন কর। বেদান্ত ইহাই বলেন; তুমি জগৎকে যেরূপ অনুমান করিয়াছ তাহা ত্যাগ কর, কারণ তোমার অনুমান অতি অল্প অনুভূতির উপর—খুব সামান্য যুক্তির উপর—মোট কথা, তোমার নিজের দুর্ব্বলতার উপর স্থাপিত। ঐ আনুমানিক জ্ঞান ত্যাগ কর—আমরা এতদিন জগৎকে যেরূপ ভাবিতেছিলাম, এতদিন যে জগতে অতিশয় আসক্ত ছিলাম, তাহা আমাদের নিজেদের সৃষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র। উহা ত্যাগ কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ, আমরা যেরূপভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, প্রকৃতপক্ষে কখনই উহার অস্তিত্ব সেরূপ ছিল না—আমরা স্বপ্নে ঐরূপ দেখিতেছিলাম—মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের ঐরূপ ভ্রম হইতেছিল। অনন্তকাল ধরিয়া সেই প্রভুই একমাত্র বিদ্যমান ছিলেন? তিনিই সন্তানসন্ততির ভিতরে, তিনিই স্ত্রীর মধ্যে, তিনিই স্বামীতে, তিনিই ভালয়, তিনিই মন্দে, তিনিই পাপে, তিনিই পাপীতে, তিনিই হত্যাকারীতে, তিনিই জীবনে এবং তিনিই মরণে বর্ত্তমান।

বিষম প্রস্তাব বটে!

কিন্তু বেদান্ত ইহাই প্রমাণ করিতে, শিক্ষা দিতে ও প্রচার করিতে চান। এই বিষয় লইয়াই বেদান্তের আরম্ভ।

আমরা এইরূপে সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শন করিয়াই জীবনের বিপদ ও দুঃখরাশি এড়াইতে পারি। কিছু চাহিও না। আমাদিগকে অসুখী করে কিসে? আমরা যে-কোন দুঃখভোগ করিয়া থাকি,

বাসনা হইতেই তাহার উৎপত্তি। তোমার কিছু অভাব আছে, আর সেই অভাব পূর্ণ হইতেছে না, ফল—দুঃখ। অভাব যদি না থাকে তবে দুঃখও থাকিবে না। যখন আমরা সকল বাসনা ত্যাগ করিব, তখন কি হইবে? দেয়ালেরও কোন বাসনা নাই, উহা কখন দুঃখ ভোগ করে না। সত্য, কিন্তু উহা কোনরূপ উন্নতিও করে না। এই চেয়ারের কোন বাসনা নাই, উহার কোন কষ্টও নাই, কিন্তু উহা যে চেয়ার, সেই চেয়ারই থাকে। সুখভোগের ভিতরেও এক মহান ভাব আছে, দুঃখভোগের ভিতরেও তাহা আছে। যদি সাহস করিয়া বলা যায়, তাহা হইলে ইহাও বলিতে পারি যে, দুঃখের উপকারিতাও আছে। আমরা সকলেই জানি, দুঃখ হইতে কি মহতী শিক্ষা। শত শত কার্য্য আমরা জীবনে করিয়াছি, যাহা পরে বোধ হয়, না করিলেই ভাল ছিল, কিন্তু তাহা হইতেও ঐ সকল কার্য্য আমাদের মহান শিক্ষকের কার্য্য করিয়াছে। আমি নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি, আমি কিছু ভাল করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত, আবার অনেক খারাপ কাজ করিয়াছি বলিয়াও আনন্দিত —আমি কিছু সৎকার্য্য করিয়াছি বলিয়াও সুখী, আবার অনেক ভ্রমে পড়িয়াছি বলিয়াও সুখী, কারণ উহাদের প্রত্যেকটিই আমাকে এক এক উচ্চ শিক্ষা দিয়াছে।

আমি এক্ষণে যাহা, তাহা আমার পূর্ব্ব কর্ম্ম ও চিন্তাসমষ্টির ফলস্বরূপ। প্রত্যেক কার্য্য ও চিন্তারই একটি না একটি ফল আছে, আর আমি মোট এইটুকু উন্নতি করিয়াছি যে, আমি বেশ সুখে কাল কাটাইতেছি। তবেই এক্ষণে সমস্যা কঠিন হইয়া পড়িল। আমরা সকলেই বুঝি বাসনা বড় খারাপ জিনিস, কিন্তু বাসনা

ত্যাগের অর্থ কি? দেহযাত্রানির্ব্বাহ হইবে কিরূপে? ইহার উত্তরও ঐ পূর্ব্বকার মত আপাততঃ পাওয়া যাইবে—আত্মহত্যা কর। বাসনাকে সংহার কর, তাহার সঙ্গে বাসনাযুক্ত মানুষটাকেও মারিয়া ফেল। কিন্তু ইহার উত্তর এই—তুমি যে বিষয় রাখিবে না, তাহা নহে; আবশ্যক জিনিস, এমন কি, বিলাসের জিনিস পর্য্যন্ত রাখিবে না, তাহা নহে। যাহা কিছু তোমার আবশ্যক, এমন কি, তদতিরিক্ত জিনিস পর্য্যন্ত তুমি রাখিতে পার—তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। কিন্তু তোমার প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য এই যে, তোমার সত্যকে জানিতে হইবে, ইহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। এই ধন—ইহা কাহারও নয়। কোন পদার্থে স্বামিত্বের ভাব রাখিও না। তুমি ত কেহ নও, আমিও কেহ নহি, কেহই কেহ নহে। সবই সেই প্রভুর বস্তু; ঈশ উপনিষদে প্রথম শ্লোকেই সর্ব্বত্রই ঈশ্বরকে স্থাপন করিতে বলিতেছেন। ঈশ্বর তোমার ভোগ্য ধনে রহিয়াছেন, তোমার মনে যে-সকল বাসনা উঠিতেছে তাহাতে রহিয়াছেন, তোমার বাসনা থাকাতে তুমি যে যে দ্রব্য ক্রয় করিতেছ তাহার মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর বস্ত্রের মধ্যেও তিনি, তোমার সুন্দর অলঙ্কারেও তিনি। এইরূপে চিন্তা করিতে হইবে। এইরূপে সকল জিনিস দেখিতে আরম্ভ করিলে, তোমার দৃষ্টিতে সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইবে। যদি তুমি তোমার প্রতি গতিতে, তোমার বস্ত্রে, তোমার কথাবার্ত্তায়, তোমার শরীরে, তোমার চেহারায়—সকল জিনিসে ভগবানকে স্থাপন কর, তবে তোমার চক্ষে সমুদয় দৃশ্য বদলাইয়া যাইবে

এবং জগৎ দুঃখময়রূপে প্রতিভাত না হইয়া স্বর্গরূপে পরিণত হইবে।

'স্বর্গরাজ্য তোমার ভিতরে'—বেদান্ত বলেন, উহা পূর্ব্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে অবস্থিত। আর সকল ধর্ম্মেও এই কথা বলিয়া থাকে, সকল মহাপুরুষই ইহা বলিয়া থাকেন। 'যাহার দেখিবার চক্ষু আছে, সে দেখুক। যাহার শুনিবার কর্ণ আছে, সে শুনুক।' উহা পূর্ব্ব হইতেই তোমার অভ্যন্তরে বর্ত্তমান আর বেদান্ত শুধু যে উহার উল্লেখমাত্র করেন তাহা নহে, ইহা যুক্তিবলে প্রমাণ করিতেও প্রস্তুত। অজ্ঞানবশতঃ আমরা মনে করিয়াছিলাম আমরা উহা হারাইয়াছি, আর সমুদয় জগতে উহা পাইবার জন্য কেবল কাঁদিয়া কষ্ট ভুগিয়া বেড়াইয়াছিলাম, কিন্তু উহা সর্ব্বদাই আমাদের নিজেদের অন্তরের অন্তস্তলে বর্ত্তমান ছিল। এই তত্ত্বদৃষ্টির সহায়তা লইয়া জগতে জীবনযাপন করিতে হইবে।

যদি 'সংসার ত্যাগ কর' এই উপদেশ সত্য হয়, আর যদি উহা উহার প্রাচীন স্থূল অর্থে গ্রহণ করা যায়, তবে দাঁড়ায় এই—আমাদের কোন কাজ করিবার আবশ্যকতা নাই, অলস হইয়া মাটির ঢিপির মত বসিয়া থাকিলেই হইল, কিছু চিন্তা করিবার বা কোন কাজ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই; অদৃষ্টবাদী হইয়া, ঘটনাচক্রে তাড়িত হইয়া, প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা পরিচালিত হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিলেই হইল। ইহাই ফল দাঁড়াইবে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত উপদেশের অর্থ বাস্তবিকই তাহা নহে। আমাদিগকে কার্য্য অবশ্য করিতে হইবে। সাধারণ মানবগণ, যাহারা বৃথা বাসনায় ইতস্ততঃ পরিভ্রাম্যমাণ, তাহারা কার্য্যের কি জানে? যে ব্যক্তি

নিজের ভাবরাশি ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা পরিচালিত, সে কার্য্যের কি বুঝে? সে-ই কাজ করিতে পারে, যে কোনরূপ বাসনা দ্বারা, কোনরূপ স্বার্থপরতা দ্বারা পরিচালিত নহে। তিনিই কার্য্য করিতে পারেন, যাঁহার অন্য কোন কামনা নাই। তিনিই কাজ করিতে পারেন, যাঁহার কার্য্য হইতে কোন লাভের প্রত্যাশা নাই।

একখানি চিত্র কে অধিক সম্ভোগ করে? চিত্র-বিক্রেতা, না চিত্রদ্রষ্টা? বিক্রেতা তাহার হিসাব-কিতাব লইয়াই ব্যস্ত, তাহার কত লাভ হইবে ইত্যাদি চিন্তাতেই সে মগ্ন। ঐ সকল বিষয়ই কেবল তাহার মাথায় ঘুরিতেছে। সে কেবল নিলামের হাতুড়ির দিকে লক্ষ্য করিতেছে ও দর কত চড়িল তাহা শুনিতেছে। দর কিরূপ তাড়াতাড়ি উঠিতেছে, তাহা শুনিতেই সে ব্যস্ত। চিত্র দেখিয়া সে আনন্দ উপভোগ করিবে কখন? তিনিই চিত্র-সম্ভোগ করিতে পারেন, যাহার কোন বেচা-কেনার মতলব নাই। তিনি ছবিখানির দিকে চাহিয়া থাকেন, আর অতুল আনন্দ উপভোগ করেন। এইরূপ সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই একটি চিত্রস্বরূপ; যখন বাসনা একেবারে চলিয়া যাইবে, তখনই লোকে জগৎকে সম্ভোগ করিবে, তখন আর এই কেনা-বেচার ভাব, এই ভ্রমাত্মক স্বামিত্ব-ভাব থাকিবে না। তখন কর্জ্জদাতা নাই, ক্রেতা নাই, বিক্রেতাও নাই, জগৎ তখন একখানি সুন্দর ছবিস্বরূপ। ঈশ্বরসম্বন্ধে নিম্নোক্ত কথার মত সুন্দর কথা আমি আর কোথাও পাই নাই—'সে-ই মহৎ কবি, প্রাচীন কবি—সমুদয় জগৎ তাঁহার কবিতা, উহা অনন্ত আনন্দোচ্ছ্বাসে লিখিত, আর নানা শ্লোকে, নানা ছন্দে, নানা তালে প্রকাশিত।' বাসনাত্যাগ হইলেই আমরা ঈশ্বরের এই

বিশ্ব-কবিতা পাঠ ও সম্ভোগ করিতে পারিব। তখন সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। আড়াল-আবডাল, আনাচ-কানাচ, সকল গুপ্ত অন্ধকারময় স্থান যাহা আমরা পূর্ব্বে এত অপবিত্র ভাবিয়াছিলাম, উহাদের উপর যে-সকল দাগ এত কৃষ্ণবর্ণ বোধ হইয়াছিল, সবই ব্রহ্মভাব ধারণ করিবে। তাহারা সকলেই তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করিবে। তখন আমরা আপনা আপনি হাসিব আর ভাবিব, এই সকল কান্না-চীৎকার কেবল ছেলে-খেলা মাত্র, আর আমরা জননীস্বরূপে বরাবর দাঁড়াইয়া ঐ খেলা দেখিতেছিলাম।

বেদান্ত বলেন, এইরূপ ভাব আশ্রয় করিলেই আমরা ঠিক ঠিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইব। বেদান্ত আমাদিগকে কার্য্য করিতে নিষেধ করেন না, তবে ইহাও বলেন যে, প্রথমে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, এই আপাতপ্রতীয়মান মায়ার জগৎ ত্যাগ করিতে হইবে। এই ত্যাগের অর্থ কি? পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ত্যাগের প্রকৃত তাৎপর্য্য—সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন। সর্ব্বত্র ঈশ্বরবুদ্ধি করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে। যদি ইচ্ছা হয়, শতবর্ষ বাঁচিবার ইচ্ছা কর, যত কিছু সাংসারিক বাসনা আছে ভোগ করিয়া লও, কেবল উহাদিগকে ব্রহ্মস্বরূপে দর্শন কর, উহাদিগকে স্বর্গীয় ভাবে পরিণত করিয়া লও, তারপর শতবর্ষ জীবনধারণ কর। এই জগতে দীর্ঘকাল আনন্দে পূর্ণ হইয়া কার্য্য করিয়া জীবনসম্ভোগ করিবার ইচ্ছা কর। এইরূপে কার্য্য করিলে তুমি প্রকৃত পথ পাইবে। ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই। যে ব্যক্তি সত্য না জানিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় সংসারের

বিলাস-বিভ্রমে নিমগ্ন হয়, বুঝিতে হইবে সে প্রকৃত পথ পায় নাই, তাহার পা পিছলাইয়া গিয়াছে। অপরদিকে যে ব্যক্তি জগৎকে অভিসম্পাত করিয়া বনে গিয়া নিজের শরীরকে কষ্ট দিতে থাকে, ধীরে ধীরে শুকাইয়া আপনাকে মারিয়া ফেলে, নিজের হৃদয় একটি শুষ্ক মরুভূমি করিয়া ফেলে, নিজের সকল ভাব মারিয়া ফেলে, কঠোর, বীভৎস, শুষ্ক হইয়া যায়, সেও পথ ভুলিয়াছে বুঝিতে হইবে। এই দুইটিই বাড়াবাড়ি—দুইটিই ভ্রম—এদিক আর ওদিক। উভয়েই লক্ষ্যভ্রষ্ট—উভয়েই পথভ্রষ্ট।

বেদান্ত বলেন, এইরূপে কার্য্য কর—সকল বস্তুতে ঈশ্বরবুদ্ধি কর, সকলেতেই তিনি আছেন জান, আপনার জীবনকেও ঈশ্বরানুপ্রাণিত, এমন কি, ঈশ্বরস্বরূপ চিন্তা কর—জানিয়া রাখ, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য, ইহাই কেবল আমাদের একমাত্র জিজ্ঞাস্য—কারণ ঈশ্বর সকল বস্তুতেই বিদ্যমান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য আবার কোথায় যাইবে? প্রত্যেক কার্য্যে, প্রত্যেক চিন্তায়, প্রত্যেক ভাবে তিনি পূর্ব্ব হইতেই অবস্থিত। এইরূপ জানিয়া অবশ্য আমাদিগকে কার্য্য করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই একমাত্র পথ—আর কোন পথ নাই। এইরূপ করিলে কর্ম্মফল তোমাকে লিপ্ত করিতে পারিবে না। কর্ম্মফল আর তোমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমরা দেখিয়াছি, আমরা যত কিছু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি, তাহার কারণ এই সকল বৃথা বাসনা। কিন্তু যখন এই বাসনাগুলিতে ঈশ্বরবুদ্ধি দ্বারা উহারা পবিত্র ভাব ধারণ করে, ঈশ্বরস্বরূপ হইয়া যায়, তখন উহারা আসিলেও তাহাতে আর কোন অনিষ্ট হয় না। যাহারা এই রহস্য

না জানিয়াছে, ইহা না জানা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এই আসুরিক জগতে বাস করিতে হইবে। লোকে জানে না, এখানে তাহাদের চতুর্দ্দিকে সর্ব্বত্র কি অনন্ত আনন্দের খনি রহিয়াছে, কিন্তু তাহারা তাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই। আসুরিক জগতের অর্থ কি? বেদান্ত বলেন—অজ্ঞান।

বেদান্ত বলেন, আমরা অনন্তসলিলপূর্ণ তটিনীর তীরে বসিয়া তৃষ্ণায় মরিতেছি। রাশীকৃত খাদ্যের সম্মুখে বসিয়া আমরা ক্ষুধায় মরিতেছি। এইখানেই আনন্দময় জগৎ রহিয়াছে। আমরা উহা খুঁজিয়া পাইতেছি না। আমরা উহার মধ্যে রহিয়াছি। উহা সর্ব্বদাই আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে কিন্তু আমরা সর্ব্বদাই উহাকে অন্য কিছু বলিয়া ভ্রমে পড়িতেছি। বিভিন্ন ধর্ম্মসকল আমাদের নিকট সেই আনন্দময় জগৎ দেখাইয়া দিতে অগ্রসর। সকল হৃদয়ই এই আনন্দময় জগতের অন্বেষণ করিয়াছে। সকল জাতিই ইহার অন্বেষণ করিয়াছে, ধর্ম্মের ইহাই একমাত্র লক্ষ্য, আর এই আদর্শই বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে; বিভিন্ন ধর্ম্মসকলের মধ্যে যেসকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ, তাহা কেবল কথার মারপেঁচমাত্র, বাস্তবিক কিছুই নয়। একজন একটি ভাব একরূপে প্রকাশ করিতেছে, আর একজন একটু অন্যভাবে প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু আমি যাহা বলিতেছি, তুমি হয়ত অন্য ভাষায় ঠিক তাহাই বলিতেছ। তথাপি আমি হয়ত একাকী সুখ্যাতিলাভের আশায় অথবা আমার নিজের মনের মত চলিতে ভালবাসি বলিয়া, বলিয়া থাকি, 'এ আমার মৌলিক মত।' ইহা হইতেই আমাদের জীবনে পরস্পর ঈর্ষ্যাদ্বেষাদির উৎপত্তি।

এসম্বন্ধে আবার এক্ষণে নানা তর্ক উঠিতেছে। যাহা বলা হইল, তাহা মুখে বলা ত খুব সহজ। ছেলেবেলা হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—সর্ব্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি কর—সব ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে—তখন সমুদয় বিষয় প্রকৃতরূপে সম্ভোগ করিতে পারিবে, কিন্তু যখনই আমি সংসারক্ষেত্রে নামিয়া গুটিকতক ধাক্কা খাই, অমনি আমার ব্রহ্মবুদ্ধি সব উড়িয়া যায়। আমি রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে চলিয়াছি, সকল মানুষেই ঈশ্বর বিরাজমান—একজন বলবান লোক আসিয়া আমায় ধাক্কা দিল, অমনি চিৎপাত হইয়া পড়িলাম। ঝাঁ করিয়া উঠিলাম, রক্ত মাথায় চড়িয়া গেল—মুষ্টি বদ্ধ হইল—বিচারশক্তি হারাইলাম, একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিলাম, স্মৃতিভ্রংশ হইল—সেই ব্যক্তির ভিতর ঈশ্বর না দেখিয়া আমি ভূত দেখিলাম। জন্মিবামাত্রই উপদেশ পাইতেছি, সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন কর। সকল ধর্ম্মই ইহা শিখাইয়াছে—সর্ব্ববস্তুতে, সর্ব্বপ্রাণীর অভ্যন্তরে, সর্ব্বত্র ঈশ্বরদর্শন কর। নিউ টেষ্টামেণ্টে যীশুখ্রীষ্টও এ বিষয়ে স্পষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। সকলেই আমরা এই উপদেশ পাইয়াছি—কিন্তু কাজের বেলায়ই আমাদের গোল আরম্ভ হয়। ঈসপ্স রচিত আখ্যানাবলীর ভিতর একটি গল্প আছে। এক বৃহৎকায় সুন্দর হরিণ হ্রদে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া তাহার শাবককে বলিতেছিল, "দেখ, আমি কেমন বলবান, আমার মস্তক অবলোকন কর—উহা কেমন চমৎকার, আমার হস্তপদ অবলোকন কর, উহারা কেমন দৃঢ় ও মাংসল, আমি কত শীঘ্র দৌড়াইতে পারি!" সে এ কথা বলিতেছিল, এমন সময়ে দূর হইতে কুকুরের ডাক শুনিতে পাইল। যাই শুনা, অমনি দ্রুতপদে পলায়ন। অনেক

দূরে দৌড়িয়া গিয়া আবার হাঁপাইতে হাঁপাইতে শাবকের নিকট ফিরিয়া আসিল। হরিণশাবক বলিল, "এইমাত্র তুমি বলিতেছিলে, তুমি খুব বলবান—তবে কুকুরের ডাকে পালাইলে কেন?" হরিণ উত্তরে বলিল, "তাই ত, তাই ত, কুকুর ডাকিলেই আমার আর কিছু জ্ঞান থাকে না।" আমরাও সারাজীবন তাই করিতেছি। আমরা দুর্ব্বল মনুষ্যজাতি-সম্বন্ধে কত উচ্চ আশা পোষণ করিতেছি, কিন্তু কুকুর ডাকিলেই হরিণের মত পলাইয়া যাই। তাই যদি হইল, তবে এসকল শিক্ষা দিবার কি আবশ্যকতা? বিশেষ আবশ্যকতা আছে। বুঝিয়া রাখা উচিত, একদিনে কিছু হয় না।

'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।' আত্মাসম্বন্ধে প্রথমে শুনিতে হইবে, পরে মনন অর্থাৎ চিন্তা করিতে হইবে, তৎপরে ক্রমাগত ধ্যান করিতে হইবে। সকলেই আকাশ দেখিতে পায়, এমন কি, যে সামান্য কীট ভূমিতে বিচরণ করে সেও উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে নীলবর্ণ আকাশ দেখিতে পায়, কিন্তু উহা আমাদের নিকট হইতে কত—কত দূরে রহিয়াছে —বল দেখি! ইচ্ছা করিলে ত মন সর্ব্বস্থানে গমন করিতে পারে, কিন্তু এই শরীরের পক্ষে হামাগুড়ি দিয়া চলিতে শিখিতেই কত সময় অতিবাহিত হয়! আমাদের সমুদয় আদর্শসম্বন্ধেও এইরূপ। আদর্শসকল আমাদের অনেক দূরে রহিয়াছে, আর আমরা উহা হইতে কত নীচে পড়িয়া রহিয়াছি। তথাপি আমরা জানি, আমাদের একটি আদর্শ থাকা আবশ্যক। শুধু তাহাই নহে, আমাদের সর্ব্বোচ্চ আদর্শ থাকাই আবশ্যক। অধিকাংশ

ব্যক্তি এই জগতে কোনরূপ আদর্শ না লইয়াই জীবনের এই অন্ধকারময় পথে হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে। যাহার একটি নির্দ্দিষ্ট আদর্শ আছে, সে যদি সহস্রটি ভ্রমে পতিত হয়, যাহার কোনরূপ আদর্শ নাই, সে দশ সহস্র ভ্রমে পতিত হইবে, ইহা নিশ্চয়। অতএব একটি আদর্শ থাকা ভাল। এই আদর্শ-সম্বন্ধে যত পারি শুনিতে হইবে; ততদিন শুনিতে হইবে—যতদিন না উহা আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে, আমাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ করে, যতদিন না আমাদের রক্তের ভিতর প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের প্রতি শোণিতবিন্দুতে প্রবেশ করে, যতদিন না উহা আমাদের শরীরের অণুতে পরমাণুতে ব্যাপ্ত হইয়া যায়। অতএব আমাদিগকে প্রথমে এই আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। কথিত আছে যে, 'হৃদয় ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইলেই মুখ বাক্য উচ্চারণ করে', তদ্রূপ হৃদয় পূর্ণ হইলে হস্তও কার্য্য করিয়া থাকে।

চিন্তাই আমাদের কার্য্যপ্রবৃত্তির নিয়ামক। মনকে সর্ব্বোচ্চ চিন্তা দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখ, দিনের পর দিন ঐসকল ভাব শুনিতে থাক, মাসের পর মাস উহা চিন্তা করিতে থাক। প্রথম প্রথম সফল না হও—ক্ষতি নাই; এই বিফলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা মানবজীবনের সৌন্দর্য্যস্বরূপ। এরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থকিত, তবে জীবনধারণ করিবার কিছু প্রয়োজনীয়তা থাকিত না। উহা না থাকিলে জীবনের কবিত্ব কোথায় থাকিত? এই বিফলতা, এই ভ্রম থাকিলই বা; গরুকে কখনও মিথ্যা কথা কহিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, মানুষ

কখনই হয় না। অতএব বার বার অকৃতকার্য্য হও—কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, সহস্র সহস্র বার ঐ আদর্শকে হৃদয়ে ধারণ কর; আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শনই মানুষের আদর্শ। যদি সকল বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে কৃতকার্য্য না হও, অন্ততঃ যাহাকে তুমি সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাস এমন এক ব্যক্তিতে তাঁহাকে দর্শন করিবার চেষ্টা কর—তারপর তাঁহাকে আর এক ব্যক্তিতে দর্শনের চেষ্টা কর—এইরূপে তুমি অগ্রসর হইতে পার। আত্মার সম্মুখে ত অনন্ত জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে—অধ্যবসায়সম্পন্ন হইয়া চেষ্টা করিলে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।

অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ।
তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥
তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥
যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে ॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ।
তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ ॥

—ঈশোপনিষৎ, ৪-৭

“তিনি অচল, এক, মনের অপেক্ষাও দ্রুতগামী। ইন্দ্রিয়গণ পূর্ব্বে গমন করিয়াও তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি স্থির থাকিয়াও অন্যান্য দ্রুতগামী পদার্থের অগ্রবর্ত্তী। তাঁহাতে থাকিয়াই হিরণ্যগর্ভ সকলের কর্ম্মফল বিধান করিতেছেন। তিনি চঞ্চল, তিনি স্থির,

তিনি দূরে, তিনি নিকটে, তিনি এইসকলের ভিতর, আবার তিনি এইসকলের বাহিরে। যিনি আত্মার মধ্যে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন, আবার সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছু গোপন করিবার ইচ্ছা করেন না। যে অবস্থায় জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সমুদয় ভূত আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, সেই একত্বদর্শী পুরুষদের সেই অবস্থায় শোক বা মোহের বিষয় কি থাকে?"

এই সর্ব্ব পদার্থের একত্ব বেদান্তের আর একটি প্রধান বিষয়। আমরা পরে দেখিব, বেদান্ত কিরূপে প্রমাণ করেন যে আমাদের সমুদয় দুঃখ অজ্ঞানপ্রভব, ঐ অজ্ঞান আর কিছুই নয়—এই বহুত্বের ধারণা—এই ধারণা যে মানুষে মানুষে ভিন্ন, নরনারী ভিন্ন, যুবা ও শিশু ভিন্ন, জাতি জাতি হইতে পৃথক, পৃথিবী চন্দ্র হইতে পৃথক, চন্দ্র সূর্য্য হইতে পৃথক, একটি পরমাণু আর একটি পরমাণু হইতে পৃথক, এই জ্ঞানই বাস্তবিক সকল দুঃখের কারণ। বেদান্ত বলেন, এই প্রভেদ বাস্তবিক নাই। এই প্রভেদ বাস্তবিকই প্রাতিভাসিক, উপরে উপরে দেখা যায় মাত্র। বস্তুর অন্তস্তলে সেই একত্ব বিরাজমান। যদি তুমি ভিতরে চলিয়া যাও, তুমি এই একত্ব দেখিতে পাইবে—মানুষে মানুষে একত্ব, নরনারীতে একত্ব, জাতিতে জাতিতে একত্ব, উচ্চ-নীচে একত্ব, ধনি-দরিদ্রে একত্ব, দেবতা-মনুষ্যে একত্ব, সকলেই এক; আর যদি আরও অভ্যন্তরে প্রবেশ কর—দেখিবে ইতর প্রাণীরাও তাহাই। যিনি এইরূপ একত্বদর্শী হইয়াছেন, তাঁহার আর মোহ থাকে না। তিনি তখন সেই একত্বে পঁহুছিয়াছেন, ধর্ম্মবিজ্ঞানে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে। তাঁহার আর মোহ কিরূপে থাকিবে? কিসে তাঁহার মোহ

জন্মাইতে পারে? তিনি সকল বস্তুর আভ্যন্তরিক সত্য জানিয়াছেন, সকল বস্তুর রহস্য জানিয়াছেন। তাঁহার পক্ষে আর দুঃখ কিরূপে থাকিবে? তিনি আর কি বাসনা করিবেন? তিনি সকল বস্তুর মধ্যে প্রকৃত সত্য অন্বেষণ করিয়া ঈশ্বরে পঁহুছিয়াছেন—যিনি জগতের কেন্দ্রস্বরূপ, যিনি সকল বস্তুর একত্বস্বরূপ; উহাই অনন্ত সত্তা, অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত আনন্দ—যেখানে মৃত্যু নাই, রোগ নাই, দুঃখ নাই, শোক নাই, অশান্তি নাই, আছে কেবল পূর্ণ একত্ব—পূর্ণ আনন্দ। তখন তিনি কাহার জন্য শোক করিবেন? বাস্তবিক সেই কেন্দ্রে, সেই পরম সত্যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু নাই, দুঃখ নাই, কাহারও জন্য শোক করিবার নাই, কাহারও জন্য দুঃখ করিবার নাই।

স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়মব্রণমস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্।
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূর্যাথাতথ্যতোঽর্থান্
ব্যদধাচ্ছাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ॥ —ঈশ-উপ, ৮

"তিনি চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া আছেন, তিনি উজ্জ্বল, দেহশূন্য, ব্রণশূন্য, স্নায়ুশূন্য, পবিত্র ও নিষ্পাপ; তিনি কবি, মনের নিয়ন্তা, সকলের শ্রেষ্ঠ ও স্বয়ম্ভূ; তিনি চিরকালের জন্য যথাযোগ্যরূপে সকলের কাম্যবস্তু বিধান করিতেছেন।" যাহারা এই অবিদ্যাময় জগতের উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। যাহারা এই জগৎকে ব্রহ্মের ন্যায় সত্যজ্ঞান করিয়া উহার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু যাহারা চিরজীবন এই সংসারের উপাসনা করিয়া উহা হইতে উচ্চতর আর কিছুই লাভ করিতে পারে না, তাহারা আরও গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ

করে। কিন্তু যিনি এই পরমসুন্দর প্রকৃতির রহস্য জ্ঞাত হইয়াছেন, যিনি প্রকৃতির সাহায্যে দৈবী প্রকৃতির চিন্তা করেন, তিনি মৃত্যু অতিক্রম করেন এবং দৈবী প্রকৃতির সাহায্যে অমৃতত্ব সম্ভোগ করেন।

> হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
> তত্ত্বং পূষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে ॥
>
> * * *
>
> তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
> যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।
>
> —ঈশ-উপ, ১৫।১৬

"হে সূর্য্য, হিরণ্ময় পাত্র দ্বারা তুমি সত্যের মুখ আবৃত করিয়াছ। সত্যধর্ম্মা আমি যাহাতে তাহা দেখিতে পারি, এইজন্য তাহা অপসারিত কর। ··· আমি তোমার পরমরমণীয় রূপ দেখিতেছি —তোমার মধ্যে ঐ যে পুরুষ রহিয়াছেন, তাহা আমিই।"

# অপরোক্ষানুভূতি

আমি তোমাদিগকে আর একখানি উপনিষদ্ হইতে পাঠ করিয়া শুনাইব। ইহা অতি সরল অথচ অতিশয় কবিত্বপূর্ণ। ইহার নাম কঠোপনিষদ্। তোমাদের অনেকে বোধ হয় সার এড্উইন আর্ণল্ড-কৃত ইহার অনুবাদ পাঠ করিয়াছ। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি জগতের সৃষ্টি কোথা হইতে হইল। এই প্রশ্নের উত্তর বহির্জগৎ হইতে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং এই প্রশ্নের উত্তর মীমাংসার জন্য লোকের দৃষ্টি অন্তর্জগতে প্রধাবিত হইল। কঠোপনিষদে এই মানুষের স্বরূপ-সম্বন্ধে অনুসন্ধান আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে প্রশ্ন হইতেছিল—কে এই বাহ্যজগৎ সৃষ্টি করিল, ইহার উৎপত্তি কি করিয়া হইল? ইত্যাদি, কিন্তু এক্ষণে এই প্রশ্ন আসিল—মানুষের ভিতর এমন কি বস্তু আছে যাহা তাহাকে জীবিত রাখিয়াছে, যাহা তাহাকে চালাইতেছে এবং মৃত্যুর পরই বা মানুষের কি হয়? পূর্ব্বে লোকে এই জড়জগৎ লইয়া ক্রমশঃ ইহার অন্তরালে যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল এবং তাহাতে পাইয়াছিল খুব জোর জগতের একজন শাসনকর্ত্তা—একজন ব্যক্তি—একজন মনুষ্যমাত্র; হইতে পারে—মানুষের গুণরাশি অনন্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহাতে আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি একটি মনুষ্যমাত্র। এই মীমাংসা কখনই পূর্ণ সত্য হইতে পারে না। খুব জোর আংশিক

সত্য বলিতে পার। আমরা মনুষ্যদৃষ্টিতে এই জগৎ দেখিতেছি, আর আমাদের ঈশ্বর এই জগতের মানবীয় ব্যাখ্যামাত্র।

মনে কর, একটি গরু যেন দার্শনিক ও ধর্ম্মজ্ঞ হইল—সে জগৎকে তাহার গরুর দৃষ্টিতে দেখিবে, সে এই সমস্যার মীমাংসা করিতে গিয়া গরুর ভাবে ইহার মীমাংসা করিবে; সে যে আমাদের ঈশ্বরকেই দেখিবে, তাহা না-ও হইতে পারে। বিড়ালেরা যদি দার্শনিক হয়, তাহারা বিড়াল-জগৎ দেখিবে, তাহারা সিদ্ধান্ত করিবে, কোন বিড়াল এই জগৎ শাসন করিতেছে। অতএব আমরা দেখিতেছি, জগৎ-সম্বন্ধে আমাদের ব্যাখ্যা পূর্ণব্যাখ্যা নহে, আর আমাদের ধারণাও জগতের সর্ব্বাংশস্পর্শী নহে। মানুষ যে-ভাবে জগৎসম্বন্ধে ভয়ানক স্বার্থপর মীমাংসা করে, তাহা গ্রহণ করিলে ভ্রমে পতিত হইতে হয়। বাহ্যজগৎ হইতে জগৎসম্বন্ধে যে মীমাংসা লব্ধ হয় তাহার দোষ এই যে, আমরা যে জগৎ দেখি তাহা আমাদের নিজেদের জগৎমাত্র, সত্যসম্বন্ধে আমাদের যতটুকু দৃষ্টি ততটুকু। প্রকৃত সত্য—সেই পরমার্থ বস্তু কখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না, কিন্তু আমরা জগৎকে ততটুকুই জানি যতটুকু পঞ্চেন্দ্রিয়বিশিষ্ট প্রাণীর দৃষ্টিতে পড়ে। মনে কর, আমাদের আর একটি ইন্দ্রিয় হইল—তাহা হইলে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড আমাদের দৃষ্টিতে অবশ্যই আর এক রূপ ধারণ করিবে। মনে কর, আমাদের একটি চৌম্বক ইন্দ্রিয় হইল, জগতে হয়ত এমন লক্ষ লক্ষ শক্তি আছে, যাহা উপলব্ধি করিবার আমাদের কোন ইন্দ্রিয় নাই—তখন সেইগুলির উপলব্ধি হইতে লাগিল। আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি সীমাবদ্ধ—বাস্তবিক অতি সীমাবদ্ধ—আর ঐ সীমার মধ্যেই

আমাদের সমুদয় জগৎ অবস্থিত, এবং আমাদের ঈশ্বর আমাদের এই ক্ষুদ্র জগৎসমস্যার মীমাংসামাত্র। কিন্তু তাহা কখন সমুদয় সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না। ইহা ত অসম্ভব ব্যাপার। যথার্থ বলিতে গেলে, উহা কোন মীমাংসাই নহে। কিন্তু মানুষ ত চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। মানুষ চিন্তাশীল প্রাণী—সে এমন এক মীমাংসা করিতে চায়, যাহাতে জগতের, সকল সমস্যার মীমাংসা হইয়া যাইবে।

প্রথমে এমন এক জগৎ আবিষ্কার কর, এমন এক পদার্থ আবিষ্কার কর, যাহা সকল জগতের এক সাধারণ তত্ত্বস্বরূপ—যাহাকে আমরা ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারি বা না পারি, কিন্তু যাহাকে যুক্তিবলে সকল জগতের ভিত্তিভূমি, সকল জগতের ভিতরে মণিগণমধ্যস্থ সূত্রস্বরূপ বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে। যদি আমরা এমন এক পদার্থ আবিষ্কার করিতে পারি, যাহাকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে না পারিলেও কেবল অকাট্য যুক্তিবলে ঊর্দ্ধ অধঃ মধ্যে সর্ব্বপ্রকার লোকের সাধারণ অধিকার, সর্ব্বপ্রকার অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের সমস্যা কতকটা মীমাংসোন্মুখ হইল বলা যাইতে পারে, সুতরাং আমাদের দৃষ্টিগোচর এই জ্ঞাত জগৎ হইতে এই মীমাংসা পাইবার সম্ভাবনা নাই, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত, কারণ ইহা সমগ্র ভাবের কেবল অংশবিশেষমাত্র।

অতএব এই সমস্যার মীমাংসার একমাত্র উপায় জগতের অভ্যন্তরদেশে প্রবেশ। অতি প্রাচীন মননশীল মহাজনেরা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, কেন্দ্র হইতে তাঁহারা যতদূরে যাইতেছেন, ততই সেই

অখণ্ড বস্তু হইতে পিছাইয়া পড়িতেছেন, আর যতই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, ততই উহার নিকট পঁহুছিতেছেন। আমরা যতই এই কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হই, ততই আমরা যে সাধারণ ভূমিতে সকলে একত্র হইতে পারি, তাহার নিকট উপস্থিত হই, আর যতই উহা হইতে দূরে সরিয়া যাই, ততই আমাদের সহিত অপরের বিশেষ পার্থক্য আরম্ভ হয়। এই বাহ্যজগৎ সেই কেন্দ্র হইতে অনেক দূরে, অতএব ইহার মধ্যে এমন কোন সাধারণ ভূমি থাকিতে পারে না, যেখানে সকল অস্তিত্বসমষ্টির এক সাধারণ মীমাংসা হইতে পারে। যতকিছু ব্যাপার আছে, এই জগৎ খুব জোর তাহার একাংশ মাত্র। আরও কত ব্যাপার রহিয়াছে—মনোজগতের ব্যাপার, নৈতিক জগতের ব্যাপার, বুদ্ধিরাজ্যের ব্যাপারসকল, এইরূপ আরও কত কত ব্যাপার রহিয়াছে। ইহার মধ্যে কেবল একটিমাত্র লইয়া তাহা হইতে সমুদয় জগৎসমস্যার মীমাংসা করা ত অসম্ভব। অতএব আমাদিগকে প্রথমতঃ কোথাও এমন একটি কেন্দ্র বাহির করিতে হইবে, যাহা হইতে অন্যান্য সমুদয় বিভিন্ন লোক উৎপন্ন হইয়াছে। তথা হইতে আমরা এই প্রশ্ন-মীমাংসার চেষ্টা করিব। ইহাই এখন প্রস্তাবিত বিষয়। সেই কেন্দ্র কোথায়? উহা আমাদের ভিতরে—এই মানুষের ভিতর যে মানুষ রহিয়াছেন, তিনিই এই কেন্দ্র। ক্রমাগত অন্তরের অন্তরে যাইয়া মহাপুরুষেরা দেখিতে পাইলেন, জীবাত্মার গভীরতম প্রদেশেই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র। যত প্রকার অস্তিত্ব আছে, সকলেই আসিয়া সেই এক কেন্দ্রে একীভূত হইতেছে। এখানেই বাস্তবিক সমুদয়ের একটি সাধারণ ভূমি—

এখানে দাঁড়াইয়া আমরা একটি সার্ব্বভৌম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি। অতএব কে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন—এই প্রশ্নটিই বড় দার্শনিকযুক্তিসিদ্ধ নহে, এবং উহার মীমাংসাও বড় কিছু কাজের নহে।

পূর্ব্বে যে কঠোপনিষদের কথা বলা হইয়াছে, ইহার ভাষা বড় অলঙ্কারপূর্ণ। অতি প্রাচীনকালে এক অতিশয় ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এক সময়ে এক যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে এই নিয়ম ছিল যে, সর্ব্বস্ব দান করিতে হইবে। এই ব্যক্তির ভিতর-বাহির এক ছিল না। তিনি যজ্ঞ করিয়া খুব মান যশ পাইবার ইচ্ছা করিতেন। এদিকে কিন্তু তিনি এমন সকল জিনিস দান করিতেছিলেন, যাহা ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী—তিনি কতকগুলি জরাজীর্ণ, অর্দ্ধমৃত, বন্ধ্যা, একচক্ষু, খঞ্জ গাভী লইয়া তাহাই ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেছিলেন। তাঁহার নচিকেতা নামে এক অল্পবয়স্ক পুত্র ছিল। পুত্র দেখিল, তাহার পিতা ঠিক ঠিক তাঁহার ব্রত পালন করিতেছেন না, বরং উহা ভঙ্গ করিতেছেন; অতএব সে কি বলিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। ভারতবর্ষে পিতামাতা প্রত্যক্ষ জীবন্ত দেবতা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, সন্তানেরা তাঁহাদের সম্মুখে কিছু বলিতে বা করিতে সাহস পায় না, কেবল চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। অতএব সেই বালক পিতার সম্মুখীন হইয়া সাক্ষাৎ কিছু জিজ্ঞাসা করিতে না পারিয়া তাঁহাকে কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করিল, "পিতঃ, আপনি আমায় কাহাকে দিবেন? আপনি ত যজ্ঞে সর্ব্বস্বদানের সঙ্কল্প করিয়াছেন।" পিতা অতিশয় বিরক্ত হইলেন, বলিলেন, "ও কি বলিতেছ বৎস—

পিতা নিজ পুত্রকে দান করিবে, এ কিরূপ কথা?" বালকটি দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার তাঁহাকে এই প্রশ্ন করিলেন—তখন পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোরে যমকে দিব।" তাহার পর আখ্যায়িকা এই—বালকটি যমের বাড়ী গেল। আদি মানব মৃত হইয়া যম-দেবতা হন—তিনি স্বর্গে গিয়া সমুদয় পিতৃগণের শাসনকর্ত্তা হইয়াছেন। সাধু ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহারা যাইয়া ইঁহার নিকট অনেক দিন ধরিয়া বাস করেন। এই যম একজন খুব শুদ্ধস্বভাব সাধুপুরুষ বলিয়া বর্ণিত। বালকটি যমলোকে গমন করিল। দেবতারাও সময়ে সময়ে বাড়ী থাকেন না, অতএব ইহাকে তিন দিন তথায় তাঁহার অপেক্ষায় থাকিতে হইল। চতুর্থ দিনে যম বাড়ী ফিরিলেন।

যম কহিলেন, "হে বিদ্বন্, তুমি পূজার যোগ্য অতিথি হইয়াও তিন দিন আমার গৃহে অনাহারে অবস্থান করিতেছ। হে ব্রহ্মন্, তোমাকে প্রণাম, আমার কল্যাণ হউক। আমি গৃহে ছিলাম না বলিয়া আমি বড় দুঃখিত। কিন্তু আমি এই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ তোমাকে প্রতিদিনের জন্য একটি একটি করিয়া তিনটি বর দিতে প্রস্তুত আছি, তুমি বর প্রার্থনা কর।" বালক প্রথম এই বর প্রার্থনা করিল—"আমায় প্রথম বর এই দিন যে, আমার প্রতি পিতার ক্রোধ যেন চলিয়া যায়, তিনি আমার প্রতি যেন প্রসন্ন হন, আর আপনি আমাকে এস্থান হইতে বিদায় দিলে যখন পিতার নিকট যাইব, তিনি আমায় যেন চিনিতে পারেন।" যম বলিলেন, "তথাস্তু।" নচিকেতা দ্বিতীয় বরে স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-বিশেষের বিষয় জানিতে ইচ্ছা করিল। আমরা পূর্ব্বেই

দেখিয়াছি বেদের সংহিতাভাগে আমরা কেবল স্বর্গের কথা পাই। তথায় সকলের জ্যোতির্ম্ময় শরীর, তথায় তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব পিতৃদিগের সহিত বাস করেন। ক্রমশঃ অন্যান্য ভাব আসিল, কিন্তু এসকলে কিছুতেই লোকের প্রাণ সম্পূর্ণ তৃপ্তি মানিল না। এই স্বর্গ হইতে আরও উচ্চতর কিছু আবশ্যক। স্বর্গে বাস এই জগতের বাস হইতে বড় কিছু ভিন্ন রকমের নহে। জোর একজন যুবক সুস্থকায় ধনীর জীবন যেরূপ তাহাই—সম্ভোগের জিনিস অপর্য্যাপ্ত আর নীরোগ সুস্থ বলিষ্ঠ শরীর। উহা ত এই জড়-জগৎই হইল, না হয় আর একটু উচ্চদরের; আর আমরা পূর্ব্বেই যখন দেখিয়াছি, এই জড়জগৎ পূর্ব্বোক্ত সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে পারে না, তখন এই স্বর্গ হইতেই বা উহার কি মীমাংসা হইবে? অতএব যতই স্বর্গের উপর স্বর্গ কল্পনা কর না কেন, কিছুতেই সমস্যার প্রকৃত মীমাংসা হইতে পারে না। যদি এই জগৎ ঐ সমস্যার কোন মীমাংসা করিতে না পারিল তবে এইরূপ কতকগুলি জগৎ কিরূপে উহার মীমাংসা করিবে? কারণ আমাদের স্মরণ রাখা উচিত, স্থূলভূত প্রাকৃতিক সমুদয় ব্যাপারের অতি সামান্য অংশমাত্র। আমরা যেসকল অগণ্য ঘটনাপুঞ্জ বাস্তবিক দেখিয়া থাকি, তাহা ভৌতিক নহে।

আমাদিগের জীবনে প্রত্যেক মুহূর্ত্ত ধরিয়াই দেখ না কেন, কতটা আমাদের চিন্তার ব্যাপার, আর কতটাই বা বাস্তবিক বাহিরের ঘটনা। কতটা তুমি কেবল অনুভব কর, আর কতটাই বা বাস্তবিক দর্শন ও স্পর্শ কর। এই জীবনপ্রবাহ কি প্রবল বেগেই চলিতেছে—ইহার কার্য্যক্ষেত্রও কি বিস্তৃত, কিন্তু ইহাতে

মানসিক ঘটনাবলীর তুলনায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপারসমূহ কি সামান্য! স্বর্গবাদের ভ্রম এই যে, উহা বলে আমাদের জীবন ও জীবনের ঘটনাবলী কেবল রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের মধ্যেই আবদ্ধ। কিন্তু এই স্বর্গে, যেখানে জ্যোতির্ম্ময় দেহ পাইবার কথা, অধিকাংশ লোকের তৃপ্তি হইল না। তথাপি এখানে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপক যজ্ঞ-সম্বন্ধীয় জ্ঞান দ্বিতীয় বরের দ্বারা প্রার্থনা করিতেছেন। বেদের প্রাচীন ভাগে আছে, দেবতারা যজ্ঞদ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া লোককে স্বর্গে লইয়া যান। সকল ধর্ম্ম আলোচনা করিলে নিঃসংশয়িতভাবে এই সিদ্ধান্ত লব্ধ হয় যে, যাহা কিছু প্রাচীন তাহাই কালে পবিত্ররূপে পরিণত হইয়া থাকে। আমাদের পিতৃপুরুষেরা ভূর্জ্জ-ত্বকে লিখিতেন, অবশেষে তাঁহারা কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিলেন, কিন্তু এক্ষণেও ভূর্জ্জ-ত্বক পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। প্রায় ৯।১০ সহস্র বর্ষ পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতেন, সেই প্রণালী আজও বর্ত্তমান। যজ্ঞের সময় অন্য কোন প্রণালীতে অগ্নি উৎপাদন করিলে চলিবে না। এসিয়াবাসী আর্য্যগণের আর এক শাখাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। এখনও তাহাদের বর্ত্তমান বংশধরগণ বৈদ্যুতাগ্নি ধরিয়া তাহা রক্ষা করিতে ভালবাসে। ইহাতে প্রমাণিত হইতেছে, ইহারা পূর্ব্বে এইরূপে অগ্নি সংগ্রহ করিত; ক্রমে ইহারা দুইখানি কাষ্ঠ ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে শিখিল; পরে যখন অগ্নি উৎপাদন করিবার অন্যান্য উপায় শিখিল, তখনও প্রথমোক্ত উপায়গুলি তাহারা ত্যাগ করিল না। সেগুলি পবিত্র আচার হইয়া দাঁড়াইল।

হিব্রুদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাহারা পূর্ব্বে পার্চ্চমেণ্টে লিখিত।

এখন তাহারা কাগজে লিখিয়া থাকে, কিন্তু পার্চ্চমেণ্টে লেখা তাহাদের চক্ষে মহা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত। এইরূপ সকল জাতির সম্বন্ধেই। এক্ষণে যে আচারকে শুদ্ধাচার বলিয়া বিবেচনা করিতেছ, তাহা প্রাচীন প্রথামাত্র। এই যজ্ঞগুলিও সেইরূপ প্রাচীন প্রথামাত্র ছিল। কালক্রমে যখন লোকে পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তম প্রণালীতে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল, তখন তাহাদের ধারণাসকল পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত হইল কিন্তু ঐ প্রাচীন প্রথাগুলি রহিয়া গেল। সময়ে সময়ে ঐগুলির অনুষ্ঠান হইত—উহারা পবিত্র আচার বলিয়া পরিগণিত হইত। তৎপরে একদল লোক এই যজ্ঞকার্য্যনির্ব্বাহের ভার গ্রহণ করিলেন। ইঁহারাই পুরোহিত। ইঁহারা যজ্ঞসম্বন্ধে গভীর গবেষণা করিতে লাগিলেন—যজ্ঞই তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহাদের এই ধারণা তখন বদ্ধমূল হইল—দেবতারা যজ্ঞের গন্ধ আঘ্রাণ করিতে আসেন—যজ্ঞের শক্তিতে জগতে সবই হইতে পারে। যদি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক আহুতি দেওয়া যায়, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ স্তোত্র গীত হয়, বিশেষাকৃতিবিশিষ্ট কতকগুলি বেদী প্রস্তুত হয়, তবে দেবতারা সব করিতে পারেন প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হইল। নচিকেতা এই জন্যই দ্বিতীয় বরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, কিরূপ যজ্ঞের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হইতে পারে।

তাহারপর নচিকেতা তৃতীয় বর প্রার্থনা করিলেন, আর এখান হইতেই প্রকৃত উপনিষদের আরম্ভ। নচিকেতা বলিলেন, "কেহ কেহ বলেন, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে ; কেহ কেহ বলেন, থাকে না—আপনি আমাকে এ বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিন।"

যম ভীত হইলেন। তিনি পরম আনন্দের সহিত নচিকেতার প্রথমোক্ত বরদ্বয় পূর্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি বলিলেন, "প্রাচীনকালে দেবতারা এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। এই সূক্ষ্ম ধর্ম্ম সুবিজ্ঞেয় নহে। হে নচিকেতঃ, তুমি অন্য কোন বর প্রার্থনা কর, আমাকে এ বিষয়ে আর অনুরোধ করিও না—আমাকে ছাড়িয়া দাও।"

নচিকেতা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তিনি কহিলেন, "হে মৃত্যো, শুনা যায়—দেবতারাও এ বিষয়ে সংশয় করিয়াছিলেন, আর ইহা বুঝাও সহজ ব্যাপার নহে, সত্য বটে। কিন্তু আমি তোমার ন্যায় এ বিষয়ের বক্তাও পাইব না, আর এই বরের তুল্য অন্য বরও নাই।"

যম বলিলেন, "শতায়ু পুত্র, পৌত্র, পশু, হস্তী, সুবর্ণ, অশ্ব প্রার্থনা কর। এই পৃথিবীর উপরে রাজত্ব কর এবং যতদিন তুমি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কর ততদিন বাঁচিয়া থাক। অন্য কোন বর যদি তুমি ইহার তুল্য মনে কর তবে তাহাও প্রার্থনা কর, অথবা অর্থ এবং দীর্ঘজীবন প্রার্থনা কর। অথবা হে নচিকেতঃ, তুমি বিস্তৃত পৃথিবীমণ্ডলে রাজত্ব কর, আমি তোমাকে সর্ব্বপ্রকার কাম্যবস্তুর ভাগী করিব। পৃথিবীতে যে-যে কাম্যবস্তুলাভ দুর্লভ, তাহা প্রার্থনা কর, এই রথাধিরূঢ়া গীতবাদিত্রবিশারদা রমণীগণকে মানুষ লাভ করিতে পারে না। হে নচিকেতঃ, আমার প্রদত্ত এই সকল কামিনী তোমার সেবা করুক, কিন্তু তুমি মৃত্যু-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিও না।"

নচিকেতা বলিলেন, "এ সকল বস্তু কেবল দুদিনের জন্য—

ইহারা ইন্দ্রিয়ের তেজ হরণ করে। অতিদীর্ঘ জীবনও অনন্তকালের তুলনায় বাস্তবিক অতি অল্প। অতএব এই হস্তী অশ্ব রথ গীতবাদ্য তোমারই থাকুক। মানুষ বিত্তদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না। তোমাকে যখন দেখিতে হইবে, তখন আমরা বিত্ত চিরকালের জন্য কি করিয়া রক্ষা করিব? তুমি যতদিন ইচ্ছা করিবে আমরা ততদিনই জীবিত থাকিব। আমি যে বর প্রার্থনা করিয়াছি তাহাই আমার বরণীয়।”

যম এতক্ষণে সন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, “পরম কল্যাণ (শ্রেয়ঃ) ও আপাতরম্য ভোগ (প্রেয়ঃ)—এই দুইটির বিভিন্ন উদ্দেশ্য, ইহারা উভয়েই মানুষকে বদ্ধ করে। যিনি তাহার মধ্যে শ্রেয়ঃকে গ্রহণ করেন, তাঁহার কল্যাণ হয়; আর যে আপাতরম্য ভোগ গ্রহণ করে, সে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়কে বিচার করিয়া একটিকে অপরটি হইতে পৃথক বলিয়া জানেন। তিনি শ্রেয়ঃকে প্রেয়ঃ হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গ্রহণ করেন, কিন্তু অ-জ্ঞানী ব্যক্তি নিজ দেহের সুখের জন্য প্রেয়ঃকেই গ্রহণ করে। হে নচিকেতঃ, তুমি আপাতরম্য বিষয়সকলের নশ্বরতা চিন্তা করিয়া উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছ।” এইসকল কথা বলিয়া নচিকেতাকে প্রশংসা করিয়া অবশেষে যম তাঁহাকে পরমতত্ত্বের উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন।

এক্ষণে আমরা বৈদিক বৈরাগ্য ও নীতির খুব উন্নত ধারণা এই প্রাপ্ত হইলাম যে, যতদিন না মানুষের ভোগবাসনার ত্যাগ হইতেছে, ততদিন তাহার হৃদয়ে সত্যজ্যোতির প্রকাশ হইবে

না। যতদিন এই সকল বৃথা বিষয়-বাসনা তুমুল কোলাহল করিতেছে, যতদিন উহারা প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে যেন বাহিরে টানিয়া লইয়া যাইতেছে—লইয়া গিয়া আমাদিগকে বাহ্য প্রত্যেক বস্তুর, একবিন্দু রূপের, একবিন্দু আস্বাদের, একবিন্দু স্পর্শের দাস করিতেছে, ততদিন আমরা যতই আমাদের জ্ঞানের গরিমা করি না কেন, সত্য কিরূপে আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইবে ?

যম বলিতেছেন, "যে আত্মার সম্বন্ধে, যে পরলোকতত্ত্ব-সম্বন্ধে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ তাহা বিত্তমোহে মূঢ় বালকের হৃদয়ে প্রতিভাত হয় না। এই জগতেরই অস্তিত্ব আছে, পরলোকের অস্তিত্ব নাই—এরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা পুনঃ পুনঃ আমার বশে আসে।"

আবার এই সত্য বুঝাও বড় কঠিন। অনেকে ক্রমাগত এই বিষয় শুনিয়াও বুঝিতে পারে না, এ বিষয়ের বক্তাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্যক, শ্রোতাও আশ্চর্য্য হওয়া আবশ্যক। গুরুর অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, শিষ্যেরও তাহাই হওয়া আবশ্যক। মনকে আবার বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করা উচিত নহে। কারণ পরমার্থতত্ত্ব তর্কের বিষয় নহে, প্রত্যক্ষের বিষয়। আমরা বরাবর শুনিয়া আসিতেছি, প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটি অঙ্গ আছে, যাহাতে বিশ্বাসের উপর খুব ঝোঁক দেয়। আমরা অন্ধবিশ্বাস করিতে শিক্ষা পাইয়াছি। অবশ্য এই অন্ধবিশ্বাস যে মন্দ জিনিস তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু এই অন্ধবিশ্বাস ব্যাপারটিকে একটু তলাইয়া বুঝিলে দেখিব, ইহার পশ্চাতে একটি মহান সত্য

আছে। যাহারা অন্ধবিশ্বাসের কথা বলে, তাহাদের বাস্তবিক উদ্দেশ্য এই অপরোক্ষানুভূতি—আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা করিতেছি। মনকে বৃথা তর্কের দ্বারা চঞ্চল করিলে চলিবে না, কারণ তর্কে কখন ঈশ্বরলাভ হয় না। ঈশ্বর প্রত্যক্ষের বিষয়, তর্কের বিষয় নহেন। সমুদয় তর্কই কতকগুলি সিদ্ধান্তের উপর স্থাপিত। এই সিদ্ধান্তগুলি ব্যতীত তর্ক হইতেই পারে না। আমরা পূর্ব্বে যাহা নিশ্চিতরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, এমন কতকগুলি বিষয়ের মধ্যে তুলনার প্রণালীকে যুক্তি কহে। এই সুনিশ্চিত প্রত্যক্ষ বিষয়গুলি না থাকিলে যুক্তি চলিতেই পারে না। বাহ্যজগৎ-সম্বন্ধে যদি ইহা সত্য হয়, তবে অন্তর্জগৎ-সম্বন্ধেই বা তাহা না হইবে কেন?

আমরা পুনঃ পুনঃ এই ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আমরা জানি—বহির্বিষয় সমুদয়ই প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করে। বহির্বিষয় কেহ বিশ্বাস করিয়া লইতে বলে না বা উহাদের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ক নিয়মাবলী কোন যুক্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা উহারা লব্ধ হয়। আবার সমুদয় তর্কই কতকগুলি প্রত্যক্ষানুভূতির উপর স্থাপিত। রসায়নবিৎ কতকগুলি দ্রব্য লইলেন—তাহা হইতে আর কতকগুলি দ্রব্য উৎপন্ন হইল। ইহা একটি ঘটনা। আমরা উহা স্পষ্ট দেখি, প্রত্যক্ষ করি এবং উহাকে ভিত্তি করিয়া রসায়নের সমুদয় বিচার করিয়া থাকি। পদার্থতত্ত্ববেত্তারাও তাহাই করিয়া থাকে—সকল বিজ্ঞান-সম্বন্ধেই এইরূপ। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞানই কতকগুলি প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত। তাহাদের উপর নির্ভর করিয়াই আমরা বিচার-যুক্তি করিয়া থাকি। কিন্তু

আশ্চর্য্যের বিষয় অধিকাংশ লোক, বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে, ভাবিয়া থাকে, ধর্ম্মতত্ত্বে কিছু প্রত্যক্ষ করিবার নাই—যদি কিছু ধর্ম্মতত্ত্ব লাভ করিতে হয়, তবে তাহা বাহিরের বৃথা তর্কের দ্বারাই লাভ করিতে হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্ম কথার ব্যাপার নহে—প্রত্যক্ষের বিষয়। আমাদিগকে আমাদের আত্মার ভিতরে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে হইবে, সেখানে কি আছে। আমাদিগকে উহা বুঝিতে হইবে, আর যাহা বুঝিব তাহা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। ইহাই ধর্ম্ম। যতই চীৎকার কর না কেন, তাহা ধর্ম্ম নহে। অতএব একজন ঈশ্বর আছেন কি না তাহা বৃথা তর্কের দ্বারা প্রমাণিত হইবার নহে, কারণ যুক্তি উভয় দিকেই সমান। কিন্তু যদি একজন ঈশ্বর থাকেন, তিনি আমাদের অন্তরে আছেন। তুমি কি কখন তাঁহাকে দেখিয়াছ? ইহাই প্রশ্ন। যেমন জগতের অস্তিত্ব আছে কি না—এই প্রশ্ন এখনও মীমাংসিত হয় নাই, প্রত্যক্ষবাদ ও বিজ্ঞানবাদের ( idealism ) তর্ক অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। এই তর্ক চলিতেছে সত্য, কিন্তু আমরা জানি জগৎ রহিয়াছে, উহা চলিয়াছে। আমরা কেবল এক শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া এই তর্ক করিয়া থাকি। আমাদের জীবনের অন্যান্য সকল প্রশ্ন-সম্বন্ধেও তাহাই—আমাদিগকে প্রত্যক্ষানুভূতি লাভ করিতে হইবে। যেমন বহির্বিজ্ঞানে, তেমন পরমার্থবিজ্ঞানেও আমাদিগকে কতকগুলি পারমার্থিক ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। তাহারই উপর ধর্ম্ম স্থাপিত হইবে। অবশ্য কোন ধর্ম্মের যে-কোন মতই হউক না, তাহাতেই বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইবে, এই অযৌক্তিক দাবীতে কোন আস্থা করা যাইতে পারে না, উহা মনুষ্য-

মনের অবনতিসাধক। যে ব্যক্তি তোমাকে সকল বিষয় বিশ্বাস করিতে বলে, সে নিজেকেও অবনত করে, আর তুমি যদি তাহার কথায় বিশ্বাস কর, তোমাকেও অবনত করে। জগতের সাধুপুরুষগণের আমাদিগকে কেবল এইটুকু বলিকার অধিকার আছে যে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজেদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন আর কতকগুলি সত্য পাইয়াছেন, আমরাও ঐরূপ করিলে তবে আমরা উহা বিশ্বাস করিব, তাহার পূর্ব্বে নহে। ধর্ম্মের মোট কথাটাই এই। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে দেখিবে, যাহারা ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তর্ক করে তাহাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই জন তাহাদের মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখে নাই, তাহারা সত্য লাভ করিবার চেষ্টা করে নাই। অতএব ধর্ম্মের বিরুদ্ধে তাহাদের যুক্তির কোন মূল্য নাই। যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি দাঁড়াইয়া বলে, 'তোমরা, যাহারা সূর্য্যের অস্তিত্বে বিশ্বাসী, সকলেই ভ্রান্ত,' তাহার কথার যতটুকু মূল্য ইহাদের কথারও ততটুকু মূল্য। অতএব যাহারা নিজেদের মন বিশ্লেষণ করে নাই, অথচ ধর্ম্মকে একেবারে উড়াইয়া দিতে, লোপ করিতে অগ্রসর তাহাদের কথায় আমাদের কিছুমাত্র আস্থা স্থাপন করিবার আবশ্যকতা নাই।

এই বিষয়টি বিশেষ করিয়া বুঝা এবং অপরোক্ষানুভূতির ভাব সর্ব্বদা মনে জাগরূক রাখা উচিত। ধর্ম্ম লইয়া এইসকল গণ্ডগোল, মারামারি, বিবাদ-বিসংবাদ তখনই চলিয়া যাইবে যখনই আমরা বুঝিব ধর্ম্ম গ্রন্থবিশেষে বা মন্দিরবিশেষে আবদ্ধ নহে অথবা ইন্দ্রিয় দ্বারাও উহার অনুভূতি সম্ভব নহে। ইহা অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের অপরোক্ষানুভূতি। যে ব্যক্তি বাস্তবিক ঈশ্বর ও আত্মা উপলব্ধি

করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক; আর এই প্রত্যক্ষানুভূতিবিহীন হইলে উচ্চতম ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, যিনি অনর্গল ধর্ম্মবক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহার সহিত অতি সামান্য অজ্ঞ জড়বাদীর কোন প্রভেদ নাই। আমরা সকলেই নাস্তিক, আমরা তাহা মানিয়া লই না কেন? কেবল বিচারপূর্ব্বক ধর্ম্মের সত্যসকলে সম্মতিদান করিলে ধার্ম্মিক হওয়া যায় না। একজন খ্রীশ্চিয়ান বা মুসলমান অথবা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর কথা ধর। খ্রীষ্টের সেই পর্ব্বতে ধর্ম্মোপদেশদানের কথা মনে হয়। যে-কোন ব্যক্তি ঐ উপদেশ কার্য্যে পালন করে সে তৎক্ষণাৎ দেবতা হইয়া যায়, সিদ্ধ হইয়া যায়, তথাপি কথিত হইয়া থাকে পৃথিবীতে এত কোটি খ্রীশ্চিয়ান আছে। তুমি কি বলিতে চাও, ইহারা সকলে খ্রীশ্চিয়ান? বাস্তবিক ইহার অর্থ এই, ইহারা কোন-না-কোন সময়ে এই উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার চেষ্টা করিতে পারে। দুই কোটি লোকের ভিতর একটি প্রকৃত খ্রীশ্চিয়ান আছে কিনা সন্দেহ।

ভারতবর্ষেও এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, ত্রিশ কোটি বৈদান্তিক আছেন। যদি প্রত্যক্ষানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তি সহস্রে একজনও থাকিতেন, তবে এই জগৎ পাঁচ মিনিটে আর এক আকার ধারণ করিত। আমরা সকলেই নাস্তিক, কিন্তু যে ব্যক্তি উহা স্পষ্ট স্বীকার করিতে যায়, আমরা তাহার সহিতই বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। আমরা সকলেই অন্ধকারে পড়িয়া রহিয়াছি। ধর্ম্ম আমাদের কাছে যেন কিছু নয়, কেবল বিচারলব্ধ কতকগুলি মতের অনুমোদনমাত্র, কেবল কথার কথা—অমুক বেশ ভাল বলিতে কহিতে পারে, অমুক পারে না। ইহাই আমাদের ধর্ম্ম—

'শব্দযোজনা করিবার সুন্দর কৌশল, আলঙ্কারিক বর্ণনার ক্ষমতা, নানাপ্রকারে শাস্ত্রের শ্লোকব্যাখ্যা—এইসকল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের নিমিত্ত, ধর্ম্মার্থে নহে।' যখনই আমাদের আত্মার এই প্রত্যক্ষানুভূতি আরম্ভ হইবে, তখনই ধর্ম্ম আরম্ভ হইবে। তখনই তুমি ধার্ম্মিক হইবে, তখনই—কেবল তখনই নৈতিক জীবনও আরম্ভ হইবে। আমরা এক্ষণে রাস্তার পশুদের অপেক্ষাও বড় অধিক নীতিপরায়ণ নই। আমরা এখন কেবল সমাজের শাসনভয়েই বড় উচ্চবাচ্য করি না। যদি সমাজ আজ বলেন, চুরি করিলে আর শাস্তি হইবে না, আমরা অমনি অপরের সম্পত্তি হরণার্থ ব্যগ্র হইয়া দৌড়াইব। আমাদের সচ্চরিত্র হইবার কারণ পুলিশ। সামাজিক প্রতিপত্তিলোপের আশঙ্কাই আমাদের নীতিপরায়ণ হইবার অনেকটা কারণ, আর বাস্তবিক আমরা পশুগণ হইতে খুব অল্পই উন্নত। আমরা যখন নিজ নিজ গৃহের নিভৃত কোণে বসিয়া নিজের অন্তরটার ভিতরে অনুসন্ধান করি, তখনই বুঝিতে পারি একথা কতদূর সত্য। অতএব আইস, আমরা এই কপটতা ত্যাগ করি। আইস, স্বীকার করি আমরা ধার্ম্মিক নই এবং অপরের প্রতি ঘৃণা করিবার আমাদের কোন অধিকার নাই। আমাদের সকলের মধ্যে বাস্তবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ, আর আমাদের ধর্ম্মের প্রত্যক্ষানুভূতি হইলেই আমরা নীতিপরায়ণ হইবার আশা করিতে পারি।

মনে কর তুমি কোন দেশ দেখিয়াছ। কোন ব্যক্তি তোমায় কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তুমি আপনার অন্তরের অন্তরে কখন একথা বলিতে পারিবে না যে, তুমি সেই

দেশ দেখ নাই। অবশ্য, অতিরিক্ত শারীরিক বলপ্রয়োগ করিলে তুমি মুখে বলিতে পার বটে আমি সেই দেশ দেখি নাই, কিন্তু তুমি মনে মনে জানিতেছ তুমি তাহা দেখিয়াছ। বাহ্যজগৎকে তুমি যেরূপ প্রত্যক্ষ কর, যখন তাহা অপেক্ষাও উজ্জ্বলভাবে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার হইবে তখন কিছুতেই তোমার বিশ্বাসকে নষ্ট করিতে পারিবে না। তখনই প্রকৃত বিশ্বাসের আরম্ভ হইবে। বাইবেলের কথা, 'যাহার একসর্ষপ-পরিমাণ বিশ্বাস থাকে, সে পাহাড়কে সরিয়া যাইতে বলিলে পাহাড়টি তাহার কথা শুনিবে—' এ কথার তাৎপর্য্য এই। তখন তুমি স্বয়ং সত্যস্বরূপ হইয়া গিয়াছ বলিয়াই সত্যকে জানিতে পারিবে—কেবল বিচারপূর্ব্বক সত্যে সম্মতি দেওয়াতে কোন লাভ নাই।

একমাত্র কথা এই—প্রত্যক্ষ হইয়াছে কি? বেদান্তের ইহাই মূলকথা—ধর্ম্মের সাক্ষাৎ কর, কেবল কথায় কিছু হইবে না; কিন্তু সাক্ষাৎকার করা বড় কঠিন। যিনি পরমাণুর অভ্যন্তরে অতি গুহ্যভাবে অবস্থান করিতেছেন, সেই পুরাণ পুরুষ প্রত্যেক মানবহৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। সাধুগণ তাঁহাকে অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা উপলব্ধি করিয়াছেন এবং সুখ দুঃখ উভয়েরই পারে গিয়াছেন। আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি, আমরা যাহাকে অধর্ম্ম বলি—শুভাশুভ সকল কর্ম্ম, সৎ-অসৎ, সকলেরই পারে তিনি গিয়াছেন যিনি তাঁহাকে দেখিয়াছেন। তিনি যথার্থ সত্য দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে স্বর্গের কথা কি হইল? স্বর্গসম্বন্ধে আমাদের ধারণা এই যে, উহা দুঃখশূন্য সুখ। অর্থাৎ আমরা চাই সংসারের সব সুখগুলি,

উহার দুঃখগুলিকে কেবল বাদ দিতে চাই। অবশ্য ইহা অতি সুন্দর ধারণা বটে, ইহা স্বাভাবিক ভাবেই আসিয়া থাকে বটে, কিন্তু ঐ ধারণাটি একেবারে আগাগোড়াই ভ্রমাত্মক, কারণ পূর্ণ সুখ বা পূর্ণ দুঃখ বলিয়া কোন জিনিস নাই।

রোমে একজন খুব ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি একদিন জানিলেন, তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে দশ লক্ষ পাউণ্ড মাত্র অবশিষ্ট আছে। শুনিয়াই তিনি বলিলেন, "তবে আমি কাল কি করিব?" ইহা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ আত্মহত্যা করিলেন। দশ লক্ষ পাউণ্ড তাঁহার পক্ষে দারিদ্র্য কিন্তু আমার পক্ষে নহে। উহা আমার সারা জীবনের আবশ্যকতারও অতিরিক্ত। বাস্তবিক সুখই বা কি, আর দুঃখই বা কি? উহারা ক্রমাগত বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। আমি যখন অতি শিশু ছিলাম তখন আমার মনে হইত—গাড়ী হাঁকাইতে পারিলে আমি সুখের পরাকাষ্ঠা লাভ করিব। এখন আমার তাহা মনে হয় না। এখন তুমি কোন্ সুখকে ধরিয়া থাকিবে? এইটি আমাদের বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা উচিত। আর এই কুসংস্কারই আমাদের অনেক বিলম্বে ঘুচে। প্রত্যেকের সুখের ধারণা ভিন্ন ভিন্ন। আমি একটি লোককে দেখিয়াছি, সে প্রতিদিন রাশখানেক আফিম না খাইলে সুখী হয় না। সে হয়ত ভাবিবে, স্বর্গের মাটি সব আফিমনির্ম্মিত। কিন্তু আমার পক্ষে সে স্বর্গ বড় সুবিধাকর হইবে না। আমরা পুনঃ পুনঃ আরবী কবিতায় পাঠ করিয়া থাকি, স্বর্গ নানা মনোহর উদ্যানে পূর্ণ, তাহার নিম্ন দিয়া নদীসকল প্রবাহিত হইতেছে। আমি আমার জীবনের অধিকাংশ সময় এমন এক দেশে বাস করিয়াছি, যেখানে

অত্যন্ত অধিক জল, অনেক গ্রাম এবং সহস্র সহস্র ব্যক্তি প্রতি বর্ষে অতিরিক্ত জলপ্লাবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অতএব আমার স্বর্গ নিম্নদেশে নদীপ্রবাহযুক্ত উদ্যানপূর্ণ হইলে চলিবে না; আমার স্বর্গ শুষ্কভূমিপূর্ণ অধিকবর্ষাশূন্য হওয়া আবশ্যক। আমাদের জীবন-সম্বন্ধেও তদ্রূপ, আমাদের সুখের ধারণা ক্রমাগত বদলাইতেছে। যুবক যদি স্বর্গের ধারণা করিতে যায়, তবে তাহার কল্পনায় উহা পরমা সুন্দরী স্ত্রীগণের দ্বারা পূর্ণ হওয়া আবশ্যক। সেই ব্যক্তিই আবার বৃদ্ধ হইলে তাহার আর স্ত্রীর আবশ্যকতা থাকিবে না। আমাদের প্রয়োজনই আমাদের স্বর্গের নির্ম্মাতা, আর আমাদের প্রয়োজনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের স্বর্গও বিভিন্ন রূপ ধারণ করে। যদি আমরা এমন এক স্বর্গে যাই, যেখানে অনন্ত ইন্দ্রিয়সুখলাভ হইবে, সেখানে আমাদের বিশেষ উন্নতি কিছু হইবে না—যাহারা বিষয়ভোগকেই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচনা করে, তাহারাই এইরূপ স্বর্গ প্রার্থনা করিয়া থাকে। ইহা বাস্তবিক মঙ্গলকর না হইয়া মহা অমঙ্গলকর হইবে। এই কি আমাদের চরম গতি—একটু হাসিকান্না, তাহার পর কুকুরের ন্যায় মৃত্যু? যখন এইসকল বিষয়ভোগের প্রার্থনা কর, তখন তোমরা মানবজাতির যে কি ঘোর অমঙ্গল কামনা করিতেছ, তাহা জান না। বাস্তবিক ঐহিক সুখভোগের কামনা করিয়া তুমি তাহাই করিতেছ, কারণ তুমি জান না প্রকৃত আনন্দ কি। বাস্তবিক, দর্শনশাস্ত্র আনন্দ ত্যাগ করিতে উপদেশ দেয় না, প্রকৃত আনন্দ কি তাহাই শিক্ষা দেয়। নরওয়েবাসীদের স্বর্গসম্বন্ধে ধারণা এই যে, উহা একটি ভয়ানক যুদ্ধক্ষেত্র—সেখানে সকলে ওডিন

( Wdin ) দেবতার সম্মুখে উপবেশন করিয়া থাকে—কিয়ৎকাল পরে বন্যবরাহ-শিকার আরম্ভ হয়। পরে তাহারা আপনারাই যুদ্ধ করে ও পরস্পরকে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলে। কিন্তু এরূপ যুদ্ধের খানিকক্ষণ পরেই কোন না কোনরূপে ইহাদের ক্ষতসকল আরোগ্য হইয়া যায়—তাহারা তখন একটি হলে ( hall ) গিয়া সেই বরাহের মাংস দগ্ধ করিয়া ভোজন ও আমোদপ্রমোদ করিতে থাকে। তাহার পরদিন আবার সেই বরাহটি জীবিত হয়, আবার সেইরূপ শিকারাদি হইয়া থাকে। এ আমাদের ধারণারই অনুরূপ, তবে আমাদের ধারণাটি না হয় একটু চাক্‌চিক্যশালী। আমরা সকলেই এইরূপ শূকর শিকার করিতে ভালবাসি—আমরা এমন একস্থানে যাইতে চাহি, যেখানে এই ভোগ পূর্ণমাত্রায় ক্রমাগত চলিবে, যেখানে ঐ নরওয়েবাসীরা কল্পনা করে যে, যাহারা স্বর্গে যায় তাহারা প্রতিদিন বন্যশূকর শিকার করিয়া উহা খাইয়া থাকে, আবার পরদিন উহা পুনরায় বাঁচিয়া উঠে।

দর্শনশাস্ত্রের মতে নিরপেক্ষ অপরিণামী আনন্দ বলিয়া জিনিস আছে, সুতরাং আমরা সাধারণতঃ যে ঐহিক সুখভোগ করিয়া থাকি, তাহার সঙ্গে এ সুখের কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু আবার বেদান্তই কেবল প্রমাণ করেন যে, এই জগতে যাহা কিছু আনন্দকর আছে তাহা সেই প্রকৃত আনন্দের অংশমাত্র, কারণ সেই ব্রহ্মানন্দেরই বাস্তবিক অস্তিত্ব আছে। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তেই সেই ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেছি, কিন্তু উহাকে ব্রহ্মানন্দ বলিয়া জানি না। যেখানেই দেখিবে কোনরূপ আনন্দ, এমন কি চোরের চৌর্য্য-কার্য্যে যে আনন্দ তাহাও বাস্তবিক সেই পূর্ণানন্দ, কেবল

উহা কতকগুলি বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে মলিন হইয়াছে মাত্র। কিন্তু উহার উপলব্ধি করিতে হইলে প্রথমে আমাদিগকে সমুদয় ঐহিক সুখভোগ ত্যাগ করিতে হইবে। উহা ত্যাগ করিলেই প্রকৃত আনন্দের সাক্ষাৎকারলাভ হইবে। প্রথমে অজ্ঞান মিথ্যা সমুদয় ত্যাগ করিতে হইবে, তবেই সত্যের প্রকাশ হইবে। যখন আমরা সত্যকে দৃঢ়ভাবে ধরিতে পারিব, তখন প্রথমে আমরা যাহা কিছু ত্যাগ করিয়াছিলাম, তাহাই আর একরূপ ধারণ করিবে, নূতন আকারে প্রতিভাত হইবে, তখন সমুদয়ই —সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই—ব্রহ্মময় হইয়া যাইবে, তখন সমুদয়ই উন্নতভাব ধারণ করিবে, তখন আমরা সমুদয় পদার্থকে নূতন আলোকে বুঝিব। কিন্তু প্রথমে আমাদিগকে সেইগুলি ত্যাগ করিতে হইবেই; পরে সত্যের অন্ততঃ এক বিন্দু আভাস পাইলে আবার তাহাদিগকে গ্রহণ করিব, কিন্তু অন্যরূপে—ব্রহ্মাকারে পরিণতরূপে। অতএব আমাদিগকে সুখ দুঃখ সব ত্যাগ করিতে হইবে। এগুলি সেই প্রকৃত বস্তুর, তাহাকে সুখই বল আর দুঃখই বল, বিভিন্ন ক্রমমাত্র। 'বেদসকল যাহাকে ঘোষণা করেন, সকল প্রকার তপস্যা যাঁহার প্রাপ্তির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য লোকে ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করে, আমি সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে তোমায় বলিব—তিনি ওঁ।' বেদে এই ওঁকারের অতিশয় মহিমা ও পবিত্রতা ব্যাখ্যাত আছে।

এক্ষণে যম নচিকেতার প্রশ্ন—মানুষের মৃত্যুর পর তাহার কি অবস্থা হয়, তাহার উত্তর দিতেছেন। 'সদাচৈতন্যবান আত্মা কখন মরেন না, কখন জন্মানও না; ইনি কোন কিছু হইতে উৎপন্ন

হন না; ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। দেহ নষ্ট হইলেও ইনি নষ্ট হন না। হন্তা যদি মনে করেন, আমি কাহাকেও হনন করিতে পারি, অথবা হত ব্যক্তি যদি মনে করেন, আমি হত হইলাম, তবে উভয়কেই সত্যসম্বন্ধে অনভিজ্ঞ বুঝিতে হইবে। আত্মা কাহাকে হননও করেন না অথবা স্বয়ং হতও হন না।' এ ত ভয়ানক কথা দাঁড়াইল। প্রথম শ্লোকে আত্মার বিশেষণ 'সদাচৈতন্যবান' শব্দটির উপর বিশেষ লক্ষ্য কর। ক্রমশঃ দেখিবে, বেদান্তের প্রকৃত মত এই যে, সমুদয় জ্ঞান, সমুদয় পবিত্রতা, প্রথম হইতেই আত্মায় অবস্থিত, কোথাও হয়ত উহার বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। এই মাত্র প্রভেদ। মানুষের সহিত মানুষের অথবা এই ব্রহ্মাণ্ডের যে-কোন বস্তুর পার্থক্য প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। প্রত্যেকের অন্তরালদেশে অবস্থিত সত্য সেই একমাত্র অনন্ত নিত্যানন্দময়, নিত্যশুদ্ধ, নিত্য-পূর্ণ ব্রহ্ম। তিনিই সেই আত্মা—তিনি পুণ্যবানে, পাপীতে, সুখীতে, দুঃখীতে, সুন্দরে, কুৎসিতে, মনুষ্যে, পশুতে সর্ব্বত্র একরূপ। তিনিই জ্যোতির্ম্ময়। তাঁহার প্রকাশের তারতম্যেই নানারূপ প্রভেদ। কাহারও ভিতর তিনি অধিক প্রকাশিত, কাহারও ভিতর বা অল্প কিন্তু সেই আত্মার নিকট এই ভেদের কোন অর্থই নাই। কাহারও পোশাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অধিকাংশ দেখা যাইতেছে, আর এক জনের পোশাকের ভিতর দিয়া তাহার শরীরের অল্পাংশ দেখা যাইতেছে—ইহাতে শরীরে কোন ভেদ হইতেছে না। কেবল দেহের অধিকাংশ বা অল্পাংশ আবরণকারী পরিচ্ছদেই ভেদ দেখা যাইতেছে।

আবরণ, অর্থাৎ দেহ ও মনের তারতম্যানুসারে আত্মার শক্তি ও পবিত্রতা প্রকাশ পাইতে থাকে। অতএব এইখানেই বুঝিয়া রাখা ভাল যে, বেদান্তদর্শনে ভালমন্দ বলিয়া দুইটি পৃথক বস্তুই নাই। সেই এক জিনিসই ভালমন্দ দুই হইতেছে আর উহাদের মধ্যে বিভিন্নতা কেবল পরিমাণগত, এবং বাস্তবিকই কার্য্যক্ষেত্রেও আমরা তাহাই দেখিতেছি। আজ যে জিনিসকে আমি সুখকর বলিতেছি, কাল আবার একটু পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল অবস্থা হইলে তাহা দুঃখকর বলিয়া ঘৃণা করিব। অতএব বাস্তবিক বস্তুটির বিকাশের বিভিন্ন মাত্রার জন্যই ভেদ উপলব্ধ হয়, সেই জিনিসটিতে বাস্তবিক কোন ভেদ নাই। বাস্তবিক ভালমন্দ বলিয়া কোন জিনিস নাই। যে উত্তাপ আমার শীতনিবারণ করিতেছে, তাহাই কোন শিশুকে দগ্ধ করিতে পারে। ইহা কি অগ্নির দোষ হইল? অতএব যদি আত্মা শুদ্ধস্বরূপ ও পূর্ণ হয়, তবে যে ব্যক্তি অসৎকার্য্য করিতে যায়, সে আপনার স্বরূপের বিপরীতাচরণ করিতেছে—সে আপনার স্বরূপ জানে না। ঘাতকব্যক্তির ভিতরেও শুদ্ধস্বভাব আত্মা রহিয়াছেন। সে ভ্রমবশতঃ উঁহাকে আবৃত রাখিয়াছে মাত্র, উঁহার জ্যোতিঃ প্রকাশ হইতে দিতেছে না। আর যে ব্যক্তি মনে করে, সে হত হইল, তাহারও আত্মা হত হন না। আত্মা নিত্য—কখন তাঁহার ধ্বংস হইতে পারে না। 'অণুর অণু, বৃহতেরও বৃহৎ, সেই সকলের প্রভু প্রত্যেক মানব-হৃদয়ের গুহ্যপ্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। নিষ্পাপ ব্যক্তি বিধাতার কৃপায় তাঁহাকে দেখিয়া সকলশোকশূন্য হন। যিনি দেহশূন্য হইয়া দেহে অবস্থিত, যিনি দেশবিহীন হইয়াও দেশে

অবস্থিতের ন্যায়, সেই অনন্ত ও সর্ব্বব্যাপী আত্মাকে এইরূপ জানিয়া জ্ঞানী ব্যক্তিরা একেবারে দুঃখশূন্য হন। এই আত্মাকে বক্তৃতাশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা বা বেদাধ্যয়ন দ্বারা লাভ করা যায় না।'

এই যে 'বেদের দ্বারা লাভ করা যায় না,' একথা বলা ঋষিদের পক্ষে বড় সাহসের কর্ম্ম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ঋষিরা চিন্তাজগতে বড় সাহসী ছিলেন, তাঁহারা কিছুতেই থামিবার পাত্র ছিলেন না। হিন্দুরা বেদকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, খ্রীশ্চিয়ানরা বাইবেলকে কখন সেরূপ ভাবে দেখেন নাই। খ্রীশ্চিয়ানের ঈশ্বরবাণীর ধারণা এই, কোন মনুষ্য ঈশ্বরানুপ্রাণিত হইয়া উহা লিখিয়াছে, কিন্তু হিন্দুদের ধারণা জগতে যে সকল বিভিন্ন পদার্থ রহিয়াছে তাহার কারণ—বেদে ঐ ঐ বস্তুর নাম উল্লিখিত আছে। তাঁহাদের বিশ্বাস—বেদের দ্বারাই জগৎসৃষ্টি হইয়াছে। জ্ঞান বলিতে যাহা কিছু বুঝায়, সবই বেদে আছে। যেমন সৃষ্ট মানব অনাদি অনন্ত, তেমনি বেদের প্রত্যেক শব্দই পবিত্র ও অনন্ত। সৃষ্টিকর্ত্তার সমুদয় মনের ভাবই যেন এই গ্রন্থে প্রকাশিত। তাঁহারা এইভাবে বেদকে দেখিতেন। এ কার্য্য নীতিসঙ্গত কেন? না, বেদ উহা বলিতেছেন। এ কার্য্য অন্যায় কেন? না, বেদ বলিতেছেন। বেদের প্রতি প্রাচীনদিগের এতাদৃশী শ্রদ্ধা সত্ত্বেও এই ঋষিগণের সত্যানুসন্ধানে কি সাহস দেখ। তাঁহারা বলিলেন, না বারংবার বেদপাঠ করিলেও সত্যলাভের কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব সেই আত্মা যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, তাঁহার নিকটেই তিনি নিজস্বরূপ প্রকাশ করেন। কিন্তু ইহাতে এই এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, ইহাতেও তাঁহার পক্ষপাতিত্বদোষ

হইল। এইজন্য নিম্নলিখিত বাক্যগুলিও এই সঙ্গে কথিত হইয়াছে। যাহারা অসৎকর্ম্মকারী ও যাহাদের মন শান্ত নহে, তাহারা কখন 'ইহাকে লাভ করিতে পারে না।' কেবল যাঁহাদের হৃদয় পবিত্র, যাঁহাদের কার্য্য পবিত্র, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণ সংযত তাঁহাদিগের নিকটেই সেই আত্মা প্রকাশিত হয়েন।

আত্মা-সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপমা দেওয়া হইয়াছে। আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে রশ্মি এবং ইন্দ্রিয়গণকে অশ্ব বলিয়া জানিবে। যে রথে অশ্বগণ উত্তমরূপে সংযত থাকে, যে রথের লাগাম খুব মজবুত ও সারথির হস্তে দৃঢ়রূপে ধৃত থাকে, সেই রথই বিষ্ণুর সেই পরমপদে পৌঁছিতে পারে। কিন্তু যে রথে ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, মনরূপ রশ্মিও দৃঢ়ভাবে সংযত না থাকে, সেই রথ অবশেষে বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হয়। সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা চক্ষু অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হন না, কিন্তু যাঁহাদের মন পবিত্র হইয়াছে, তাঁহারাই তাঁহাকে দেখিতে পান। যিনি শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধের অতীত, যিনি অব্যয়, যাঁহার আদি-অন্ত নাই, যিনি প্রকৃতির অতীত অপরিণামী, তাঁহাকে তিনি উপলব্ধি করেন, তিনি মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হন। কিন্তু তাঁহাকে উপলব্ধি করা বড় কঠিন—এই পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। পথ বড় দীর্ঘ ও বিপৎসঙ্কুল, কিন্তু নিরাশ হইও না, দৃঢ়ভাবে গমন কর, 'উঠ, জাগো এবং যে পর্য্যন্ত না সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পার, সে পর্য্যন্ত নিবৃত্ত হইও না।'

এক্ষণে দেখিতেছি, সমুদয় উপনিষদের ভিতর প্রধান কথা এই

অপরোক্ষানুভূতি। এতৎসম্বন্ধে মনে সময়ে সময়ে নানা প্রশ্ন উঠিবে—বিশেষতঃ আধুনিক ব্যক্তিগণের ইহার উপকারিতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন আসিবে—আরও নানা সন্দেহ আসিবে, কিন্তু এই সকলগুলিকেই আমরা দেখিব, আমরা আমাদের পূর্ব্বসংস্কারের দ্বারা চালিত হইতেছি। আমাদের মনে এই পূর্ব্ব সংস্কারের অতিশয় প্রভাব। যাহারা বাল্যকাল হইতে কেবল সগুণ ঈশ্বরের এবং মনের ব্যক্তিগতত্বের কথা শুনিতেছে, তাহাদের পক্ষে পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অবশ্য অতি কর্কশ লাগিবে, কিন্তু যদি আমরা উহা শ্রবণ করি, আর যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া উহার চিন্তা করি, তবে উহারা আমাদের প্রাণে গাঁথিয়া যাইবে, আমরা আর ঐ সকল কথা শুনিয়া ভয় পাইব না। প্রধান প্রশ্ন অবশ্য দর্শনের উপকারিতা—কার্য্যকারিতা-সম্বন্ধে। উহার কেবল একই উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। যদি প্রয়োজনবাদীদের মতে সুখের অন্বেষণ করা অনেকের পক্ষে কর্ত্তব্য হয়, তবে আধ্যাত্মিক চিন্তায় যাহাদের সুখ, তাহারা কেন না আধ্যাত্মিক চিন্তায় সুখ অন্বেষণ করিবে? অনেকে বিষয়ভোগে সুখী হয় বলিয়া বিষয়-সুখের অন্বেষণ করে, কিন্তু আবার এমন অনেক লোক থাকিতে পারে, যাহারা উচ্চতর ভোগের অন্বেষণ করে। কুকুর সুখী কেবল আহার ও পানে। বৈজ্ঞানিক কিন্তু বিষয়সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল কতিপয় তারার অবস্থান জানিবার জন্য হয়ত কোন পর্ব্বতচূড়ায় বাস করিতেছেন; তিনি যে অপূর্ব্ব সুখের আস্বাদলাভ করিতেছেন, কুকুর তাহা বুঝিতে অক্ষম। কুকুর তাঁহাকে দেখিয়া হাস্য করিয়া তাঁহাকে পাগল বলিতে পারে! হয়ত বৈজ্ঞানিক বেচারার বিবাহ পর্য্যন্ত

করিবারও সঙ্গতি নাই। তিনি হয়ত কয়েক টুকরা রুটি ও একটু জল খাইয়াই পর্ব্বতচূড়ায় বসিয়া আছেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিক বলিলেন, "ভাই কুকুর, তোমার সুখ কেবল ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ; তুমি ঐ সুখ ভোগ করিতেছ। তুমি উহা হইতে উচ্চতর সুখ কিছুই জান না। কিন্তু আমার পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুখকর। আর যদি তোমার নিজের ভাবে সুখ-অন্বেষণের অধিকার থাকে, তবে আমারও আছে।" এইটুকু আমাদের ভ্রম হয় যে, আমরা সমুদয় জগৎকে আপনভাবে পরিচালিত করিতে চাই। আমরা আমাদের মনকেই সমুদয় জগতের মাপকাঠি করিতে চাই। তোমার পক্ষে ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিতেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখ কিন্তু আমার সুখও যে তাহাতেই হইবে, তাহার কোন অর্থ নাই। যখন তুমি ঐ বিষয় লইয়া জেদ কর, তখন তোমার সহিত আমার মতভেদ হয়। সাংসারিক হিতবাদীর সহিত ধর্ম্মবাদীর এই প্রভেদ। সাংসারিক হিতবাদী বলেন, "দেখ, আমি কেমন সুখী! আমার যৎকিঞ্চিৎ আছে, কিন্তু ও-সকল তত্ত্ব লইয়া আমি মাথা ঘামাই না। উহারা অনুসন্ধানের অতীত। ও-গুলির অন্বেষণে না যাইয়া আমি বেশ সুখে আছি।" বেশ, ভাল কথা। হিতবাদিগণ, তোমরা যাহাতে সুখে থাক, তাহা বেশ। কিন্তু এই সংসার বড় ভয়ানক। যদি কোন ব্যক্তি তাহার ভ্রাতার কোন অনিষ্ট না করিয়া সুখলাভ করিতে পারে, ঈশ্বর তাহার উন্নতি করেন। কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি আসিয়া আমাকে তাহার মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পরামর্শ দেয়, আর বলে—যদি এরূপ না কর, তবে তুমি মূর্খ; আমি বলি—তুমি ভ্রান্ত, কারণ তোমার পক্ষে যাহা

সুখকর তাহা যদি আমাকে করিতে হয়, আমি প্রাণধারণে সমর্থ হইব না। যদি আমাকে কয়েকখণ্ড সুবর্ণের জন্য ধাবিত হইতে হয়, তবে আমার জীবনধারণ করা বৃথা হইবে। ধার্ম্মিক ব্যক্তি হিতবাদীকে এই মাত্র উত্তর দিবেন। বাস্তবিক কথা এই, যাহাদের এই নিম্নতর ভোগবাসনা শেষ হইয়াছে তাহাদের পক্ষেই ধর্ম্মাচরণ সম্ভব। আমাদিগকে ভোগ করিয়া ঠেকিয়া শিখিতে হইবে, যতদূর আমাদের দৌড়, দৌড়াইয়া লইতে হইবে। যখন আমাদের ইহসংসারে দৌড় নিবৃত্ত হয়, তখনই আমাদের দৃষ্টির সমক্ষে পরলোক প্রতিভাত হইতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ সমস্যা আমার মনে উদিত হইতেছে। কথাটা শুনিতে খুব কর্কশ বটে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সত্য কথা। এই বিষয়ভোগবাসনা কখন কখন আর এক রূপ ধারণ করিয়া উদিত হয়—তাহাতে বড় বিপদাশঙ্কা আছে, অথচ উহা আপাতরমণীয়। একথা তুমি সকল সময়েই শুনিতে পাইবে। অতি প্রাচীনকালেও এই ধারণা ছিল—ইহা প্রত্যেক ধর্ম্মবিশ্বাসেরই অন্তর্গত। উহা এই যে, এমন এক সময় আসিবে যখন জগতের সকল দুঃখ চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার সুখগুলিই অবশিষ্ট থাকিবে, আর পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইয়া যাইবে। আমি এ কথা বিশ্বাস করি না। আমাদের পৃথিবী যেমন তেমনই থাকিবে। অবশ্য এ কথা বলা বড় ভয়ানক বটে, কিন্তু এ কথা না বলিয়া ত আর পথ দেখিতেছি না। ইহা বাতরোগের মত। মস্তক হইতে তাড়াইয়া দাও, উহা পায়ে যাইবে। ঐ স্থান হইতে তাড়াইয়া দিলে, অন্য স্থানে যাইবে। যাহা কিছু কর না কেন,

উহা কোনমতে সম্পূর্ণ দূর হইবে না। দুঃখও এইরূপ। অতি প্রাচীনকালে লোকে বনে বাস করিত এবং পরস্পরকে মারিয়া খাইয়া ফেলিত। বর্ত্তমানকালে পরস্পর পরস্পরের মাংস খায় না বটে, কিন্তু পরস্পরকে প্রবঞ্চনা করিয়া থাকে। লোকে প্রতারণা করিয়া নগরকে নগর, দেশকে দেশ ধ্বংস করিয়া ফেলিতেছে। অবশ্য ইহা বড় বেশী উন্নতির পরিচায়ক নহে। আর তোমরা যাহাকে উন্নতি বল, তাহাও ত আমি বড় বুঝিয়া উঠিতে পারি না—উহা ত বাসনার ক্রমাগত বৃদ্ধিমাত্র। যদি আমার কোন বিষয় অতি সুস্পষ্টরূপে বোধ হয়, তাহা এই যে, বাসনাতে কেবল দুঃখই আনয়ন করে—উহা ত যাচকের অবস্থা মাত্র। সর্ব্বদাই কিছুর জন্য যাচ্ঞা—কোন দোকানে গিয়া কিছু দেখিয়া তৃপ্তি হইতে পারে না—অমনি কিছু পাইবার ইচ্ছা হয়, কেবল চাই—চাই—সব জিনিস চাই। সমুদয় জীবনটি কেবল তৃষ্ণাগ্রস্ত যাচকের অবস্থা—বাসনার দুরপনেয় তৃষ্ণা। যদি বাসনা পূরণ করিবার শক্তি যোগখড়ির নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হয়, তবে বাসনার শক্তি গুণখড়ির নিয়মানুসারে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অনন্ত জগতের সমুদয় সুখদুঃখের সমষ্টি সর্ব্বদাই সমান। সমুদ্রে যদি একটি তরঙ্গ কোথাও উত্থিত হয়, আর কোথাও নিশ্চয়ই একটি গর্ত্ত উৎপন্ন হইবে। যদি কোন মানুষের সুখ উৎপন্ন হয়, তবে নিশ্চয়ই অপর কোন মানুষের অথবা কোন পশুর দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মানুষের সংখ্যা বাড়িতেছে—পশুর সংখ্যা হ্রাস হইতেছে। আমরা তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ভূমি কাড়িয়া লইতেছি; আমরা তাহাদের

সমুদয় খাদ্যদ্রব্য কাড়িয়া লইতেছি। তবে কেমন করিয়া বলিব—সুখ ক্রমাগত বাড়িতেছে? প্রবল জাতি দুর্ব্বল জাতিকে গ্রাস করিতেছে, কিন্তু তোমরা কি মনে কর প্রবল জাতি বড় সুখী হইবে? না, তাহারা আবার পরস্পরকে সংহার করিবে। কিরূপে সুখের যুগ আসিবে, তাহা ত আমি বুঝিতে পারি না। এ ত প্রত্যক্ষের বিষয়। আনুমানিক বিচার দ্বারাও আমি দেখিতে পাই, ইহা কখনও হইবার নয়।

পূর্ণতা সর্ব্বদাই অনন্ত। আমরা বাস্তবিক সেই অনন্তস্বরূপ—সেই নিজস্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। তুমি, আমি সকলেই সেই নিজ নিজ অনন্ত স্বরূপ অভিব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছি মাত্র। এ পর্য্যন্ত বেশ কথা, কিন্তু ইহা হইতে কয়েকজন জার্ম্মান দার্শনিক বড় এক অদ্ভুত দার্শনিক সিদ্ধান্ত বাহির করিবার চেষ্টা করিয়াছেন—তাহা এই যে, এইরূপে অনন্ত ক্রমশঃ অধিক হইতে অধিকতর ব্যক্ত হইতে থাকিবেন, যতদিন না আমরা পূর্ণ ব্যক্ত হই, যতদিন না আমরা সকলে পূর্ণপুরুষ হইতে পারি। পূর্ণ অভিব্যক্তির অর্থ কি? পূর্ণতার অর্থ অনন্ত, আর অভিব্যক্তির অর্থ সীমা—অতএব ইহার এই তাৎপর্য্য দাঁড়াইল যে, আমরা অসীমভাবে সসীম হইব—একথা ত অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। শিশুগণ এ মতে সন্তুষ্ট হইতে পারে; ছেলেদের সন্তুষ্ট করিবার জন্য, তাহাদিগকে সখের ধর্ম্ম দিবার জন্য, ইহা বেশ উপযোগী বটে, কিন্তু ইহাতে তাহাদিগকে মিথ্যাবিষে জর্জ্জরিত করা হয়—ধর্ম্মের পক্ষে ইহা মহাহানিকর। আমাদের জানা উচিত, জগৎ এবং মানব—ঈশ্বরের

অবনত ভাবমাত্র; তোমাদের বাইবেলেও আছে—আদম প্রথমে পূর্ণ মানব ছিলেন, পরে ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এমন কোন ধর্ম্মই নাই যাহাতে বলে না যে, মানব পূর্ব্বাবস্থা হইতে হীনাবস্থায় পতিত হইয়াছে। আমরা হীন হইয়া পশু হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমরা আবার উন্নতির পথে যাইতেছি, এই বন্ধন হইতে বাহির হইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু আমরা কখনও অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে পারিব না। আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিতে পারি, কিন্তু দেখিব ইহা অসম্ভব। তখন এমন এক সময় আসিবে যখন আমরা দেখিব যে, যতদিন আমরা ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আবদ্ধ, ততদিন পূর্ণতালাভ অসম্ভব। তখন আমরা যে দিকে অগ্রসর হইতেছিলাম, সেই দিক হইতে ফিরিয়া পশ্চাদ্দিকে যাত্রা আরম্ভ করিব।

ইহারই নাম ত্যাগ। তখন আমরা যে জালের ভিতর পড়িয়াছিলাম, তাহা হইতে আমাদের বাহির হইতে হইবে—তখনই নীতি ও দয়াধর্ম্ম আরম্ভ হইবে। সমুদয় নৈতিক অনুশাসনের মূলমন্ত্র কি? 'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু।' আমাদের পশ্চাদ্দেশে যে অনন্ত রহিয়াছেন, তিনি আপনাকে বহির্জগতে ব্যক্ত করিতে গিয়া এই 'অহং'-এর আকার ধারণ করিয়াছেন। তাহা হইতেই এই ক্ষুদ্র 'আমি'-'তুমি'র উৎপত্তি। অভিব্যক্তির চেষ্টায় এই ফলের উৎপত্তি—এক্ষণে এই 'আমি'কে আবার পিছু হটিয়া গিয়া উহার নিজ স্বরূপ অনন্তে মিশিতে হইবে। তিনি বুঝিবেন, তিনি এতদিন বৃথা চেষ্টা করিতেছিলেন। তিনি আপনাকে চক্রে ফেলিয়াছেন—তাঁহাকে ঐ চক্র হইতে বাহির

হইতে হইবে। প্রতিদিনই ইহা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে। যতবার তুমি বল—'নাহং নাহং, তুঁহু তুঁহু,' ততবারই ফিরিবার চেষ্টা কর, আর যতবার তুমি অনন্তকে এখানে অভিব্যক্ত করিতে চেষ্টা কর, ততবারই তোমাকে বলিতে হয়—'অহং অহং, ন ত্বং।' ইহা হইতে জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, সংঘর্ষ ও অনিষ্টের উৎপত্তি, কিন্তু অবশেষে ত্যাগ—অনন্ত ত্যাগ আরম্ভ হইবেই হইবে। 'আমি' মরিয়া যাইবে। আমার জীবনের জন্য তখন কে যত্ন করিবে? এখানে থাকিয়া এই জীবন সম্ভোগ করিবার যে-সমস্ত বৃথা বাসনা, আবার তারপর স্বর্গে গিয়া এইরূপভাবে থাকিবার বাসনা—সর্ব্বদা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়সুখে লিপ্ত থাকিবার বাসনাই মৃত্যু আনয়ন করে।

যদি আমরা পশুগণের উন্নত অবস্থামাত্র হই, তবে যে বিচারে ঐ সিদ্ধান্ত লব্ধ হইল, তাহা হইতে ইহাও সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, পশুগণ মানুষের অবনত অবস্থামাত্র। তুমি কেমন করিয়া জানিলে তাহা নয়? তোমরা জান—ক্রমবিকাশবাদের প্রমাণ কেবল ইহাই যে, নিম্নতম হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত সকল দেহই পরস্পর সদৃশ; কিন্তু উহা হইতে তুমি কি করিয়া সিদ্ধান্ত কর যে, নিম্নতম প্রাণী হইতে ক্রমশঃ উচ্চতম প্রাণী জন্মিয়াছে—উচ্চতম হইতে ক্রমশঃ নিম্নতম নহে? দুই দিকেই সমান যুক্তি—আর যদি এই মতবাদে বাস্তবিক কিছু সত্য থাকে, তবে আমার বিশ্বাস এই যে, একবার নিম্ন হইতে উচ্চে, আবার উচ্চ হইতে নিম্নে যাইতেছে—ক্রমাগত এই দেহশ্রেণীর আবর্ত্তন হইতেছে। ক্রমসঙ্কোচবাদ স্বীকার না করিলে ক্রমবিকাশবাদ কিরূপে সত্য হইতে পারে?

যাহা হউক, আমি যে কথা বলিতেছিলাম যে, মানুষের ক্রমাগত অনন্ত উন্নতি হইতে পারে না, তাহা ইহা হইতে বেশ বুঝা গেল।

অবশ্য 'অনন্ত' জগতে অভিব্যক্ত হইতে পারে, ইহা আমাকে যদি কেহ বুঝাইয়া দিতে পারে তবে তাহা বুঝিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমরা ক্রমাগত সরলরেখায় উন্নতি করিয়া চলিতেছি, এ কথা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না। ইহা অসম্বদ্ধ প্রলাপমাত্র। সরলরেখায় কোন গতি হইতে পারে না। যদি তুমি তোমার সম্মুখদিকে একটি প্রস্তর নিক্ষেপ কর, তবে এমন এক সময় আসিবে যখন উহা ঘুরিয়া বৃত্তাকারে তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে। তোমরা কি গণিতের সেই স্বতঃসিদ্ধ পড় নাই যে, সরলরেখা অনন্তরূপে বর্দ্ধিত হইলে বৃত্তাকার ধারণ করে? অবশ্যই ইহা এইরূপই হইবে, তবে হয়ত পথে ঘুরিবার সময় একটু এদিক ওদিক হইতে পারে। এই কারণে আমি সর্ব্বদাই প্রাচীন ধর্ম্ম-সকলের মতই ধরিয়া থাকি—যখন দেখি কি খ্রীষ্ট, কি বুদ্ধ, কি বেদান্ত, কি বাইবেল, সকলেই বলিতেছেন—এই অপূর্ব্ব জগৎকে ত্যাগ করিয়াই কালে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব। এই জগৎ কিছুই নয়। খুব জোর, উহা সেই সত্যের একটি ভয়ানক বিসদৃশ অনুকৃতি—ছায়ামাত্র। সকল অজ্ঞান ব্যক্তিই এই ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগ করিবার জন্য দৌড়িতেছে।

ইন্দ্রিয়ে আসক্ত হওয়া খুব সহজ। আরও সহজ—আমাদের প্রাচীন অভ্যাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া কেবল আহারপানে মত্ত থাকা। কিন্তু আমাদের আধুনিক দার্শনিকেরা চেষ্টা করেন, এই-সকল সুখকর ভাব লইয়া তাহার উপর ধর্ম্মের ছাপ দিতে। কিন্তু ঐ

মত সত্য নহে। ইন্দ্রিয়ের মৃত্যু বিদ্যমান—আমাদিগকে মৃত্যুর অতীত হইতে হইবে। মৃত্যু কখন সত্য নহে। ত্যাগই আমাদিগকে সত্যে লইয়া যাইবে। নীতির অর্থই ত্যাগ। আমাদের প্রকৃত জীবনের প্রতি অংশই ত্যাগ। আমরা জীবনের সেই সেই মুহূর্ত্তেই বাস্তবিক সাধুভাবাপন্ন হই এবং প্রকৃত জীবন সম্ভোগ করি, যে যে মুহূর্ত্তে আমরা 'আমি'র চিন্তা হইতে বিরত হই। 'আমি'র যখন বিনাশ হয়—আমাদের ভিতরের 'প্রাচীন মনুষ্যের' মৃত্যু হয়, তখনই আমরা সত্যে উপনীত হই। আর বেদান্ত বলেন—সেই সত্যই ঈশ্বর, তিনিই আমাদের প্রকৃত স্বরূপ—তিনি সর্ব্বদাই তোমার সহিত, শুধু তাহাই নহে, তোমাতেই রহিয়াছেন। তাঁহাতেই সর্ব্বদা বাস কর। যদিও ইহা বড় কঠিন বোধ হয়, তথাপি ক্রমশঃ ইহা সহজ হইয়া আসিবে। তখন তুমি দেখিবে, তাঁহাতে অবস্থানই একমাত্র আনন্দপূর্ণ অবস্থা—আর সকল অবস্থাই মৃত্যু। আত্মার ভাবে পূর্ণ থাকাই জীবন—আর সকল ভাবই মৃত্যুমাত্র। আমাদের বর্ত্তমান সমুদয় জীবনটাকে কেবল শিক্ষার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বলিতে পারা যায়। প্রকৃত জীবন লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে ইহার বাহিরে যাইতে হইবে।

# আত্মার মুক্তস্বভাব

আমরা পূর্ব্বে যে কঠোপনিষদের আলোচনা করিতেছিলাম, তাহা আমরা এক্ষণে যাহার আলোচনা করিব, সেই ছান্দোগ্য-রচনার অনেক পরে রচিত হইয়াছিল। কঠোপনিষদের ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক, উহার চিন্তাপ্রণালীও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রণালীবদ্ধ। প্রাচীনতর উপনিষদ্‌গুলির ভাষা আর একরূপ, অতি প্রাচীন—অনেকটা বেদের সংহিতাভাগের ভাষার মত। আবার উহার মধ্যে, অনেক সময় অনেক অনাবশ্যক বিষয়ের মধ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়া তবে উহার ভিতরের সার মতগুলিতে আসিতে হয়। এই প্রাচীন উপনিষদ্‌টিতে কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদাংশের যথেষ্ট প্রভাব আছে—এই কারণে ইহার অর্দ্ধাংশের উপর এখনও কর্ম্মকাণ্ডাত্মক। কিন্তু অতি প্রাচীন উপনিষদ্‌গুলি-পাঠে একটি মহালাভ হইয়া থাকে। সেই লাভ এই যে, ঐগুলি অধ্যয়ন করিলে আধ্যাত্মিক ভাবগুলির ঐতিহাসিক বিকাশ বুঝিতে পারা যায়। অপেক্ষাকৃত আধুনিক উপনিষদ্‌গুলিতে আধ্যাত্মিক তত্ত্বগুলি একত্র সংগৃহীত ও সজ্জিত—উদাহরণস্থলে আমরা ভগবদ্গীতার উল্লেখ করিতে পারি। এই ভগবদ্গীতাকে সর্ব্বশেষ উপনিষদ্ বলিয়া ধরা যাইতে পারে, উহাতে কর্ম্মকাণ্ডের লেশমাত্রও নাই। গীতার প্রতি শ্লোক কোন-না-কোন উপনিষদ্ হইতে সংগৃহীত—যেন কতকগুলি পুষ্প লইয়া একটি তোড়া নির্ম্মিত

হইয়াছে। কিন্তু উহাতে তুমি ঐসকল তত্ত্বের ক্রমবিকাশ দেখিতে পাইবে না। এই আধ্যাত্মিক তত্ত্বের ক্রমবিকাশ বুঝিবার সুবিধাই অনেকে বেদপাঠের একটি বিশেষ উপকারিতা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাস্তবিকও উহা সত্য কথা; কারণ বেদকে লোকে এরূপ পবিত্রতার চক্ষে দেখে যে, জগতের অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতর যেরূপ নানাবিধ গোঁজামিল চলিয়াছে, বেদে তাহা হইতে পায় নাই। বেদে খুব উচ্চতম চিন্তা, আবার অতি নিম্নতম চিন্তার সমাবেশ—সার, অসার, অতি উন্নত চিন্তা, আবার সামান্য খুঁটিনাটি, সকলই সন্নিবেশিত আছে, কেহই উহার কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে সাহস করে নাই। অবশ্য টীকাকারেরা আসিয়া ব্যাখ্যার বলে অতি প্রাচীন বিষয়সমূহ হইতে অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন ভাবসকল বাহির করিতে আরম্ভ করিলেন বটে, সাধারণ অনেক বর্ণনার ভিতরে তাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল দেখিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু মূল যেমন তেমনই রহিয়া গেল—এই মূলের ভিতর ঐতিহাসিক গবেষণার বিষয় যথেষ্ট আছে। আমরা জানি, লোকের চিন্তাশক্তি যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই তাহারা ধর্ম্মসকলের পূর্ব্বভাব পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাতে নূতন নূতন উচ্চ ভাবের সংযোজন করিতে থাকে। এখানে একটি, ওখানে একটি নূতন কথা বসান হয়—কোথাও বা এক-আধটি কথা উঠাইয়া দেওয়া হয়—তারপর টীকাকারেরা ত আছেনই। সম্ভবতঃ বৈদিক সাহিত্যে এরূপ কখন করা হয় নাই—আর যদি হইয়া থাকে তাহা আদপেই ধরা যায় না। আমাদের ইহাতে লাভ এই যে, আমরা চিন্তার মূল উৎপত্তিস্থলে যাইতে পারি—দেখিতে পাই,

কি করিয়া ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর চিন্তার, কি করিয়া স্থূল আধিভৌতিক ধারণাসকল হইতে সূক্ষ্মতর আধ্যাত্মিক ধারণাসকলের বিকাশ হইতেছে—অবশেষে কিরূপে বেদান্তে উহাদের চরম পরিণতি হইয়াছে। বৈদিক সাহিত্যে অনেক প্রাচীন আচার-ব্যবহারেরও আভাস পাওয়া যায়, তবে উপনিষদে ঐসকলের বর্ণনা বড় বেশী নাই। উহা এমন এক ভাষায় লিখিত যাহা খুব সংক্ষিপ্ত এবং খুব সহজে মনে রাখা যাইতে পারে।

এই গ্রন্থের লেখকগণ কেবল কতকগুলি ঘটনা স্মরণ রাখিবার উপায়স্বরূপ যেন লিখিতেছেন—তাঁহাদের যেন ধারণা—এসকল কথা সকলেই জানে; ইহাতে মুশকিল হয় এইটুকু যে, আমরা উপনিষদে লিখিত গল্পগুলির বাস্তবিক তাৎপর্য্য সংগ্রহ করিতে পারি না। ইহার কারণ এই—ঐগুলি যাঁহাদিগের সময়ের লেখা, তাঁহারা অবশ্য ঘটনাগুলি জানিতেন, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের কিংবদন্তী পর্য্যন্ত নাই—আর যা একটু আধটু আছে, তাহা আবার অতিরঞ্জিত হইয়াছে। তাহাদের এত নূতন ব্যাখ্যা হইয়াছে যে, যখন আমরা পুরাণে তাহাদের বিবরণ পাঠ করি, তখন দেখিতে পাই তাহারা উচ্ছ্বাসাত্মক কাব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য প্রদেশে যেমন আমরা পাশ্চাত্ত্য জাতির রাজনৈতিক উন্নতি বিষয়ে একটি বিশেষ ভাব লক্ষ্য করি, তাহারা কোনপ্রকার অনিয়ন্ত্রিত শাসন সহ্য করিতে পারে না, তাহারা কোনপ্রকার বন্ধন—কেহ তাহাদের উপর শাসন করিতেছে ইহা সহ্য করিতেই পারে না, তাহারা যেমন ক্রমশঃ উচ্চ হইতে

উচ্চতর প্রজাতন্ত্র-শাসনপ্রণালীর উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে, বাহ্য স্বাধীনতার উচ্চ হইতে উচ্চতর ধারণা লাভ করিতেছে, দর্শনেও ঠিক সেইরূপ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে, তবে এ আধ্যাত্মিক জীবনের স্বাধীনতা—এইমাত্র প্রভেদ। বহু-দেববাদ হইতে ক্রমশঃ লোকে একেশ্বরবাদে উপনীত হয়—উপনিষদে আবার যেন এই একেশ্বরের বিরুদ্ধে সমরঘোষণা হইয়াছে। জগতের অনেক শাসনকর্ত্তা তাঁহাদের অদৃষ্ট নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, শুধু এই ধারণাই তাঁহাদের অসহ্য হইল তাহা নহে, একজন তাঁহাদের অদৃষ্টের বিধাতা হইবেন, এ ধারণাও তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। উপনিষদ্ আলোচনা করিতে গিয়া এইটিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। এই ধারণা ধীরে ধীরে বাড়িয়া অবশেষে উহার চরম পরিণতি হইয়াছে। প্রায় সকল উপনিষদেই অবশেষে আমরা এই পরিণতি দেখিতে পাই। তাহা এই যে—জগদীশ্বরকে সিংহাসনচ্যুতকরণ। ঈশ্বরের সগুণ ধারণা গিয়া নির্গুণ ধারণা উপস্থিত হয়। ঈশ্বর তখন জগতের শাসনকর্ত্তা একজন ব্যক্তি থাকেন না—তিনি তখন আর একজন অনন্তগুণসম্পন্ন মনুষ্যধর্ম্মবিশিষ্ট নন, তিনি তখন ভাবমাত্র, এক পরম তত্ত্বমাত্ররূপে জ্ঞাত হন, আমাদিগের ভিতর, জগতের সকল প্রাণীর ভিতর, এমন কি সমুদয় জগতে সেই তত্ত্ব ওতপ্রোতভাবে বিরাজিত। আর অবশ্য যখন ঈশ্বরের সগুণ ধারণা হইতে নির্গুণ ধারণায় পঁহুছান গেল, তখন মানুষও আর সগুণ থাকিতে পারে না। অতএব মানুষের সগুণত্বও উড়িয়া গেল—মানুষও একটি তত্ত্বমাত্র। সগুণ ব্যক্তি বহির্দ্দেশে

বিরাজিত—প্রকৃত তত্ত্ব অন্তর্দ্দেশে, পশ্চাতে। এইরূপে উভয় দিক হইতেই ক্রমশঃ সগুণত্ব চলিয়া যাইতে এবং নির্গুণত্বের আবির্ভাব হইতে থাকে। সগুণ ঈশ্বরের ক্রমশঃ নির্গুণ ধারণা—এবং সগুণ মানুষেরও নির্গুণ মানুষভাব আসিতে থাকে—তখন এই দুই দিকে বিভিন্ন ভাবে প্রবাহিত দুইটি ধারার বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। আর উপনিষদ্ এই দুইটি ধারা যে-যে ক্রমে ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া মিলিয়া যায় তাহার বর্ণনাতে পরিপূর্ণ এবং প্রত্যেক উপনিষদের শেষ কথা—'তত্ত্বমসি'। একমাত্র নিত্য আনন্দময় পুরুষই কেবল আছেন, আর সেই পরমতত্ত্বই এই জগৎরূপে বহুধা প্রকাশ পাইতেছেন।

এইবার দার্শনিকেরা আসিলেন। উপনিষদের কার্য্য এইখানেই ফুরাইল—দার্শনিকেরা তাহার পর অন্যান্য প্রশ্ন লইয়া বিচার আরম্ভ করিলেন। উপনিষদে মুখ্য কথাগুলি পাওয়া গেল—বিস্তারিত ব্যাখ্যা, বিচার দার্শনিকদিগের জন্য রহিল। স্বভাবতঃই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে নানা প্রশ্ন মনে উদিত হয়। যদিই স্বীকার করা যায়, এক নির্গুণত্বই পরিদৃশ্যমান নানারূপে প্রকাশ পাইতেছে, তাহা হইলে এই জিজ্ঞাস্য—এক কেন বহু হইল? এ সেই প্রাচীন প্রশ্ন—যাহা মানুষের অমার্জ্জিত বুদ্ধিতে স্থূলভাবে উদিত হয়—জগতে দুঃখ অশুভ রহিয়াছে কেন? সেই প্রশ্নটিই স্থূলভাবে পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। এখন আর আমাদের বাহ্যদৃষ্টি, ঐন্দ্রিয়িক দৃষ্টি হইতে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইতেছে না, এখন ভিতর হইতে দার্শনিক দৃষ্টিতে ঐ প্রশ্নের বিচার। কেন সেই এক তত্ত্ব বহু হইল? আর উহার

উত্তর—সর্ব্বোত্তম উত্তর—ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার উত্তর—মায়াবাদ; বাস্তবিক উহা বহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় নাই। এই বহুত্ব কেবল আপাত-প্রতীয়মান মাত্র, মানুষ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছেন, কিন্তু বাস্তবিক তিনি নির্গুণ। ঈশ্বরও আপাততঃ সগুণ বা ব্যক্তিরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন, বাস্তবিক তিনি এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অবস্থিত নির্গুণ পুরুষ।

এই উত্তরও একেবারে আসে নাই, ইহারও বিভিন্ন সোপান আছে। এই উত্তর সম্বন্ধে দার্শনিকগণের ভিতর মতভেদ আছে। মায়াবাদ ভারতীয় সকল দার্শনিকের সম্মত নহে। সম্ভবতঃ তাঁহাদের অধিকাংশই এ মত স্বীকার করেন নাই। দ্বৈতবাদীরা আছেন—তাঁহাদের মত দ্বৈতবাদ—অবশ্য তাঁহাদের ঐ মত বড় উন্নত বা মাৰ্জ্জিত নহে। তাঁহারা এই প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিতে দিবেন না—তাঁহারা ঐ প্রশ্নের উদয় হইতে না হইতে উহাকে চাপিয়া দেন। তাঁহারা বলেন, তোমার এরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার নাই—কেন এরূপ হইল, ইহার ব্যাখ্যা জিজ্ঞাসা করিবার তোমার কিছুমাত্র অধিকার নাই। উহা ঈশ্বরের ইচ্ছা—আমাদিগকে শান্তভাবে উহা সহ্য করিয়া যাইতে হইবে। জীবাত্মার কিছুমাত্র স্বাধীনতা নাই। সমুদয়ই পূর্ব্ব হইতে নির্দিষ্ট—আমরা কি করিব, আমাদের কি কি অধিকার, কি কি সুখ-দুঃখ ভোগ করিব, সবই পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দিষ্ট আছে; আমাদের কর্ত্তব্য—ধীরভাবে সেইগুলি ভোগ করিয়া যাওয়া। যদি তাহা না করি, আমরা আরও অধিক কষ্ট পাইব মাত্র।

কেমন করিয়া তুমি ইহা জানিলে?—বেদ বলিতেছেন। তাঁহারাও বেদের শ্লোক উদ্ধৃত করেন; তাঁহাদের মতসম্মত বেদের অর্থও আছে; তাঁহারা সেইগুলিই প্রমাণ বলিয়া সকলকে তাহা মানিতে বলেন এবং তদনুসারে উপদেশ দেন।

আর অনেক দার্শনিক আছেন, তাঁহারা মায়াবাদ স্বীকার না করিলেও তাঁহাদের মত মায়াবাদী ও দ্বৈতবাদিগণের মাঝামাঝি। তাঁহারা পরিণামবাদী। তাঁহারা বলেন, জীবাত্মার উন্নতি ও অবনতি—বিভিন্ন পরিণামই—জগতের প্রকৃত ব্যাখ্যা। তাঁহারা রূপকভাবে বর্ণন করেন, সকল আত্মাই একবার সঙ্কোচ আবার বিকাশপ্রাপ্ত হইতেছে। সমুদয় জগৎ যেন ভগবানের শরীর। ঈশ্বর সমুদয় প্রকৃতির এবং সকল আত্মার আত্মস্বরূপ। সৃষ্টির অর্থে ঈশ্বরের স্বরূপের বিকাশ—কিছুকাল এই বিকাশ চলিয়া আবার সঙ্কোচ হইতে থাকে। প্রত্যেক জীবাত্মার পক্ষে এই সঙ্কোচের কারণ অসৎকর্ম্ম। মানুষ অসৎকার্য্য করিলে, তাহার আত্মার শক্তি ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে থাকে—যতদিন না সে আবার সৎকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে। তখন আবার উহার বিকাশ হইতে থাকে। ভারতীয় এই সকল বিভিন্ন মতের ভিতর—এবং আমার মনে হয়, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে জগতের সকল মতের ভিতরই—একটি সাধারণ ভাব দেখিতে পাওয়া যায়, আমি উহাকে 'মানুষের দেবত্ব' বা 'ঈশ্বরত্ব' বলিতে ইচ্ছা করি। জগতে এমন কোন মত নাই, প্রকৃত ধর্ম্ম নামের উপযুক্ত এমন কোন ধর্ম্ম নাই, যাহা কোন-না-কোনরূপে—পৌরাণিক বা রূপকভাবে হউক অথবা দর্শনের মার্জ্জিত সুস্পষ্ট ভাষায় হউক, এই ভাব

প্রকাশ না করেন যে জীবাত্মা যাহাই হউন অথবা ঈশ্বরের সহিত উহার সম্বন্ধ যাহাই হউক, উনি স্বরূপতঃ শুদ্ধস্বভাব ও পূর্ণ। ইহা তাঁহার প্রকৃতিগত পূর্ণানন্দ ও ঐশ্বর্য্য, তাঁহার প্রকৃতি দুঃখ বা অনৈশ্বর্য্য নহে। এই দুঃখ কোনরূপে তাঁহাতে আসিয়া পড়িয়াছে। অমার্জ্জিত মতসকল এই অশুভের ব্যক্তিত্ব কল্পনা করিয়া, শয়তান বা আহ্রিমান এই অশুভসকলের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া অশুভের অস্তিত্বের ব্যাখ্যা করিতে পারে। অন্যান্য মতে একাধারে ঈশ্বর ও শয়তান দুইয়ের ভাব আরোপ করিতে পারে এবং কোনরূপ যুক্তি না দিয়াই বলিতে পারে, তিনি কাহাকেও সুখী, কাহাকেও বা দুঃখী করিতেছেন। আবার অপেক্ষাকৃত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ মায়াবাদ প্রভৃতি দ্বারা উহা ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু একটি বিষয় সকল মতগুলিতেই অতি স্পষ্টভাবে প্রকাশিত—উহা আমাদের প্রস্তাবিত বিষয়—আত্মার মুক্তস্বভাব। এই সকল দার্শনিক মত ও প্রণালীগুলি কেবল মনের ব্যায়াম—বুদ্ধির চালনামাত্র। একটি মহৎ উজ্জ্বল ধারণা—যাহা আমার নিকট অতি স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয় এবং যাহা সকল দেশের ও সকল ধর্ম্মের কুসংস্কাররাশির মধ্য দিয়া প্রকাশ পাইতেছে, তাহা এই যে, মানুষ দেবস্বভাব, দেবভাবই আমাদের স্বভাব—আমরা ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত বলেন, অন্য যাহা কিছু তাহা উহার উপাধিস্বরূপ মাত্র। কিছু যেন তাঁহার উপর আরোপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার দেবস্বভাবের কিছুতেই বিনাশ হয় না। অতিশয় সাধু প্রকৃতিতে যেমন, অতিশয় পতিত ব্যক্তিতেও তেমনই উহা বর্ত্তমান।

ঐ দেবস্বভাবের উদ্বোধন করিতে হইবে, তবে উহার কার্য্য হইতে থাকিবে। উহাকে আমাদিগের আহ্বান করিতে হইবে, তবে উহা প্রকাশিত হইবে। প্রাচীনেরা ভাবিতেন, চকমকি-প্রস্তরে অগ্নি বাস করে, সেই অগ্নিকে বাহির করিতে হইলে কেবল ইস্পাতের ঘর্ষণ আবশ্যক। অগ্নি দুই খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে বাস করে, ঘর্ষণ আবশ্যক কেবল উহাকে প্রকাশ করিবার জন্য। অতএব এই অগ্নি—এই স্বাভাবিক মুক্তভাব ও পবিত্রতা প্রত্যেক আত্মার স্বভাব, আত্মার গুণ নহে; কারণ গুণ উপার্জ্জন করা যাইতে পারে, সুতরাং উহা আবার নষ্টও হইতে পারে। মুক্তি বা মুক্তস্বভাব বলিতে যাহা বুঝায়, আত্মা বলিতেও তাহাই বুঝায়—এইরূপ সত্তা বা অস্তিত্ব এবং জ্ঞানও আত্মার স্বরূপ—আত্মার সহিত অভেদ। এই সৎ চিৎ আনন্দ আত্মার স্বভাব, আত্মার জন্মপ্রাপ্ত অধিকারস্বরূপ, আমরা যে-সকল অভিব্যক্তি দেখিতেছি, তাহারা আত্মার স্বরূপের বিভিন্ন প্রকারমাত্র—উহা কখন বা আপনাকে মৃদু, কখনও বা উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ করিতেছে। এমন কি, মৃত্যু বা বিনাশও সেই প্রকৃত সত্তার প্রকাশমাত্র। জন্ম-মৃত্যু, ক্ষয়-বৃদ্ধি, উন্নতি-অবনতি—সকলই সেই এক খণ্ড সত্তার বিভিন্ন প্রকাশমাত্র। এইরূপ আমাদের সাধারণ জ্ঞানও—উহা বিদ্যা বা অবিদ্যা যেরূপেই প্রকাশিত হউক না, সেই চিতের, সেই জ্ঞানস্বরূপেরই প্রকাশমাত্র; উহাদের বিভিন্নতা প্রকারগত নয়, পরিমাণগত। ক্ষুদ্র কীট, যাহা তোমার পাদদেশের নিকট বেড়াইতেছে, তাহার জ্ঞান এবং স্বর্গের শ্রেষ্ঠতম দেবতার জ্ঞানে প্রভেদ প্রকারগত নহে, পরিমাণগত।

এই কারণে বৈদান্তিক মনীষিগণ নির্ভয়ে বলেন যে, আমাদের জীবনে আমরা যে-সকল সুখভোগ করি, এমন কি, অতি ঘৃণিত আনন্দ পর্য্যন্ত আত্মার স্বরূপভূত সেই এক ব্রহ্মানন্দের প্রকাশমাত্র।

এই ভাবটিই বেদান্তের সর্ব্বপ্রধান ভাব বলিয়া বোধ হয়; আর আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমার বোধ হয় সকল ধর্ম্মেরই এই মত। আমি এমন কোন ধর্ম্মের কথা জানি না, যাহার মূলে এই মত নাই। সকল ধর্ম্মের ভিতরেই এই সার্ব্বভৌম ভাব রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ বাইবেলের কথা ধর—উহাতে রূপকভাবে বর্ণিত আছে, প্রথম মানব আদম অতি পবিত্রস্বভাব ছিলেন, অবশেষে তাঁহার অসৎ কার্য্যের দ্বারা তাঁহার ঐ পবিত্রতা নষ্ট হইল। এই রূপকবর্ণনা হইতে প্রমাণ হয় যে, ঐ গ্রন্থলেখক বিশ্বাস করিতেন যে, আদিম মানবের (অথবা তাঁহারা উহা যেরূপভাবেই বর্ণনা করিয়া থাকুক না কেন) অথবা প্রকৃত মানবের স্বরূপ প্রথম হইতেই পূর্ণ ছিল। আমরা যে-সকল দুর্ব্বলতা দেখিতেছি, আমরা যে-সকল অপবিত্রতা দেখিতেছি তাহারা উহার উপর আরোপিত আবরণ বা উপাধিমাত্র এবং সেই ধর্ম্মেরই পরবর্ত্তী ইতিহাস ইহা দেখাইতেছে—তাঁহারা সেই পূর্ব্ব অবস্থা পুনরায় লাভ করিবার সম্ভাবনায়, শুধু তাহাই নহে, তাহার নিশ্চয়তায় বিশ্বাস করেন। প্রাচীন ও নব সংহিতা লইয়া সমগ্র বাইবেলের এই ইতিহাস। মুসলমানদের সম্বন্ধেও এইরূপ। তাঁহারাও আদম ও আদমের জন্মপবিত্রতায় বিশ্বাসী, আর তাঁহাদের ধারণা এই—মহম্মদের আগমনের পর হইতে সেই

লুপ্ত পবিত্রতার পুনরুদ্ধারের উপায় হইয়াছে। বৌদ্ধদের সম্বন্ধেও তাহাই; তাঁহারাও নির্ব্বাণনামক অবস্থাবিশেষে বিশ্বাসী; উহা এই দ্বৈতজগতের অতীত অবস্থা। বৈদান্তিকেরা যাহাকে ব্রহ্ম বলেন, ঐ নির্ব্বাণ-অবস্থাও ঠিক তাহাই; আর বৌদ্ধদের সমুদয় উপদেশের মর্ম্ম এই—সেই বিনষ্ট নির্ব্বাণ-অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে হইবে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, সকল ধর্ম্মেই এই এক তত্ত্ব পাওয়া যাইতেছে যে, যাহা তোমার নয় তাহা তুমি কখন পাইতে পার না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাহারও নিকট তুমি ঋণী নহ। তুমি তোমার নিজের জন্মপ্রাপ্ত অধিকারই প্রার্থনা করিবে। একজন প্রধান বৈদান্তিক আচার্য্য এই ভাবটি তাঁহার নিজকৃত কোন গ্রন্থের নামপ্রদানচ্ছলে বড় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। গ্রন্থখানির নাম 'স্বারাজ্যসিদ্ধি' অর্থাৎ আমার নিজের রাজ্য, যাহা হারাইয়াছিল, তাহার পুনঃপ্রাপ্তি। সেই রাজ্য আমাদের; আমরা উহা হারাইয়াছি, আমাদিগকে উহা পুনরায় লাভ করিতে হইবে। তবে মায়াবাদী বলেন, এই রাজ্যনাশ কেবল আমাদের ভ্রমমাত্র, আমাদের রাজ্যনাশ হয় নাই—ইহাই কেবল প্রভেদ।

যদিও সকল ধর্ম্মপ্রণালীই এই বিষয়ে একমত যে, আমাদের যে রাজ্য ছিল তাহা আমরা হারাইয়া ফেলিয়াছি, তথাপি তাঁহারা উহা পুনঃপ্রাপ্ত হইবার উপায়সম্বন্ধে বিভিন্ন উপদেশ দিয়া থাকেন। কেহ বলেন বিশেষ কতকগুলি ক্রিয়াকলাপ করিয়া প্রতিমাদির পূজা-অর্চ্চনা করিলে ও নিজে কোন বিশেষ নিয়মে জীবনযাপন করিলে সেই রাজ্যের উদ্ধার হইতে পারে। অপর

কেহ কেহ বলেন, "তুমি যদি প্রকৃতির অতীত পুরুষের সম্মুখে আপনাকে পাতিত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবে তুমি সেই রাজ্য ফিরিয়া পাইবে।" অপর কেহ কেহ বলেন, "তুমি যদি ঐরূপ পুরুষকে সর্ব্বান্তঃকরণে ভালবাসিতে পার, তবে তুমি ঐ রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে।" উপনিষদে এই-সকল রকমেরই উপদেশ পাওয়া যায়। ক্রমশঃ যত তোমাদিগকে উপনিষদ্ বুঝাইব, ততই ইহা দেখিতে থাকিবে। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষ উপদেশ এই—তোমার রোদনের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তোমার এই-সকল ক্রিয়াকলাপের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই, কি করিয়া রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবে, সে চিন্তারও তোমার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, কারণ তোমার রাজ্য কখন নষ্ট হয় নাই। যাহা তুমি কখনই হারাও নাই, তাহা পাইবার জন্য আবার চেষ্টা করিবে কি? তোমরা স্বভাবতঃ মুক্ত, তোমরা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বভাব। যদি তোমরা আপনাদিগকে মুক্ত বলিয়া ভাবিতে পার, তোমরা এই মুহূর্ত্তেই মুক্ত হইয়া যাইবে; আর যদি আপনাদিগকে বদ্ধ বলিয়া বিবেচনা কর, তবে বদ্ধই থাকিবে। শুধু তাহাই নহে; অবশ্য এইবার যাহা বলিব তাহা আমাকে বড় সাহসপূর্ব্বক বলিতে হইবে—এই-সকল বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বেই তোমাদিগকে সে কথা বলিয়াছি। তোমাদের ইহা শুনিয়া এক্ষণে ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা যতই চিন্তা করিবে এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিবে, ততই দেখিবে আমার কথা সত্য কি না। কারণ মনে কর মুক্তভাব তোমার স্বভাবসিদ্ধ নয়; তবে তুমি কোনরূপেই মুক্ত হইতে পারিবে না। মনে কর, তোমরা মুক্ত ছিলে, এক্ষণে কোনরূপে

সেই মুক্তস্বভাব হারাইয়া বদ্ধ হইয়াছ, তাহা হইলে প্রমাণিত হইতেছে তোমরা প্রথম হইতে মুক্ত ছিলে না। যদি মুক্ত ছিলে, তবে তোমায় কিসে বদ্ধ করিল? যে স্বতন্ত্র, সে কখন পরতন্ত্র হইতে পারে না; যদি হয়, তবে প্রমাণিত হইল উহা কখন স্বতন্ত্র ছিল না—এই স্বাতন্ত্র্যপ্রতীতিই ভ্রম ছিল।

এক্ষণে এই দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ গ্রহণ করিবে? উভয় পক্ষের যুক্তিপরম্পরা বিবৃত করিলে এইরূপ দাঁড়ায়: যদি বল, আত্মা স্বভাবতঃ শুদ্ধস্বরূপ ও মুক্ত, তবে অবশ্য সিদ্ধান্ত করিতে হইবে জগতে এমন কিছুই নাই যাহা উহাকে বদ্ধ করিতে পারে। কিন্তু যদি জগতে এমন কিছু থাকে যাহাতে উহাকে বদ্ধ করিতে পারে, তবে অবশ্য বলিতে হইবে আত্মা মুক্তস্বভাব ছিলেন না, সুতরাং তুমি যে উহাকে মুক্তস্বভাব বলিয়াছিলে সে তোমার ভ্রমমাত্র। অতএব অবশ্যই তোমাকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে যে, আত্মা স্বভাবতঃই মুক্তস্বরূপ। অন্যরূপ হইতে পারে না। মুক্তস্বভাবের অর্থ—বাহ্য সকল বস্তুর অনধীনতা—অর্থাৎ উহা ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই উহার উপর হেতুরূপে কোন কার্য্য করিতে পারে না। আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, ইহা হইতেই আত্মাসম্বন্ধে আমাদের উচ্চ উচ্চ ধারণাসকল আসিয়া থাকে। আত্মার অমরত্বের কোন ধারণা স্থাপন করা যাইতে পারে না, যদি না স্বীকার করা যায় যে, আত্মা স্বভাবতঃ মুক্ত অর্থাৎ বাহিরের কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে না। কারণ মৃত্যু আমার বহিঃস্থ কোন কিছুর দ্বারা কৃত কার্য্য। ইহাতে বুঝাইতেছে যে, আমার শরীরের উপর বহিঃস্থ অপর

কিছু কার্য্য করিতে পারে; আমি খানিকটা বিষ খাইলাম, তাহাতে আমার মৃত্যু হইল—ইহাতে বোধ হইতেছে, আমার শরীরের উপর বিষনামক বহিঃস্থ কোন বস্তু কার্য্য করিতে পারে। যদি আত্মাসম্বন্ধে ইহা সত্য হয়, তবে আত্মাও বদ্ধ। কিন্তু যদি ইহা সত্য হয় যে আত্মা মুক্ত-স্বভাব, তবে ইহাও স্বভাবতঃ বোধ হয় যে, বহিঃস্থ কোন বস্তুই উহার উপর কার্য্য করিতে পারে না, কখনও পারিবেও না। তাহা হইলেই আত্মা কখনও মরিবেনও না, আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত হইবেন। আত্মার মুক্ত-স্বভাব, উহার অমরত্ব এবং উহার আনন্দস্বভাব, সকলই ইহার উপর নির্ভর করিতেছে যে, আত্মা কার্য্যকারণসম্বন্ধের অতীত, এই মায়ার অতীত। ভাল কথা; এক্ষণে যদি বল, আত্মার স্বভাব প্রথমে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল, এক্ষণে উহা বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ইহাই বোধ হয়, বাস্তবিক উহা মুক্তস্বভাব ছিল না। তুমি যে বলিতেছ উহা মুক্তস্বভাব ছিল, তাহা অসত্য। কিন্তু অপর পক্ষে, আমরা পাইতেছি আমরা বাস্তবিক মুক্তস্বভাব, এই যে বদ্ধ হইয়াছি বোধ হইতেছে, ইহা ভ্রান্তিমাত্র। এই দুই পক্ষের কোন্ পক্ষ লইব? হয় বলিতে হইবে প্রথমটি ভ্রান্তি, নতুবা দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। আমি অবশ্য দ্বিতীয়টিকে ভ্রান্তি বলিব। ইহাই আমার সমুদয় ভাব ও অনুভূতির সহিত সঙ্গত। আমি সম্পূর্ণরূপে জানি, আমি স্বভাবতঃ মুক্ত; বদ্ধভাব সত্য ও মুক্তভাব ভ্রমাত্মক—ইহা ঠিক নহে।

সকল দর্শনেই স্থূলভাবে এই বিচার চলিতেছে। এমন কি, খুব

আধুনিক দর্শনেও এই বিচার প্রবেশ করিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যাইবে। দুই দল আছেন, এক দল বলিতেছেন আত্মা বলিয়া কিছুই নাই, উহা ভ্রান্তিমাত্র। এই ভ্রান্তির কারণ জড়কণা-সকলের পুনঃ পুনঃ স্থানপরিবর্ত্তন; এই সমবায়—যাহাকে তোমরা শরীর মস্তিষ্ক প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেছ, তাহারই স্পন্দন, তাহারই গতিবিশেষ এবং উহার মধ্যস্থ অংশসকলের ক্রমাগত স্থান-পরিবর্ত্তনে এই মুক্তস্বভাবের ধারণা আসিতেছে। কতিপয় বৌদ্ধসম্প্রদায় ছিলেন, তাঁহারা বলিতেন একটি মশাল লইয়া চতুর্দ্দিকে ক্রমাগত শীঘ্র শীঘ্র ঘুরাইতে থাকিলে একটি আলোকের বৃত্ত দেখা যাইবে। বাস্তবিক এই আলোকবৃত্তের কোন অস্তিত্ব নাই, কারণ ঐ মশাল প্রতি মুহূর্ত্তে স্থানপরিবর্ত্তন করিতেছে। তদ্রূপ আমরাও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু-সমষ্টিমাত্র, উহাদের প্রবল ঘূর্ণনে এই 'অহং'-ভ্রান্তি জন্মিতেছে। অতএব একটি মত হইল এই যে, শরীরই সত্য, আত্মার অস্তিত্ব নাই। অপর মত এই যে, চিন্তাশক্তির দ্রুত স্পন্দনে জড়রূপ এক ভ্রান্তির উৎপত্তি, বাস্তবিক জড়ের অস্তিত্ব নাই। এই তর্ক আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলিতেছে—একজন বলিতেছেন আত্মা ভ্রমমাত্র, অপরে আবার জড়কে ভ্রম বলিতেছেন। তোমরা কোন্ মত লইবে? অবশ্য আমরা আত্মাস্তিত্ববাদ গ্রহণ করিয়া জড়কে ভ্রমাত্মক বলিব। যুক্তি দুইদিকেই সমান, কেবল আত্মার নিরপেক্ষ অস্তিত্বের দিকে যুক্তি অপেক্ষাকৃত প্রবল; কারণ জড় কি তাহা কেহ কখন দেখে নাই। আমরা কেবল আপনাদিগকেই অনুভব করিতে পারি। আমি এমন লোক দেখি নাই, যিনি আপনার বাহিরে

গিয়া জড়কে অনুভব করিতে পারিয়াছেন। কেহ কখন লাফাইয়া নিজ আত্মার বাহিরে যাইতে পারে নাই। অতএব আত্মার দিকে যুক্তি একটু দৃঢ়তর হইল। দ্বিতীয়তঃ আত্মবাদ জগতের সুন্দর ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু জড়বাদ পারে না। অতএব জড়বাদের দিক হইতে জগতের ব্যাখ্যা অযৌক্তিক। পূর্ব্বে যে আত্মার স্বাভাবিক মুক্ত ও বদ্ধভাব-সম্বন্ধীয় বিচারের প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল, জড়বাদ ও আত্মবাদের তর্ক তাহারই স্থূলভাবমাত্র। দর্শনসমূহকে সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিলে তুমি দেখিবে, তাহাদের মধ্যেও এই দুইটি মতের সংঘর্ষ চলিয়াছে। খুব আধুনিক দর্শনসমূহেও আমরা অন্য আকারে সেই প্রাচীন বিচারই দেখিতে পাই। এক দল বলেন, মানবের তথাকথিত পবিত্র ও মুক্তস্বভাব ভ্রমমাত্র—অপরে আবার বদ্ধভাবকেই ভ্রমাত্মক বলেন। এখানেও আমরা দ্বিতীয় দলের সহিত একমত—আমাদের বদ্ধভাবই ভ্রমাত্মক।

অতএব বেদান্তের সিদ্ধান্তই এই—আমরা বদ্ধ নই, আমরা নিত্যমুক্ত। তাহাই নহে, আমরা বদ্ধ এই কথা বলা বা ভাবাই অনিষ্টকর, উহা ভ্রম—উহা আপনাকে আপনি মোহে অভিভূত করে মাত্র। যখনই তুমি বল আমি বদ্ধ, আমি দুর্ব্বল, আমি অসহায়, তখনই তোমার দুর্ভাগ্য আরম্ভ, তুমি নিজের পায়ে আর একটি শিকল জড়াইতেছ মাত্র। এরূপ বলিও না, এরূপ ভাবিও না। আমি এক ব্যক্তির কথা শুনিয়াছি—তিনি বনে বাস করিতেন এবং দিবারাত্র 'শিবোঽহং শিবোঽহম্' উচ্চারণ করিতেন। একদিন এক ব্যাঘ্র তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিবার জন্য

টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। নদীর অপর পারের লোকে ইহা দেখিল আর শুনিল সেই ব্যক্তির 'শিবোঽহং শিবোঽহম্' রব। যতক্ষণ তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল, ব্যাঘ্রের কবলে পড়িয়াও তিনি 'শিবোঽহম্' বলিতে বিরত হন নাই। এরূপ অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়। এমন অনেক ব্যক্তির কথা শুনা যায়, যাঁহারা শত্রু কর্ত্তৃক খণ্ড খণ্ড হইয়াও তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। 'সোঽহং সোঽহম্'—আমিই সেই, আমিই সেই, তুমিও তাহাই। আমি নিশ্চিত পূর্ণস্বরূপ, আমার সকল শত্রুও তদ্রূপ। তুমিই তিনি এবং আমিও তাহাই। ইহাই বীরের কথা। তথাপি দ্বৈতবাদীদের ধর্ম্মের অনেক অপূর্ব্ব মহৎ মহৎ ভাব আছে—প্রকৃতি হইতে পৃথক আমাদের উপাস্য ও প্রেমাস্পদ সগুণ ঈশ্বরবাদ অতি অপূর্ব্ব—অনেক সময় ইহাতে প্রাণ শীতল করিয়া দেয়—কিন্তু বেদান্ত বলেন প্রাণের এই শীতলতা আফিংখোরের নেশার মত অস্বাভাবিক। আবার ইহাতে দুর্ব্বলতা আনয়ন করে, আর পূর্ব্বে যত না আবশ্যক হইয়াছিল, এখন জগতে বিশেষ আবশ্যক—সেই বলসঞ্চার—শক্তি-সঞ্চার। বেদান্ত বলেন, দুর্ব্বলতাই সংসারের সমুদয় দুঃখের কারণ, দুর্ব্বলতাই সমুদয় দুঃখভোগের একমাত্র কারণ। আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই এত দুঃখভোগ করি। আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই চুরি ডাকাতি মিথ্যা জুয়াচুরি বা অন্যান্য পাপ করিয়া থাকি। দুর্ব্বল বলিয়াই আমরা মৃত্যুমুখে পতিত হই। যেখানে আমাদিগকে দুর্ব্বল করিবার কিছুই নাই, সেখানে মৃত্যু বা কোনরূপ দুঃখ থাকিতে পারে না। আমরা ভ্রান্তিবশতঃই দুঃখভোগ করিতেছি। এই ভ্রান্তি তাড়াইয়া দাও, সব দুঃখ চলিয়া যাইবে। ইহা ত খুব সহজ

সাদা কথা। এইসকল দার্শনিক বিচার ও কঠোর মানসিক ব্যায়ামের ভিতর দিয়া আমরা সমুদয় জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সরল আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম।

অদ্বৈত-বেদান্ত যে আকারে আধ্যাত্মিক সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা সরল ও সহজ। ভারতে এবং অন্যান্য সর্ব্বস্থলেই এবিষয়ে একটি গুরুতর ভ্রম হইয়াছিল। বেদান্তের আচার্য্যগণ স্থির করিয়াছিলেন, এই শিক্ষা সার্ব্বজনীন করা যাইতে পারে না, কারণ তাঁহারা যে সিদ্ধান্তগুলিতে উপনীত হইয়াছিলেন সেইগুলির দিকে লক্ষ্য না করিয়া যে প্রণালীতে তাঁহারা ঐসকল সিদ্ধান্ত লাভ করিয়াছিলেন—সেই প্রণালীর দিকেই বেশী লক্ষ্য করিলেন—অবশ্য ঐ প্রণালী অতি জটিল। এই ভয়ানক দার্শনিক ও নৈয়ায়িক প্রক্রিয়াগুলি দেখিয়া তাঁহারা ভয় পাইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা ভাবিতেন, এগুলি প্রাত্যহিক কর্ম্মজীবনে শিক্ষা করা যাইতে পারে না, আর এরূপ দর্শনের ব্যপদেশে লোক অতিশয় অধর্ম্মপরায়ণ হইবে।

কিন্তু আমি আদৌ বিশ্বাস করি না যে, জগতে অদ্বৈততত্ত্ব প্রচারিত হইলে দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতার প্রাদুর্ভাব হইবে। বরং আমার ইহা বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে যে, ইহাই দুর্নীতি ও দুর্ব্বলতা-নিবারণের একমাত্র ঔষধ। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে যখন নিকটে অমৃতের স্রোত বহিতেছে, তখন লোককে পঙ্কিল জল পান করিতে দিতেছ কেন? যদি ইহাই সত্য হয় যে, সকলে শুদ্ধস্বরূপ, তবে এই মুহূর্ত্তেই সমুদয় জগৎকে এই শিক্ষা কেন না দাও? সাধু-অসাধু, নর-নারী, বালক-বালিকা, বড়-ছোট,

সকলকেই কেন না বজ্রনির্ঘোষে ইহা শিক্ষা দাও? যে-কোন ব্যক্তি জগতে দেহধারণ করিয়াছে, যে-কেহ করিবে, সিংহাসনে উপবিষ্ট ব্যক্তি অথবা যে রাস্তা ঝাঁট দিতেছে, ধনী দরিদ্র সকলকেই কেন না ইহা শিক্ষা দাও? আমি রাজার রাজা, আমা অপেক্ষা বড় রাজা নাই। আমি দেবতার দেবতা, আমা অপেক্ষা বড় দেবতা নাই।

এক্ষণে ইহা বড় কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, অনেকের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু তাহা কুসংস্কারের জন্য, অন্য কারণে নহে। সকলপ্রকার কদর্য্য ও দুষ্পাচ্য খাদ্য খাইয়া এবং উপবাস করিয়া করিয়া আমরা আপনাদিগকে সুখাদ্য খাইবার অনুপযুক্ত করিয়া ফেলিয়াছি। আমরা শিশুকাল হইতে দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়া আসিতেছি। এ ঠিক ভূতমানার মত। লোকে সর্ব্বদা বলিয়া থাকে আমরা ভূত মানি না—কিন্তু খুব কম লোক দেখিবে, যাহাদের অন্ধকারে একটু গা ছম্ ছম্ না করে। ইহা কেবল কুসংস্কার। ঠিক এইরূপেই লোকে বলিয়া থাকে আমরা অমুক মানি না, অমুক মানি না ইত্যাদি, কিন্তু কার্য্যকালে অবস্থাবিশেষে অনেকেই মনে মনে বলিয়া থাকেন—যদি কেহ দেবতা বা ঈশ্বর থাক, আমায় রক্ষা কর। বেদান্ত হইতে এই এক প্রধান তত্ত্ব আসিতেছে, আর ইহাই একমাত্র সনাতনত্বের দাবী করিতে পারে। বেদান্তগ্রন্থগুলি কালই নষ্ট হইতে পারে। এই তত্ত্ব প্রথমে হিব্রুদের মস্তিষ্কে অথবা উত্তরমেরুনিবাসীদের মস্তিষ্কে উদিত হইয়াছিল, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু ইহা সত্য, আর যাহা সত্য তাহা সনাতন, আর সত্য আমাদিগকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, উহা কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। মানুষ, পশু, দেবতা

সকলেই এই এক সত্যের অধিকারী। তাহাদিগকে ইহা শিখাও, জীবনকে দুঃখময় করিবার আবশ্যকতা কি? লোককে নানাপ্রকার কুসংস্কারে পড়িতে দাও কেন? কেবল এখানে (ইংলণ্ডে) নহে, এই তত্ত্বের জন্মভূমিতেই তুমি যদি লোককে উহা উপদেশ কর, তাহারা ভয় পাইবে। তাহারা বলে, ইহা সন্ন্যাসীর জন্য—যাহারা সংসার ত্যাগ করিয়া বনে বাস করে। কিন্তু আমরা সামান্য গৃহস্থ লোক; ধর্ম্ম করিতে গেলে আমাদের কোন না কোন প্রকার ভয়ের দরকার, আমাদের ক্রিয়াকাণ্ডের দরকার ইত্যাদি।

দ্বৈতবাদ জগৎকে অনেক দিন শাসন করিয়াছে, আর এই তাহার ফল। ভাল, একটি নূতন পরীক্ষা কর না কেন? হয়ত সকল ব্যক্তির ইহা ধারণা করিতে লক্ষ লক্ষ বৎসর লাগিবে, কিন্তু এখনই আরম্ভ কর না কেন? যদি আমরা আমাদের জীবনে কুড়িটি লোককে ইহা বলিতে পারি, আমরা খুব বড় কাজ করিলাম।

ভারতবর্ষে আবার একটি মহতী শিক্ষা প্রচলিত আছে, যাহা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বপ্রচারের বিরোধী বলিয়া বোধ হয়। তাহা এই—'আমি শুদ্ধ, আমি আনন্দস্বরূপ; এ কথা মুখে বলা বেশ, কিন্তু জীবনে ত আমি সর্ব্বদা ইহা দেখাইতে পারি না।' আমরা একথা স্বীকার করি। আদর্শ সকল সময়েই বড় কঠিন। প্রত্যেক শিশুই আকাশকে আপনার মস্তকের অনেক উপরে দেখে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা আকাশের দিকে যাইতে কেন চেষ্টা করিব না, তাহার ত কোন হেতু নাই। কুসংস্কারের দিকে গেলে কি সব ভাল হইবে? অমৃতত্বলাভ যদি না করিতে পারি, তবে কি বিষপান করিলেই মঙ্গল হইবে? আমরা সত্য কখনই অনুভব করিতে

পারিতেছি না বলিয়া কি অন্ধকার, দুর্ব্বলতা ও কুসংস্কারের দিকে গেলেই মঙ্গল হইবে ?

নানাপ্রকারের দ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যে-কোন উপদেশ দুর্ব্বলতা শিক্ষা দেয়, তাহাতে আমার বিশেষ আপত্তি। নর-নারী, বালক-বালিকা যখন দৈহিক, মানসিক বা আধ্যাত্মিক শিক্ষা পাইতেছে, আমি তাহাদিগকে এই এক প্রশ্ন করিয়া থাকি—তোমরা কি বল পাইতেছ ? কারণ আমি জানি, সত্যই একমাত্র বল প্রদান করে। আমি জানি, সত্যই একমাত্র প্রাণপ্রদ, সত্যের দিকে না গেলে কিছুতেই আমাদের বীর্য্যলাভ হইবে না, আর বীর না হইলেও সত্যে যাওয়া যাইবে না। এই জন্যই যে-কোন মত, যে-কোন শিক্ষাপ্রণালী মনকে ও মস্তিষ্ককে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে, মানুষকে কুসংস্কারাবিষ্ট করিয়া তোলে, যাহাতে মানুষ অন্ধকারে হাতড়াইয়া বেড়ায়, যাহাতে সর্ব্বদাই মানুষকে সকলপ্রকার বিকৃতমস্তিষ্কপ্রসূত অসম্ভব আজগুবি ও কুসংস্কারপূর্ণ বিষয়ের অন্বেষণ করায়—আমি সেই প্রণালীগুলিকে পছন্দ করি না, কারণ মানুষের উপর তাহাদের প্রভাব বড় ভয়ানক আর সেগুলিতে কিছুই উপকার হয় না, সেগুলি বৃথামাত্র।

যাঁহারা ঐগুলি লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, তাঁহারা আমার সহিত এ বিষয়ে একমত হইবেন যে, ঐগুলি মনুষ্যকে বিকৃত ও দুর্ব্বল করিয়া ফেলে—এত দুর্ব্বল করে যে ক্রমশঃ তাহার পক্ষে সত্যলাভ করা ও সেই সত্যের আলোকে জীবনযাপন করা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠে। অতএব আমাদের আবশ্যক একমাত্র বল বা শক্তি। শক্তিসঞ্চারই এই ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধ।

দরিদ্রগণ যখন ধনিগণের দ্বারা পদদলিত হয়, তখন শক্তিসঞ্চারই তাহাদের একমাত্র ঔষধ। মূর্খ যখন বিদ্বানের দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখন এই বলই তাহার একমাত্র ঔষধ। আর যখন পাপিগণ অপর পাপিগণ দ্বারা উৎপীড়িত হয়, তখনও ইহাই একমাত্র ঔষধ। আর অদ্বৈতবাদ যেরূপ বল, যেরূপ শক্তি প্রদান করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে যেরূপ নীতিপরায়ণ করে, আর কিছুতেই সেরূপ করিতে পারে না। যখন সমুদয় দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধের উপর পড়ে, তখন আমরা যত উচ্চভাবে কার্য্য করিতে পারি আর কোন অবস্থাতেই সেরূপ পারি না। আমি তোমাদের সকলকেই ডাকিয়া বলিতেছি, বল দেখি যদি তোমাদের হাতে একটি ছোট শিশু দিই, তোমরা তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে? মুহূর্ত্তেকের জন্য তোমাদের জীবন বদলাইয়া যাইবে। তোমাদের যেরূপ স্বভাব হউক না কেন, তোমরা অন্ততঃ সেই সময়ের জন্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া যাইবে। তোমাদের উপর দায়িত্ব চাপাইলে তোমাদের পাপবৃত্তি সব পলায়ন করিবে, তোমাদের চরিত্র বদলাইয়া যাইবে। এইরূপ যখনই সমুদয় দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে পড়ে, তখনই আমরা আমাদের সর্ব্বোচ্চ ভাবে আরোহণ করি; যখন আমাদের সমুদয় দোষ অপর কাহারও ঘাড়ে চাপাইতে হয় না, যখন শয়তান বা ঈশ্বর কাহাকেও আমরা আমাদের দোষের জন্য দায়ী করি না, তখনই আমরা সর্ব্বোচ্চভাবে আরোহণ করি। আমিই আমার অদৃষ্টের জন্য দায়ী। আমিই নিজের শুভাশুভ উভয়েরই কর্ত্তা, কিন্তু আমার স্বরূপ শুদ্ধ ও আনন্দমাত্র।

"ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্য-
শ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং
ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্॥"

বেদান্ত বলেন, এই স্তবই সাধারণের একমাত্র অবলম্বনীয়। ইহাই সেই চরম লক্ষ্যে পৌঁছিবার একমাত্র উপায়—আপনাকে এবং সকলকে বলা যে, আমরাই সেই। পুনঃ পুনঃ এইরূপ বলিতে থাকিলে বল আইসে। যে প্রথমে খোঁড়াইয়া চলে, সে ক্রমশঃ পায়ে বল পাইয়া মাটির উপর পা সোজা রাখিয়া চলিতে থাকে। 'শিবোঽহম্'-রূপ এই অভয়বাণী ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর হইয়া আমাদের হৃদয়কে, আমাদের ভাবসমূহকে পরিব্যাপ্ত করে—পরিশেষে আমাদের প্রতি শিরায়—প্রতি ধমনীতে—শরীরের প্রত্যেক অংশে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। জ্ঞান-সূর্য্যের কিরণ যতই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হইতে আরম্ভ হয়, ততই মোহ চলিয়া যায়, অজ্ঞানরাশি ধ্বংস হইতে থাকে—ক্রমশঃ এমন এক সময় আসিয়া থাকে যখন সমুদয় অজ্ঞান একেবারে চলিয়া যায় এবং একমাত্র জ্ঞান-সূর্য্যই অবশিষ্ট থাকে। অবশ্যই এই বেদান্ততত্ত্ব অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু তাহার কারণ যে কুসংস্কার তাহা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই দেশেই

(ইংলণ্ডেই) এমন অনেক লোক আছেন, তাঁহাদিগকেই আমি যদি বলি শয়তান বলিয়া কেহ নাই, তাঁহারা ভাবিবেন, যাঃ—সব ধর্ম্ম গেল। অনেক লোক আমায় বলিয়াছেন, শয়তান না থাকিলে ধর্ম্ম কিরূপে থাকিতে পারে? তাঁহারা বলেন, আমাদিগকে কেহ চালাইবার না থাকিলে আর ধর্ম্ম কি হইল? কেহ আমাদিগকে শাসন করিবার না থাকিলে আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব কিরূপে? বাস্তবিক কথা এই, আমরা ঐরূপভাবে ব্যবহৃত হইতে ভালবাসি। আমরা এইরূপভাবে থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমরা ভালবাসি। প্রতিদিন কেহ না কেহ আমাদের তিরস্কার না করিলে আমরা সুখী হইতে পারি না। সেই কুসংস্কার! কিন্তু এখন ইহা যত ভয়ানক বলিয়া বোধ হউক, এমন এক সময় আসিবে যখন আমরা সকলেই অতীতের ইতিহাস স্মরণ করিয়া, শুদ্ধ অনন্ত আত্মাকে যে সকল কুসংস্কার আবরিত করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদিগের প্রত্যেকটিকে স্মরণ করিয়া হাসিব, আর আনন্দ সত্য ও দৃঢ়তার সহিত বলিব—আমিই তিনি, চিরকাল তাহাই ছিলাম এবং সর্ব্বদা তাহাই থাকিব।

# কর্ম্মজীবনে বেদান্ত

## প্রথম প্রস্তাব

আমাকে অনেকে বেদান্তদর্শনের কর্ম্মজীবনে উপযোগিতা-সম্বন্ধে কিছু বলিতে বলিয়াছেন। আমি তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মত খুব ভাল বটে, কিন্তু উহা কিরূপে কার্য্যে পরিণত করা যাইবে, ইহাই প্রকৃত সমস্যা। যদি উহা কার্য্যে পরিণত করা একেবারে অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধির একটু পরিচালনা ব্যতীত উহার অপর কোন মূল্য নাই। অতএব বেদান্ত যদি ধর্ম্মের আসন অধিকার করিতে চায়, তবে উহাকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাইবার মত হইতে হইবে। আমাদের জীবনের সকল অবস্থায় উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে। শুধু তাহাই নহে, আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের মধ্যে যে একটা কাল্পনিক ভেদ আছে, তাহাও দূর করিয়া দিতে হইবে, কারণ বেদান্ত এক অখণ্ড বস্তুর সম্বন্ধে উপদেশ করেন—বেদান্ত বলেন, এক প্রাণ সর্ব্বত্র রহিয়াছেন। ধর্ম্মের আদর্শসমূহ জীবনের সমুদয় অংশকে যেন আচ্ছাদন করে, উহা যেন আমাদিগের প্রত্যেক চিন্তার ভিতরে প্রবেশ করে ও কার্য্যেও যেন উহাদের প্রভাব উত্তরোত্তর অধিক হইতে থাকে। আমি ক্রমশঃ কর্ম্মজীবনে বেদান্তের প্রভাবের কথা বলিব। কিন্তু এই বক্তৃতাগুলি ভবিষ্যৎ বক্তৃতাসমূহের উপক্রমণিকারূপে সঙ্কল্পিত, সুতরাং

আমাদিগকে প্রথমে মতের বিষয়েই আলোচনা করিতে হইবে। আমাদিগকে বুঝিতে হইবে পর্ব্বতগহ্বর ও নিবিড় অরণ্য হইতে সমুদ্ভূত হইয়া কিরূপে তাহারা আবার কোলাহলময় নগরীর কার্য্য-বহুল রথ্যাসমূহে কার্য্যে পরিণত হইতেছে। এই মতগুলির আমরা আরও একটু বিশেষত্ব দেখিব যে, এই চিন্তাগুলির অধিকাংশ নির্জ্জন অরণ্যবাসের ফলে নহে, কিন্তু যে সকল ব্যক্তিকে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কর্ম্মে ব্যস্ত বলিয়া মনে করি, সেই সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ ইহাদের প্রণেতা।

শ্বেতকেতু আরুণি ঋষির পুত্র। এই ঋষি বোধ হয় বানপ্রস্থ ছিলেন। শ্বেতকেতু বনেই প্রতিপালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্চালদিগেব নগরে তাঁহাদিগের রাজা প্রবাহণ জৈবলির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মৃত্যুকালে প্রাণিগণ কিরূপে এ লোক হইতে গমন করে, তাহা তুমি কি জান?"—"না"। "কিরূপে তাহারা এখানে পুনরায় আসিয়া থাকে, তাহা কি তুমি জান?"—"না"। "তুমি কি পিতৃযান ও দেবযানের বিষয় অবগত আছ?" রাজা এইরূপ আরও অনেক প্রশ্ন করিলেন। শ্বেতকেতু কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারিলেন না, তাহাতে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, "তুমি কিছুই জান না।" বালক পিতার নিকট প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ঐ কথা বলাতে পিতা বলিলেন, "আমিও এ-সকল প্রশ্নের উত্তর জানি না। যদি জানিতাম, তাহা হইলে কি তোমায় শিখাইতাম না?" তখন তাঁহারা পিতা-পুত্রে রাজসন্নিধানে উপনীত হইয়া তাঁহাকে এই রহস্যের বিষয় শিক্ষা দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রাজা বলিলেন, এই

বিদ্যা—এই ব্রহ্মবিদ্যা কেবল রাজাদেরই জ্ঞাত ছিল, ব্রাহ্মণেরা কখনই ইহা জানিতেন না। যাহা হউক, তিনি তৎপরে এতৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন, তাহা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। এইরূপে আমরা অনেক উপনিষদে এই কথা পাইতেছি যে, বেদান্তদর্শন কেবল অরণ্যে ধ্যানলব্ধ নহে, কিন্তু উহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অংশগুলি সাংসারিক কার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত মস্তিষ্কসকলের চিন্তিত ও প্রকাশিত। লক্ষ লক্ষ প্রজার শাসক স্বেচ্ছাতন্ত্র রাজা অপেক্ষা কর্ম্মে ব্যস্ত মানুষ আর কাহাকেও কল্পনা করা যায় না; কিন্তু তথাপি এই রাজারা গভীর চিন্তাশীল ছিলেন।

এইরূপে নানাদিক হইতে দেখিলে ইহা স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই দর্শনের আলোকে জীবনগঠন ও জীবনযাপন অবশ্যই সম্ভব আর যখন আমরা পরবর্ত্তী কালের ভগবদ্গীতা আলোচনা করি, (আপনারা অনেকেই বোধ হয় ইহা পড়িয়াছেন, ইহা বেদান্তদর্শনের একটি সর্ব্বোত্তম ভাষ্যস্বরূপ) তখন দেখিতে পাই, আশ্চর্য্যের বিষয় যে, সংগ্রামস্থল এই উপদেশের কেন্দ্র—তথায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে এই দর্শনের উপদেশ দিতেছেন, আর গীতার প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এই মত উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত রহিয়াছে—তীব্র কর্ম্মশীলতা, কিন্তু তাহার মধ্যে আবার অনন্ত শান্তভাব। এই তত্ত্বকে কর্ম্মরহস্য বলা হইয়াছে, এই অবস্থা লাভ করাই বেদান্তের লক্ষ্য। আমরা অকর্ম্ম বলিতে সচরাচর যাহা বুঝি অর্থাৎ নিশ্চেষ্টতা, তাহা অবশ্য আমাদের আদর্শ হইতে পারে না। তাহা যদি হইত, তবে ত আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী দেয়ালগুলিই পরমজ্ঞানী হইত, তাহারা ত নিশ্চেষ্ট। মৃত্তিকাখণ্ড, গাছের গুঁড়ি—

এইগুলিই ত তাহা হইলে জগতে মহাতপস্বী বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহারাও ত নিশ্চেষ্ট। আবার কামনাযুক্ত হইলে তাহাই যে কার্য্য নামের উপযুক্ত হয়, তাহা নহে। বেদান্তের আদর্শ যে প্রকৃত কর্ম্ম, তাহা অনন্ত স্থিরতার সহিত জড়িত—যাহাই কেন ঘটুক না, সে স্থিরতা কখন নষ্ট হইবার নহে—চিত্তের সে সমভাব কখন ভঙ্গ হইবার নহে। আর আমরা বহুদর্শিতার দ্বারা ইহা জানিয়াছি যে, কার্য্য করিবার পক্ষে এইরূপ মনোভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযুক্ত।

আমাকে অনেকে অনেকবার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমরা কার্য্যের জন্য যেরূপ একটা আগ্রহ বোধ করিয়া থাকি, সেরূপ আগ্রহ না থাকিলে কার্য্য কিরূপে করিব? আমিও অনেক দিন পূর্ব্বে ইহাই মনে করিতাম, কিন্তু আমার যতই বয়স হইতেছে, যতই আমি অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছি, ততই আমি দেখিতেছি উহা সত্য নহে। কার্য্যের ভিতরে যত কম আগ্রহ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দর কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। আমরা যতই শান্ত হই ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, আর আমরা অধিক কার্য্য করিতে পারি। যখন আমরা ভাববশে পরিচালিত হইতে থাকি, তখন আমরা শক্তির বিশেষ অপব্যয় করিয়া থাকি, আমাদের স্নায়ুমণ্ডলীকে বিকৃত করিয়া ফেলি—মনকে চঞ্চল করিয়া তুলি, কিন্তু কার্য্য খুব কম করিতে পারি। যে শক্তি কার্য্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা বৃথা ভাবুকতামাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া ক্ষয় হইয়া যায়। কেবল যখন মন অতিশয় শান্ত ও স্থির থাকে, তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু

সৎকার্য্যে ব্যয়িত হইয়া থাকে। আর যদি তোমরা জগতে বড় বড় কার্য্যকুশল ব্যক্তিগণের জীবনী পাঠ কর, তোমরা দেখিবে তাঁহারা অদ্ভুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কিছুতেই তাঁহাদের চিত্তের সামঞ্জস্য ভঙ্গ করিত না। এই জন্যই যে ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায় সে বড় একটা বেশী কাজ করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না সে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী কাজ করিতে পারে। যে ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা বা কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় একটা কিছু করিতে পারে না, সে আপনাকে যেন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে, কিন্তু সে বড় কাজের লোক হয় না। কেবল শান্ত, ক্ষমাশীল, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কার্য্য করিয়া থাকে।

বেদান্ত আদর্শ-সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়া থাকেন, আর আদর্শ অবশ্য বাস্তব হইতে অর্থাৎ যাহাকে আমরা বোধগম্য বলিতে পারি তাহা হইতে অনেক উচ্চ, তাহাও আমরা জানি। আমাদের জীবনে দুইটি গতি দেখিতে পাওয়া যায়—একটি আমাদের আদর্শকে জীবনোপযোগী করা, আর অপরটি এই জীবনকে আদর্শোপযোগী গঠন করা। এই দুইটির পার্থক্য বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করা উচিত—কারণ আমাদের আদর্শকে জীবনোপযোগী করিয়া লইতে—নিজেদের মত করিয়া লইতে—আমরা অনেক সময় প্রলুব্ধ হইয়া থাকি। আমার ধারণা আমি কোন বিশেষপ্রকার কার্য্য করিতে পারি; হয়ত তাহার অধিকাংশই মন্দ। ইহার অধিকাংশের পশ্চাতেই হয়ত ক্রোধ, ঘৃণা অথবা স্বার্থপরতারূপ অভিসন্ধি আছে। এখন কোন ব্যক্তি আমাকে কোন বিশেষ আদর্শ-সম্বন্ধে উপদেশ দিলেন—

অবশ্য তাঁহার প্রথম উপদেশ এই হইবে যে, স্বার্থপরতা, আত্মসুখ ত্যাগ কর। আমি ভাবিলাম, ইহা কার্য্যে পরিণত করা অসম্ভব। কিন্তু যদি কেহ এমন এক আদর্শ-বিষয়ে উপদেশ দেন, যাহা আমার সমুদয় স্বার্থপরতার, সমুদয় অসাধু ভাবের সমর্থন করে, আমি অমনি বলিয়া উঠি, ইহাই আমার আদর্শ—আমি সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়ি। যেমন, 'শাস্ত্রীয়' 'অশাস্ত্রীয়' কথা লইয়া লোকে গোলযোগ করিয়া থাকে; আমি যাহা বুঝি, তাহা শাস্ত্রীয়—তোমার মত অশাস্ত্রীয়। 'ব্যবহারগম্য' (practical) কথাটি লইয়াও এইরূপ গোলযোগ হইয়াছে। আমি যাহাকে কাজে লাগাইবার মত বলিয়া বোধ করি, জগতে তাহাই একমাত্র ব্যবহারগম্য। যদি আমি দোকানদার হই, আমি মনে করি দোকানদারীই একমাত্র ব্যবহারগম্য ধর্ম্ম। যদি আমি চোর হই, আমি মনে করি চুরি করিবার উত্তম কৌশলই সর্ব্বোত্তম ব্যবহারগম্য ধর্ম্ম। তোমরা দেখিতেছ, আমরা কেমন এই ব্যবহারগম্য শব্দ—কেবল আমরাই যাহা বর্ত্তমান অবস্থায় করিতে পারি, সেই বিষয়েই প্রয়োগ করিয়া থাকি। এই হেতু আমি তোমাদিগকে বুঝিয়া রাখিতে বলি যে, যদিও বেদান্ত চূড়ান্তভাবে ব্যবহারগম্য বটে, কিন্তু সাধারণ অর্থে নহে, উহা আদর্শহিসাবে ব্যবহারগম্য। ইহার আদর্শ যতই উচ্চ হউক না কেন, ইহা কোন অসম্ভব আদর্শ আমাদের সম্মুখে স্থাপন করে না, অথচ এই আদর্শ, আদর্শ নামের উপযুক্ত। এক কথায় ইহার উপদেশ 'তত্ত্বমসি'—'তুমিই সেই ব্রহ্ম'—ইহার সমুদয় উপদেশের শেষ পরিণতি এই। ইহার নানাবিধ বিচার, পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্তাদির পর তুমি পাও এই যে, মানবাত্মা

শুদ্ধস্বভাব ও সর্ব্বজ্ঞ। আত্মার সম্বন্ধে জন্ম বা মৃত্যুর কথা বলা বাতুলতা মাত্র। আত্মা কখন জন্মানও নাই, কখন মরিবেনও না, আর আমি মরিব বা মরিতে ভীত—এসব কেবল কুসংস্কার মাত্র। আর আমি ইহা করিতে পারি বা ইহা করিতে পারি না—ইহাও কুসংস্কার। আমি সব করিতে পারি। বেদান্ত মানুষকে প্রথমে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে বলেন। যেমন জগতের কোন কোন ধর্ম্ম বলে, যে ব্যক্তি আপনা হইতে পৃথক সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করে সে নাস্তিক; সেইরূপ বেদান্ত বলেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। তোমার আপন আত্মার মহিমায় বিশ্বাস স্থাপন না করাকেই বেদান্ত নাস্তিকতা বলেন। অনেকের পক্ষে এই ধারণা বড় ভয়ানক, তাহার কোন সন্দেহ নাই; আর আমরা অনেকেই বিবেচনা করি ইহা কখনই অপরোক্ষ জ্ঞানের বিষয় হইবে না, কিন্তু বেদান্ত দৃঢ়রূপে বলেন যে, প্রত্যেকেই এই সত্য জীবনে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এ বিষয়ে স্ত্রী-পুরুষের ভেদ নাই, বালক-বালিকার ভেদ নাই, জাতিভেদ নাই—আবালবৃদ্ধবনিতা জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে এই সত্য উপলব্ধি করিতে পারেন—কোন কিছুই ইহার প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, কারণ বেদান্ত দেখাইয়া দেন, উহা পূর্ব্ব হইতেই অনুভূত, পূর্ব্ব হইতেই উহা রহিয়াছে।

ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় শক্তি পূর্ব্ব হইতেই আমাদের রহিয়াছে। আমরা আপনারাই নিজেদের চক্ষে হাত চাপা দিয়া 'অন্ধকার' 'অন্ধকার' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, দেখিবে তথায় আলোক প্রথম হইতেই বর্ত্তমান ছিল। অন্ধকার কখনই

ছিল না, দুর্ব্বলতা কখনই ছিল না, আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি আমরা দুর্ব্বল; আমরা নির্ব্বোধ বলিয়াই চীৎকার করি আমরা অপবিত্র। এইরূপে বেদান্ত যে আদর্শকে শুধু কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায় বলেন তাহা নহে, কিন্তু বলেন উহা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের উপলব্ধ; আর যাহাকে আমরা এখন আদর্শ বলিতেছি, যাহা প্রকৃত বাস্তব সত্তা তাহাই আমাদের স্বরূপ। আর যাহা কিছু দেখিতেছি, সমুদয়ই মিথ্যা। যখনই তুমি বল তুমি মর্ত্ত্য ক্ষুদ্র জীব, তখনই তুমি মিথ্যা বলিতেছ—তুমি যেন যাদুবলে আপনাকে অসৎ, দুর্ব্বল, দুর্ভাগ্য করিয়া ফেলিতেছ।

বেদান্ত পাপস্বীকার করেন না, ভ্রমস্বীকার করেন। আর বেদান্ত বলেন, সর্ব্বাপেক্ষা বিষম ভ্রম এই—আপনাকে দুর্ব্বল, পাপী ও হতভাগ্য জীব বলা—এরূপ বলা যে, আমার কোন শক্তি নাই, আমি ইহা করিতে পারি না, আমি উহা করিতে পারি না। কারণ যখনই তুমি ঐরূপ চিন্তা কর, তখনই তুমি যেন বন্ধন-শৃঙ্খলকে আরও দৃঢ় করিতেছ, তোমার আত্মাকে পূর্ব্ব হইতে অধিক মায়াবরণে আবৃত করিতেছ। অতএব যে কেহ আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া চিন্তা করে সে ভ্রান্ত; যে-কেহ আপনাকে অপবিত্র বলিয়া মনে করে সে ভ্রান্ত; সে জগতে একটি অসৎ চিন্তার স্রোত প্রক্ষেপ করিতেছে। এইটি যেন আমাদের সর্ব্বদা মনে থাকে যে, বেদান্তে আমাদের এই বর্ত্তমান মায়াময় জীবনকে—এই মিথ্যা জীবনকে আদর্শের সহিত মিলাইবার কোন চেষ্টা নাই, কিন্তু বেদান্ত বলেন, এই মিথ্যা জীবনকে পরিত্যাগ করিতে হইবে,

তাহা হইলেই ইহার অন্তরালে যে সত্যজীবন সদা বর্ত্তমান, তাহা প্রকাশিত হইবে। এমন নহে যে মানুষ পূর্ব্বে এতটুকু পবিত্র ছিল, তাহা হইতে পবিত্রতর হইল। কিন্তু বাস্তবিক সে পূর্ব্ব হইতেই পূর্ণশুদ্ধ আছে—তাহার সেই পূর্ণশুদ্ধ স্বভাব একটু একটু করিয়া প্রকাশ পায় মাত্র। আবরণ চলিয়া যায় এবং আত্মার স্বাভাবিক পবিত্রতা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই অনন্ত পবিত্রতা, মুক্তস্বভাব, প্রেম ও ঐশ্বর্য্য পূর্ব্ব হইতেই আমাদের বিদ্যমান।

বৈদান্তিক আরও বলেন, ইহা যে শুধু বনে অথবা পর্ব্বতগুহায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে তাহা নয়, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে যাঁহারা এই সত্যসকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাঁহারা বনে অথবা পর্ব্বতগুহায় বাস করিতেন না, অথবা সাধারণ লোকও ছিলেন না, কিন্তু যাঁহারা (আমাদের বিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ আছে) বিশেষরূপে কর্ম্মময় জীবনযাপন করিতেন, তাঁহাদিগকে সৈন্যপরিচালনা করিতে হইত, তাঁহাদিগকে সিংহাসনে বসিয়া প্রজাবর্গের মঙ্গলামঙ্গল দেখিতে হইত—আবার তখনকার কালে রাজারাই সর্ব্বময় ছিলেন, এখনকার মত সাক্ষিগোপাল ছিলেন না। তথাপি তাঁহারা এই সকল তত্ত্বের চিন্তার, উহাদিগকে জীবনে পরিণত করিবার এবং মানবজাতিকে শিক্ষা দিবার সময় পাইতেন। অতএব তাঁহাদের অপেক্ষা আমাদের ঐসকল তত্ত্ব অনুভব করা ত অনেক সহজ, কারণ তাঁহাদের সঙ্গে তুলনায় আমাদের জীবন ত অনেকটা কর্ম্মশূন্য। সুতরাং আমাদের যখন কাজ এত কম, আমরা যখন তাঁহাদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীন,

তখন আমরা যে ঐসকল সত্য অনুভব করিতে পারি না, ইহা আমাদের পক্ষে মহা লজ্জার কথা। পূর্ব্বকালীন সর্ব্বময় সম্রাট-গণের অভাবের সহিত তুলনায় আমাদের অভাব ত কিছুই নয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থিত অগণ্য অক্ষৌহিণীপরিচালক অর্জ্জুনের যত অভাব, আমার অভাব তাহার তুলনায় কিছুই নয়, তথাপি এই যুদ্ধকোলাহলের মধ্যে তিনি উচ্চতম দর্শনের কথা শুনিবার এবং উহাকে কার্য্যে পরিণত করিবারও সময় পাইলেন; সুতরাং আমাদের এই অপেক্ষাকৃত স্বাধীন বিলাসময় জীবনেও ইহা পারা উচিত। আমরা যদি বাস্তবিক সদ্ভাবে সময় কাটাইতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলে দেখিব আমরা যতটা ভাবি বা যতটা জানি তাহা অপেক্ষা আমাদের অনেকেরই যথেষ্ট সময় আছে। আমাদের যতটা অবকাশ আছে, তাহাতে যদি আমরা বাস্তবিক ইচ্ছা করি তবে আমরা একটা আদর্শ কেন, পঞ্চাশটি আদর্শ অনুসরণ করিতে সমর্থ হইতে পারি, কিন্তু আদর্শকে আমাদের কখনই নীচু করা উচিত নয়। এইটি আমাদের জীবনের এক বিশেষ বিপদাশঙ্কা। অনেক ব্যক্তি আছেন—তাঁহারা আমাদের বৃথা অভাবসকলের, বৃথা বাসনাসকলের জন্য নানাপ্রকার বৃথা কারণ প্রদর্শন করেন; আর আমরা মনে করি আমাদের উহা হইতে উচ্চতর আদর্শ বুঝি আর নাই, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বেদান্ত এরূপ শিক্ষা কখনই দেন না। প্রত্যক্ষ জীবনকে আদর্শের সহিত একীভূত করিতে হইবে, বর্ত্তমান জীবনকে অনন্ত জীবনের সহিত একীভূত করিতে হইবে।

কারণ তোমাদের সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বেদান্তের

মূলকথা এই একত্ব বা অখণ্ডভাব। দুই কোথাও নাই, দুইপ্রকার জীবন নাই, অথবা দুইটি জগৎও নাই। তোমরা দেখিবে বেদ প্রথমতঃ স্বর্গাদির কথা কহিতেছেন, কিন্তু শেষে যখন তাঁহারা তাঁহাদের দর্শনের উচ্চতম আদর্শের বিষয় বলিতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহারা ওসকল কথা একেবারে পরিত্যাগ করেন। একমাত্র জীবন আছে, একমাত্র জগৎ আছে, একমাত্র অস্তিত্ব আছে। সবই সেই একসত্তা মাত্র; প্রভেদ পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। ভিন্ন ভিন্ন জীবনের মধ্যে ভেদ প্রকারগত নহে। বেদান্ত এরূপ কথাসকল একেবারে অস্বীকার করেন যে, পশুগণ মনুষ্য হইতে সম্পূর্ণ পৃথক এবং তাহারা ঈশ্বর কর্ত্তৃক আমাদের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য সৃষ্ট হইয়াছে।

কতকগুলি লোকে দয়াপরবশ হইয়া 'জীবিত-ব্যবচ্ছেদ-নিবারণী সভা' ( Anti-vivisection Society ) স্থাপন করিয়াছিলেন। আমি এই সভার জনৈক সভ্যকে একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "বন্ধো, আপনারা খাদ্যের জন্য পশুহত্যা সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত মনে করেন, অথচ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার জন্য দুই-একটি পশুহত্যার এত বিরোধী কেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "জীবিত-ব্যবচ্ছেদ বড় ভয়ানক ব্যাপার, কিন্তু পশুগণ আমাদের খাদ্যের জন্য প্রদত্ত হইয়াছে।" কি ভয়ানক কথা! বাস্তবিক পশুগণও ত সেই অখণ্ড সত্তার অংশস্বরূপ। যদি মানুষের জীবন অনন্ত হয়, পশুরও তদ্রূপ। প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নহে। আমিও যেমন, একটি ক্ষুদ্র জীবাণুও তদ্রূপ—প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, আর সেই সর্ব্বোচ্চ সত্তার দিক হইতে দেখিলে এ

প্রভেদও দেখা যায় না। মানুষ অবশ্য তৃণ ও একটি ক্ষুদ্র বৃক্ষের ভিতর অনেক প্রভেদ দেখিতে পারে, কিন্তু যদি তুমি খুব উচ্চে আরোহণ কর তবে ঐ তৃণ ও বৃহত্তম বৃক্ষ পর্য্যন্ত সমান হইয়া যাইবে। এইরূপ সেই উচ্চতম সত্তার দৃষ্টি হইতে এসকলগুলি সমান; আর যদি তুমি একজন ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী হও, তবে তোমায় পশুগণের সহিত উচ্চতম প্রাণীর পর্য্যন্ত সমতা মানিতে হইবে; তাহা না হইলে ভগবান ত একজন মহাপক্ষপাতী হইলেন। যে ভগবান মনুষ্যনামক তাঁহার সন্তানগণের প্রতি এত পক্ষপাতসম্পন্ন আবার পশুনামক তাঁহার সন্তানের প্রতি এত নির্দ্দয়, তিনি মানব হইতেও অধম। এরূপ ঈশ্বরের উপাসনা করা অপেক্ষা বরং আমি শত শত বার মরিতেও স্বীকৃত হইব। আমার সমুদয় জীবন এরূপ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অতিবাহিত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক ঈশ্বর ত এরূপ নহেন। যাহারা এরূপ বলে, তাহারা জানে না তাহারা দায়িত্ববোধহীন হৃদয়হীন ব্যক্তি, তাহারা কি বলিতেছে তাহা জানে না। এখানে আবার 'ব্যবহারগম্য' শব্দটি ভুল অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। বাস্তবিক কথা এই, আমরা খাইতে চাই, তাই খাইয়া থাকি। আমি নিজে একজন সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী না হইতে পারি, কিন্তু আমি নিরামিষ-ভোজনের আদর্শটি বুঝি। যখন আমি মাংস খাই, তখন আমি জানি আমি অন্যায় করিতেছি। ঘটনাবিশেষে আমাকে উহা খাইতে বাধ্য হইতে হইলেও আমি জানি উহা অন্যায়। আমি আদর্শকে নামাইয়া আমার দুর্ব্বলতার সমর্থন করিতে চেষ্টা করিব না। আদর্শ এই—মাংসভোজন না করা,

কোন প্রাণীর অনিষ্ট না করা, কারণ পশুগণও আমার ভ্রাতা—বিড়াল ও কুকুরও তদ্রূপ। যদি তাহাদিগকে এরূপ চিন্তা করিতে পার, তবে তুমি সর্ব্বপ্রাণীর ভ্রাতৃভাবের দিকে কতকটা অগ্রসর হইয়াছ—শুধু মনুষ্যজাতির প্রতি ভ্রাতৃভাব বলিয়া চীৎকার নহে—উহা ত বৃথা চীৎকার মাত্র। তোমরা সচরাচর দেখিবে, এরূপ উপদেশ অনেকের রুচিসঙ্গত হয় না—কারণ তাহাদিগকে বাস্তব ত্যাগ করিয়া আদর্শের দিকে যাইতে শিক্ষা দেওয়া হয়, কিন্তু তুমি যদি এমন এক মতের কথা বল যাহাতে তাহাদের বর্ত্তমান্ কার্য্যের—বর্ত্তমান আচরণের পোষকতা হয়, তবে তাহারা বলে উহা 'ব্যবহারগম্য' বটে।

মনুষ্যস্বভাবে ভয়ানক রক্ষণশীল প্রবৃত্তি রহিয়াছে; আমরা সম্মুখে এক পদও অগ্রসর হইতে চাহি না। যেমন বরফেজমা ব্যক্তিগণের সম্বন্ধে পড়া যায়, মনুষ্যজাতির সম্বন্ধে আমারও তাহাই বোধ হয়। শুনা যায়, ঐরূপ অবস্থায় লোকে ঘুমাইতে চায়। যদি কেহ তাহাদের টানিয়া তুলিতে যায় তাহারা নাকি বলে, 'আমাদের ঘুমাইতে দাও—বরফে ঘুমাইতে বড় আরাম!' তাহাদের সেই নিদ্রাই মহানিদ্রা হইয়া যায়। আমাদের প্রকৃতিও তদ্রূপ। আমরাও সারাজীবন তাহাই করিতেছি—পা হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় বরফে জমিয়া যাইতেছে, তথাপি আমরা ঘুমাইতে চাহিতেছি। অতএব সর্ব্বদাই আদর্শ অবস্থায় পঁহুছিবার চেষ্টা করিবে; আর যদি কোন ব্যক্তি আদর্শকে তোমার নিম্ন-ভূমিতে আনয়ন করে, যদি কেহ তোমায় শিক্ষা দেয় ধর্ম্ম উচ্চতম আদর্শ নহে, তবে তাহার কথায় কর্ণপাত করিও না।

ঐরূপ ধর্ম্মাচরণ আমার পক্ষে অসম্ভব কিন্তু যদি কেহ আসিয়া আমায় বলে, ধর্ম্ম জীবনের সর্ব্বোচ্চ কার্য্য, তবে আমি তাহার কথা শুনিতে প্রস্তুত আছি। এই বিষয়টিতে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। যখন কোন ব্যক্তি কোনরূপ দুর্ব্বলতার পোষকতা করিতে চেষ্টা করে, তখন বিশেষ সাবধান হইও। আমরা একে ত ইন্দ্রিয়সমূহে আবদ্ধ হইয়া আপনাদিগকে একেবারে অপদার্থ করিয়া ফেলিয়াছি, তার পর আবার যদি কেহ আসিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করে, আবার যদি তুমি ঐ উপদেশের অনুসরণ কর, তবে তুমি কিছুমাত্র উন্নতি করিতে পারিবে না। আমি এরূপ অনেক দেখিয়াছি, জগৎসম্বন্ধে আমি কিছু অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, আর আমার দেশে ধর্ম্মসম্প্রদায়সকল রক্তবীজের ঝাড়ের মত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। প্রতিবৎসর নূতন নূতন সম্প্রদায় হইতেছে। কিন্তু একটি জিনিস আমি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছি যে, যে-সকল সম্প্রদায় সংসার ও ধর্ম্ম একসঙ্গে মিশাইয়া ফেলিতে চেষ্টা করে না, তাহারাই উন্নতি করিয়া থাকে—আর যেখানে উচ্চতম আদর্শসকলকে বৃথা সাংসারিক বাসনার সহিত সামঞ্জস্য করার—ঈশ্বরকে মানুষের ভূমিতে টানিয়া আনিবার—এই মিথ্যা চেষ্টা আছে, সেখানেই রোগ প্রবেশ করে। মানুষ যেখানে পড়িয়া আছে, সেখানে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না—তাহাকে ঈশ্বর হইতে হইবে।

এ প্রশ্নের আবার আর এক দিক আছে। আমরা যেন অপরকে ঘৃণার চক্ষে না দেখি। আমরা সকলেই সেই লক্ষ্য-স্থলে চলিয়াছি। দুর্ব্বলতার ও সবলতার মধ্যে প্রভেদ কেবল

পরিমাণগত। আলো ও অন্ধকারের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত—জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, যে-কোন বস্তুর সহিত অপর বস্তুর প্রভেদ কেবল পরিমাণগত, প্রকারগত নয়। কারণ প্রকৃতপক্ষে সমুদয়ই সেই এক অখণ্ড বস্তুমাত্র। সমুদয়ই এক—চিন্তারূপেই হউক, জীবনরূপেই হউক, আত্মারূপেই হউক, সবই এক—প্রভেদ কেবল পরিমাণের তারতম্যে, মাত্রার তারতম্যে। এই হেতু অপরে ঠিক আমাদের মত উন্নতি করিতে পারে নাই বলিয়া তাহাদের প্রতি ঘৃণা করা উচিত নয়। কাহাকেও নিন্দা করিও না, লোককে সাহায্য করিতে পার ত কর; যদি না পার হাত গুটাইয়া লও, তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, তাহাদিগকে আপন পথে চলিতে দাও। গাল দিলে, নিন্দা করিলে কোন উন্নতি হয় না। এরূপ কাহারও কখনও উন্নতি হয় না। অপরের নিন্দা করিয়া হয় কেবল বৃথা শক্তিক্ষয়। সমালোচনা ও নিন্দা আমাদের বৃথা শক্তিক্ষয়ের উপায়মাত্র, আর শেষে আমরা দেখিতে পাই অপরে যে দিকে চলিতেছে আমরাও ঠিক সেই দিকেই চলিতেছি, আমাদের অধিকাংশ মতভেদ ভাষার বিভিন্নতামাত্র।

এমন কি, পাপের কথা ধর। বেদান্তের পাপের ধারণা, আর সাধারণ ধারণা যে মানুষ পাপী—বাস্তবিক এই দুইটি কথাই এক। একটি 'না'-এর দিক, বেদান্ত 'হাঁ'-এর দিক। একজন মানুষকে তাহার দুর্ব্বলতা দেখাইয়া দেয়, অপরে বলে দুর্ব্বলতা থাকিতে পারে কিন্তু সে দিকে লক্ষ্য করিও না—আমাদিগকে উন্নতি করিতে

হইবে। মানুষ যখনই প্রথম জন্মিয়াছে তখনই তাহার রোগ কি জানা গিয়াছে। সকলেই আপনার কি রোগ তাহা জানে—অপর কাহাকেও তাহা বলিয়া দিতে হয় না। আমরা বহির্জ্জগতের সমক্ষে কপটতাচরণ করিতে পারি, কিন্তু আমাদের অন্তরের অন্তরে আমরা আমাদের দুর্ব্বলতা জানি। কিন্তু বেদান্ত বলেন, কেবল দুর্ব্বলতা স্মরণ করাইয়া দিলে বড় উপকার হইবে না—তাহাকে ঔষধ দাও—আর মানুষকে কেবল সর্ব্বদা রোগগ্রস্ত ভাবিতে বলা রোগের ঔষধ নহে, রোগপ্রতীকারের হেতু নহে। মানুষকে সর্ব্বদা তাহার দুর্ব্বলতার বিষয় ভাবিতে বলা তাহার দুর্ব্বলতার প্রতীকার নহে—তাহার বল স্মরণ করাইয়া দেওয়াই প্রতিকারের উপায়। তাহার মধ্যে যে বল পূর্ব্ব হইতেই বিরাজিত, তাহার বিষয় স্মরণ করাইয়া দাও। মানুষকে পাপী না বলিয়া বেদান্ত বরং ঠিক বিপরীত পথ ধরেন এবং বলেন—তুমি পূর্ণ ও শুদ্ধস্বরূপ, যাহাকে তুমি পাপ বল তাহা তোমাতে নাই। উহারা তোমার খুব নিম্নতম প্রকাশ; পার যদি তবে উচ্চতর ভাবে আপনাকে প্রকাশিত কর। একটি জিনিস আমাদের মনে রাখা উচিত—তাহা এই যে, আমরা সবই পারি। কখনও 'না' বলিও না, কখনও 'পারি না' বলিও না। ওরূপ কখনও হইতেই পারে না, কারণ তুমি অনন্তস্বরূপ। তোমার স্বরূপের তুলনায় দেশকালও কিছুই নহে। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পার, তুমি সর্ব্বশক্তিমান।

অবশ্য যাহা বলা হইল, তাহা নীতির মূলসূত্র মাত্র। আমাদিগকে মতবাদ হইতে নামিয়া আসিয়া জীবনের বিশেষ বিশেষ অবস্থায় ইহা প্রয়োগ করিতে হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে,

কিরূপে এই বেদান্ত আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে, নাগরিক জীবনে, গ্রাম্য জীবনে, প্রত্যেক জাতির জীবনে, প্রত্যেক জাতির গার্হস্থ্য জীবনে কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যায়। কারণ যদি ধর্ম্ম মানুষের সর্ব্বাবস্থায় তাহাকে সহায়তা করিতে না পারে, তবে উহার বিশেষ কোন মূল্য নাই—উহা কেবল কতকগুলি ব্যক্তির জন্য মতবাদ মাত্র। ধর্ম্ম যদি সমগ্র মানবজাতির কল্যাণ করিতে চায়, তবে উহার এমন হওয়া উচিত যে, মানুষ সর্ব্বাবস্থায় উহার সহায়তা লইতে পারে—দাসত্বে বা স্বাধীনতায়—মহা অপবিত্রতা বা অত্যন্ত পবিত্রতার মধ্যে—সর্ব্ব সময়েই যেন উহা সমানভাবে মানবজাতিকে সাহায্য করিতে পারে। তবেই কেবল বেদান্তের তত্ত্বসকল অথবা ধর্ম্মের আদর্শসকল অথবা উহাদের যে নামই দাও না কেন, কাজে আসিবে।

আত্মবিশ্বাসরূপ আদর্শই মানবজাতির সর্ব্বাধিক কল্যাণসাধন করিতে পারে। যদি এই আত্মবিশ্বাস আরও বিস্তারিতভাবে প্রচারিত ও কার্য্যে পরিণত করা হইত, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, জগতে যত দুঃখ-কষ্ট রহিয়াছে তাহার অনেক হ্রাস হইত। সমগ্র মানবজাতির ইতিহাসে সকল শ্রেষ্ঠ নরনারীর মধ্যে যদি কোন ভাববিশেষ কার্য্যকর হইয়া থাকে তাহা এই আত্মবিশ্বাস—তাঁহারা এই জ্ঞানে জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ হইবেন আর তাহা হইয়াও ছিলেন। মানুষ যত ইচ্ছা অবনতভাবাপন্ন হউক না কেন, কিন্তু এমন এক সময় অবশ্য আসিয়া থাকে যখন কেবল ঐ অবস্থায় বিরক্ত হইয়াই তাহাকে উন্নতির চেষ্টা করিতে হয়, তখন সে আপনার উপর বিশ্বাস করিতে শিখে। কিন্তু আমাদের পক্ষে

গোড়া হইতেই ইহা জানিয়া রাখা ভাল। আমরা আত্মবিশ্বাস শিখিতে কেন এত ঘুরিয়া মরিব? মানুষে মানুষে প্রভেদ কেবল এই বিশ্বাসের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব লইয়া, ইহা একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইতে পারে। এই আত্মবিশ্বাসের বলে সকলই সম্ভব হইবে। আমি নিজের জীবনে ইহা দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, আর যতই আমার বয়স হইতেছে ততই এই বিশ্বাস দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইতেছে। যে আপনাকে বিশ্বাস না করে সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম্ম বলিত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস না করে সে নাস্তিক। নূতন ধর্ম্ম বলিতেছে, যে আপনাতে বিশ্বাস স্থাপন না করে সেই নাস্তিক। কিন্তু এই বিশ্বাস কেবল এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে লইয়া নহে, কারণ বেদান্ত আবার একত্ববাদ শিক্ষা দিতেছেন। এই বিশ্বাসের অর্থ সকলের প্রতি বিশ্বাস, কারণ তোমরা সকলে শুদ্ধস্বরূপ। আত্মপ্রীতি অর্থে সর্ব্বভূতে প্রীতি—কারণ 'তুমি' দুইটি নাই—সকল তির্য্যগ্‌জাতির উপর প্রীতি, সকল বস্তুর প্রতি প্রীতি। এই মহান বিশ্বাসবলেই জগতের উন্নতি হইবে। আমার ইহা ধ্রুব ধারণা। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য, যিনি সাহস করিয়া বলিতে পারেন—আমি আমার নিজের সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জানি; তোমরা কি জান তোমাদের এই দেহের ভিতর কত শক্তি, কত ক্ষমতা এখনও লুক্কায়িত রহিয়াছে? কোন্ বৈজ্ঞানিক মানবের ভিতরে যাহা আছে সমুদয় জ্ঞাত হইয়াছেন? লক্ষ লক্ষ বৎসর পূর্ব্ব হইতে মানুষ ধরাধামে বাস করিতেছে, কিন্তু তাহার শক্তির অতি সামান্য অংশমাত্রই এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে। অতএব তুমি কি করিয়া আপনাকে জোর করিয়া দুর্ব্বল

বলিতেছ? আপাতপ্রতীয়মান এই অবনতির পশ্চাতে কি রহিয়াছে তাহা তুমি কি জান? তোমার ভিতরে কি আছে তাহা তুমি কি জান? তোমার পশ্চাতে শক্তি ও আনন্দের অপার সমুদ্র রহিয়াছে।

'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ'—এই আত্মার কথা প্রথমে শুনিতে হইবে। দিনরাত্রি শ্রবণ কর যে, তুমিই সেই আত্মা। দিনরাত্রি উহা আওড়াইতে থাক যে পর্য্যন্ত না ঐ ভাব তোমার প্রতি রক্তবিন্দুতে, প্রতি শিরাধমনীতে খেলিতে থাকে, যে পর্য্যন্ত না উহা তোমার মজ্জাগত হইয়া যায়। সমুদয় দেহটিই ঐ এক আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—'আমি অজ, অবিনাশী, আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, নিত্য জ্যোতির্ম্ময় আত্মা'—দিবারাত্রি ইহা চিন্তা কর—চিন্তা করিতে থাক, যে পর্য্যন্ত না উহা তোমার প্রাণে প্রাণে গাঁথিয়া যায়। উহার ধ্যান করিতে থাক—ঐ ভাবে বিভোর হইলেই তুমি প্রকৃত কর্ম্মে সক্ষম হইবে। 'হৃদয় পূর্ণ হইলে মুখ কথা বলে—হৃদয় পূর্ণ হইলে হাতও কাজ করিয়া থাকে।' সুতরাং ঐরূপ অবস্থায়ই যথার্থ কার্য্যে সক্ষম হইবে। আপনাকে ঐ আদর্শের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল—যাহা কিছু কর, পূর্ব্বে উহার সম্বন্ধে উত্তমরূপে চিন্তা কর। তখন ঐ চিন্তাশক্তি-প্রভাবে তোমার সমুদয় কর্ম্মই পরিবর্ত্তিত হইয়া উন্নত দেবভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। যদি জড় শক্তিশালী হয়, তবে চিন্তা সর্ব্বশক্তিমান। সেই চিন্তা সেই ধ্যান লইয়া আইস, আপনাকে নিজের সর্ব্বশক্তিমত্তা ও মহত্ত্বের ভাবে পূর্ণ করিয়া ফেল। কুসংস্কারপূর্ণ ভাব তোমাদের মাথায় যদি ঈশ্বরেচ্ছায় মোটেই প্রবেশ না করিত,

তাহা হইলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় আমাদের এই কুসংস্কারের প্রভাব এবং দুর্ব্বলতা ও নীচত্বের ভাব দ্বারা পরিবেষ্টিত না থাকিলেই ভাল ছিল। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষের অপেক্ষাকৃত সহজ উপায়ে উচ্চতম মহত্তম সত্যসমূহে পঁহুছিতে পারিলেই ভাল হইত। কিন্তু তাহাকে এই সকলের মধ্য দিয়া যাইতেই হয়; যাহারা তোমার পশ্চাতে আসিতেছে, তাহাদের জন্য পথ দুর্গমতর করিয়া যাইও না।

অনেক সময় এইসকল তত্ত্ব লোকের নিকট ভয়ানক বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। আমি জানি, অনেকে এইসকল উপদেশ শুনিয়া ভীত হইয়া থাকে কিন্তু যাহারা যথার্থ অভ্যাস করিতে চাহে তাহাদের পক্ষে ইহাই প্রথম অভ্যাস। আপনাকে অথবা অপরকে দুর্ব্বল বলিও না। যদি পার লোকের ভাল কর, জগতের অনিষ্ট করিও না। তোমার অন্তরে অন্তরে জান যে, তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাব—আপনাকে কাল্পনিক পুরুষগণের সমক্ষে অবনত করিয়া রোদন করা কুসংস্কার মাত্র। আমাকে এমন একটি উদাহরণ দেখাও, যেখানে বাহির হইতে এই প্রার্থনাগুলির উত্তর পাইয়াছ। যাহা কিছু উত্তর পাইয়াছ, তাহা নিজের হৃদয় হইতে। তোমরা অনেকেই বিশ্বাস কর ভূত নাই, কিন্তু অন্ধকারে যাইলেই তোমাদের একটু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে থাকে। ইহার কারণ অতি শৈশবকাল হইতেই এইসকল ভয় আমাদের মাথায় ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই অভ্যাস করিতে হইবে যে, সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলিবে এই ভয়ে, বন্ধু-বান্ধবের ঘৃণার ভয়ে, কুসংস্কার নষ্ট হইবার ভয়ে অপরের

মস্তিষ্কে আর ঐগুলি প্রবেশ করাইবে না। এই প্রবৃত্তিকে জয় কর। ধর্ম্মবিষয়ে শিখাইবার আর কি আছে?—কেবল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একত্ব ও আত্মবিশ্বাস।

শিক্ষা দিবার আছে কেবল এইটুকু। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া মানুষ ইহাই চেষ্টা করিয়া আসিয়াছে, আর এখনও করিতেছে। তোমরাও এক্ষণে ইহা শিক্ষা দিতেছ, ইহা আমরা জানি। সকল দিক হইতেই এই শিক্ষা আমরা পাইতেছি। কেবল দর্শন ও মনোবিজ্ঞান নহে, জড়বিজ্ঞানও ইহাই ঘোষণা করিতেছে। এমন বৈজ্ঞানিক কি দেখাইতে পার, যিনি আজ জগতের একত্ববাদ অস্বীকার করিতে পারেন? কে এখন জগতের নানাত্ববাদ প্রচার করিতে সাহস করেন? এই সমুদয়ই ত কুসংস্কারমাত্র! এক প্রাণ মাত্র বিদ্যমান, এক জগৎ মাত্র বিদ্যমান, আর তাহাই আমাদের চক্ষে নানাবৎ প্রতিভাত হইতেছে, যেমন স্বপ্নদর্শনকালে এক স্বপ্নদর্শনের পরে অপর স্বপ্ন আছে। স্বপ্নে যাহা দেখ, তাহা ত সত্য নহে। একটি স্বপ্নের পর অপর স্বপ্ন আসে—বিভিন্ন দৃশ্য তোমাদের নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইতে থাকে। এইরূপ এই জগৎ সম্বন্ধেও। এখন ইহা পনর আনা দুঃখ ও এক আনা সুখরূপে প্রতিভাত হইতেছে। হয়ত কিছুদিন পরেই ইহাই পনর আনা সুখপরিপূর্ণরূপে প্রতিভাত হইবে—তখন আমরা ইহাকে স্বর্গ বলিব। কিন্তু সিদ্ধ হইলে এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন এই সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ আমাদের নয়নসমক্ষ হইতে অন্তর্হিত হইবে—উহা ব্রহ্মরূপে প্রতিভাত হইবে এবং আমাদের আত্মাকেও ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইবে।

অতএব লোক অনেকগুলি নহে, জীবন অনেকগুলি নহে। এই বহু সেই একেরই বিকাশমাত্র। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশ করিতেছেন—জড় বা চৈতন্য বা মন বা চিন্তাশক্তি অথবা অন্য কোনরূপে। সেই একই আপনাকে বহুরূপে প্রকাশিত করিতেছেন। অতএব আমাদের প্রথম সাধন—এই তত্ত্ব আপনাকে ও অপরকে শিক্ষা দেওয়া।

জগৎ এই মহান আদর্শের ঘোষণায় প্রতিধ্বনিত হউক—কুসংস্কারসকল দূর হউক। দুর্ব্বল লোকদিগকে ইহা শুনাইতে থাক, ক্রমাগত শুনাইতে থাক—তুমি শুদ্ধস্বরূপ; উঠ, জাগরিত হও। হে মহান, এই নিদ্রা তোমার সাজে না। উঠ, এই মোহ তোমার সাজে না। তুমি আপনাকে দুর্ব্বল ও দুঃখী মনে করিতেছ? হে সর্ব্বশক্তিমান, উঠ, জাগরিত হও, আপন স্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি আপনাকে পাপী বলিয়া বিবেচনা কর, ইহা ত তোমার শোভা পায় না। তুমি আপনাকে দুর্ব্বল বলিয়া ভাব, ইহা ত তোমার উপযুক্ত নহে। জগৎকে ইহা বলিতে থাক, আপনাকে ইহা বলিতে থাক—দেখ ইহার কি শুভফল হয়, দেখ কেমন বৈদ্যুতিক শক্তিতে সমুদয় তত্ত্ব প্রকাশিত হয়, সমুদয় পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। মনুষ্যজাতিকে ইহা বলিতে থাক—তাহাদিগকে তাহাদের শক্তি দেখাইয়া দাও। তাহা হইলে আমাদেরই দৈনিক জীবনে ইহার ফল ফলিতে থাকিবে।

বিবেকের কথা আমরা পরে পাইব—দেখিব জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, আমাদের প্রতি কার্য্যে কিরূপে সদসৎ বিচার করিতে হয়, তখন আমাদিগকে সত্যাসত্যনির্ব্বাচনের উপায় জানিতে

হইবে; তাহা এই পবিত্রতা, একত্ব। যাহাতে একত্ব হয়, যাহাতে মিলন হয়, তাহাই সত্য। প্রেম সত্য, কারণ উহা মিলনসম্পাদক; ঘৃণা অসত্য, কারণ উহা বহুত্ববিধায়ক—পৃথককারক। ঘৃণাই তোমা হইতে আমাকে পৃথক করে—অতএব ইহা অন্যায় ও অসত্য, ইহা একটি বিনাশিনী শক্তি, ইহাতে পৃথক করে—নাশ করে।

প্রেমে মিলায়, প্রেম একত্বসম্পাদক। সকলে এক হইয়া যায়—মা সন্তানের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হন, পরিবার নগরের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। এমন কি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড পশুগণের সহিত পর্য্যন্ত একীভূত হইয়া যায়। কারণ প্রেমই বাস্তবিক অস্তিত্ব, প্রেমই স্বয়ং ভগবান, আর সমুদয়ই প্রেমেরই বিভিন্ন বিকাশ—স্পষ্ট বা অস্পষ্টরূপে প্রকাশিত। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে কিন্তু বাস্তবিক সকলই প্রেমের প্রকাশ। অতএব আমাদের সকল কর্ম্মেই উহা একত্বসম্পাদক বা বহুত্ববিধায়ক, তাহা দেখিতে হয়। যদি বহুত্ববিধায়ক হয়, তবে উহাকে ত্যাগ করিতে হয় আর যদি একত্বসম্পাদক হয়, তবে উহাকে সৎকর্ম্ম বলিয়া জানিবে। চিন্তাসম্বন্ধেও এইরূপ। দেখিতে হয়, উহা বহুত্ববিধায়ক বা একত্বসম্পাদক; দেখিতে হয়—উহা আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিয়া এক মহাশক্তি উৎপাদন করিতেছে কি-না। যদি তাহা করে, তবে ঐরূপ চিন্তার পোষণ করিতে হইবে—যদি না করে তবে উহাকে পাপচিন্তা বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।

বৈদান্তিক নীতিবিজ্ঞানের সার কথাই এই—উহা কোন অজ্ঞেয় বস্তুর উপর নির্ভর করে না, অথবা উহা অজ্ঞেয় কিছু

শিখায়ও না, কিন্তু সেণ্ট পল যেমন রোমকগণকে বলিয়াছিলেন তদ্রূপ বলে, 'যাঁহাকে তোমরা অজ্ঞেয় মনে করিয়া উপাসনা করিতেছ, আমি তাঁহার সম্বন্ধেই তোমায় শিক্ষা দিতেছি।' আমি এই চেয়ারখানির জ্ঞানলাভ করিতেছি, কিন্তু এই চেয়ারখানিকে জানিতে হইলে প্রথমে আমার 'আমি'র জ্ঞান হয়, তৎপরে চেয়ারটির জ্ঞান হয়। এই আত্মার ভিতর দিয়াই চেয়ারটি জ্ঞাত হয়। এই আত্মার মধ্য দিয়াই আমি তোমার জ্ঞান লাভ করি— সমুদয় জগতের জ্ঞান লাভ করি। অতএব আত্মাকে অজ্ঞাত বলা প্রলাপবাক্য মাত্র। আত্মাকে সরাইয়া লও, সমুদয় জগৎই উড়িয়া যাইবে; আত্মার ভিতর দিয়াই সমুদয় জ্ঞান আসে, অতএব ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞাত। ইহাই 'তুমি' যাহাকে তুমি 'আমি' বল। তোমরা এই ভাবিয়া আশ্চর্য্য হইতে পার যে, আমার 'আমি' আবার তোমার 'আমি' কিরূপে হইবে? তোমরা আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার, এই সান্ত 'আমি' কিরূপে অনন্ত অসীমস্বরূপ হইবে? কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তাহাই; 'সান্ত' আমি কেবল ভ্রমমাত্র, গল্পকথামাত্র। সেই আনন্দের উপর যেন একটা আবরণ পড়িয়াছে আর উহার কতকাংশ এই 'আমি'-রূপে প্রকাশিত হইতেছে, কিন্তু উহা বাস্তবিক সেই অনন্তের অংশ। বাস্তবিকপক্ষে অসীম কখন সসীম হন না— 'সসীম' কথার কথামাত্র। অতএব সেই আত্মা নর-নারী, বালক-বালিকা, এমন কি, পশু-পক্ষী সকলেরই জ্ঞাত। তাঁহাকে না জানিয়া আমরা ক্ষণমাত্রও জীবনধারণ করিতে পারি না। সেই সর্ব্বেশ্বর প্রভুকে না জানিয়া আমরা এক মুহূর্ত্তও শ্বাসপ্রশ্বাস পর্য্যন্ত

ফেলিতে পারি না; আমাদের গতি, শক্তি, চিন্তা, জীবন সকলই তাঁহারই পরিচালিত। বেদান্তের ঈশ্বর সর্ব্ব পদার্থ অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত; উহা কখনও কল্পনাপ্রসূত নহে।

যদি ইহা প্রত্যক্ষ ঈশ্বর না হয়, তবে আর প্রত্যক্ষ ঈশ্বর কি? ঈশ্বর, যিনি সকল প্রাণীতে বিরাজিত, আমাদের ইন্দ্রিয়গণ হইতেও অধিক সত্য। আমি যাঁহাকে সম্মুখে দেখিতেছি, তাঁহা হইতেও প্রত্যক্ষ ঈশ্বর আর কি দেখিতে চাও? কারণ তুমিই তিনি, সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর; আর যদি বলি তুমি তাহা নহ, তবে আমি মিথ্যা কথা বলিতেছি। সকল সময়ে আমি ইহা উপলব্ধি করি বা না করি, তথাপি আমি ইহা জানি। তিনিই এক অখণ্ড বস্তুস্বরূপ, সর্ব্ববস্তুর সম্মিলনস্বরূপ, সমুদয় প্রাণী ও সমুদয় অস্তিত্বের সত্যস্বরূপ।

বেদান্তের এই সকল নীতিতত্ত্ব আরও বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অতএব একটু ধৈর্য্যাবলম্বন আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমাদিগকে ইহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিতে হইবে—বিশেষরূপে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় কিরূপে উহা কার্য্যে পরিণত করা যায় দেখিতে হইবে, আর ইহাও দেখিতে হইবে কিরূপে এই আদর্শ নিম্নতর আদর্শসমূহ হইতে ক্রমশঃ বিকশিত হইতেছে, কিরূপে এই একত্বের আদর্শ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমুদয় ভাব হইতে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া ক্রমশঃ সার্ব্বজনীন প্রেমরূপে পরিণত হইতেছে, আর এইসকল তত্ত্ব-আলোচনায় আমাদের এই উপকার হইবে যে, আমরা আর নানাবিধ ভ্রমে পড়িব না। কিন্তু সমগ্র জগৎ ত আর ক্রমে ক্রমে নিম্নতর আদর্শ

হইতে উচ্চে আরোহণ করিবার জন্য বসিয়া থাকিতে পারে না; আমাদের উচ্চতর সোপানে আরোহণের কি ফল হইল, যদি আমরা আমাদের পরবর্ত্তিগণকে ঐ সত্য একেবারে না দিতে পারি? অতএব উহা আমাদের বিশেষরূপে তন্ন তন্ন ভাবে আলোচনা করা আবশ্যক, আর প্রথমতঃ উহার জ্ঞানভাগ—বিচারাংশ—বিশেষরূপে বুঝা আবশ্যক, যদিও আমরা জানি বিচারের বিশেষ মূল্য কিছুই নাই, হৃদয়েরই বিশেষ প্রয়োজন। হৃদয়ের দ্বারা ভগবৎসাক্ষাৎকার হয়, বুদ্ধি দ্বারা নহে। বুদ্ধি কেবল ঝাড়ুদারের মত রাস্তা সাফ করিয়া দেয় মাত্র—উহা গৌণভাবে আমাদের উন্নতির সহায়ক হইতে পারে। বুদ্ধি চৌকিদারের ন্যায়, কিন্তু সমাজের সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য চৌকিদারের অত্যন্ত প্রয়োজন নাই। তাহাকে কেবল গোল থামাইতে হয়, অন্যায় নিবারণ করিতে হয়। বিচারশক্তির—বুদ্ধির কার্য্যও ততটুকু। যখন এইরূপ বিচারাত্মক পুস্তক তোমরা পাঠ কর, তখন একবার উহা আয়ত্ত হইলে তোমাদের সকলেরই মনে ত এ কথার উদয় হয় যে, ঈশ্বরেচ্ছায় ইহা হইতে বাহির হইয়া বাঁচিলাম। ইহার কারণ বিচারশক্তি অন্ধ, ইহার নিজের গতিশক্তি নাই, ইহার হাত-পাও নাই। হৃদয়—ভাবই বাস্তবিক কার্য্য করে, উহা বিদ্যুৎ অথবা তদপেক্ষা দ্রুতগামী পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর দ্রুত গমন করিয়া থাকে। প্রশ্ন এই, তোমাদের হৃদয় আছে কি? যদি তাহা থাকে, তবে তুমি তাহা নিয়াই ঈশ্বরকে দেখিবে। আজ যে তোমার এতটুকু ভাব আছে তাহাই প্রবল হইবে, উচ্চ হইতে উচ্চতরভাবাপন্ন—দেবভাবাপন্ন হইতে থাকিবে, যতদিন না উহা সমুদয় অনুভব করিতে পারে।

বুদ্ধি তাহা করিতে পারে না। 'বিভিন্নরূপে শব্দযোজনার কৌশল, শাস্ত্রব্যাখ্যা করিবার বিভিন্ন কৌশল কেবল পণ্ডিতদের আমোদের জন্য, মুক্তির জন্য নহে।'

তোমাদের মধ্যে যাহারা টমাস-আ-কেম্পিসের 'ঈশা-অনুসরণ' পুস্তক পাঠ করিয়াছ, তাহারাই জান প্রতি পৃষ্ঠায় কেমন তিনি ইহার উপর ঝোঁক দিতেছেন। জগতের প্রায় সকল মহাপুরুষই ইহার উপর ঝোঁক দিয়াছেন। বিচার আবশ্যক, বিচার না করিলে আমরা নানারূপ বিষম ভ্রমে পড়ি। বিচারশক্তি উহা নিবারণ করে, এতদ্ব্যতীত বিচারভিত্তিতে আর কিছু নির্ম্মাণ করিবার চেষ্টা করিও না। উহা একটি গৌণ সাহায্যমাত্র, কোন কার্য্যকর নহে—প্রকৃত সাহায্য হয় ভাবে, প্রেমে। তুমি কি অপরের জন্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ? যদি তুমি তাহা কর তবে তোমার হৃদয়ে একত্বের ভাব বর্দ্ধিত হইতেছে। যদি তুমি তাহা না কর, তবে তুমি একজন মহা বুদ্ধিজীবী হইতে পার, কিন্তু তোমার কিছুই হইবে না—কেবল শুষ্ক বুদ্ধির ঢিবি হইয়াই থাকিবে। আর যদি তোমার হৃদয় থাকে তবে একখানি বই পড়িতে না পারিলেও, কোন ভাষা না জানিলেও তুমি ঠিক পথে চলিতেছে। ঈশ্বর তোমার সহায় হইবেন।

জগতের ইতিহাসে মহাপুরুষদের শক্তির কথা কি পাঠ কর নাই? এ শক্তি তাঁহারা কোথা হইতে পাইয়াছিলেন? বুদ্ধি হইতে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কি দর্শনসম্বন্ধীয় সুন্দর পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন? অথবা ন্যায়ের কূট বিচার লইয়া কোন গ্রন্থ লিখিয়াছেন? কেহই এরূপ করেন নাই। তাঁহারা কেবল

গুটিকতক কথামাত্র বলিয়া গিয়াছেন। খ্রীষ্টের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও খ্রীষ্ট হইবে; বুদ্ধের ন্যায় হৃদয়সম্পন্ন হও, তুমিও একজন বুদ্ধ হইবে। ভাবই জীবন, ভাবই বল, ভাবই তেজ—ভাব ব্যতীত যতই বুদ্ধির চালনা কর না কেন, কিছুতেই ঈশ্বরলাভ হইবে না।

বুদ্ধি যেন চালনাশক্তিশূন্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ন্যায়। যখন ভাব তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া গতিযুক্ত করে, তখনই তাহা অপরের হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে। জগতে চিরকালই এরূপ হইয়া আসিয়াছে, সুতরাং এই বিষয়টি তোমাদের স্মরণ থাকা বিশেষ আবশ্যক। বৈদান্তিক নীতিতত্ত্বে ইহা একটি বিশেষ কাজের শিক্ষা; কারণ বেদান্ত বলেন, তোমরা সকলে মহাপুরুষ—তোমাদের সকলকেই মহাপুরুষ হইতে হইবে। কোন শাস্ত্র তোমার কর্য্যের প্রমাণ নহে, কিন্তু তুমিই শাস্ত্রের প্রমাণ। কোন্ শাস্ত্র সত্য বলিতেছে তাহা কি করিয়া জানিতে পার? তুমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাক বলিয়া। বেদান্ত ইহাই বলেন। জগতের খ্রীষ্ট ও বুদ্ধগণের বাক্যের প্রমাণ কি? না, তুমি-আমিও সেইরূপ অনুভব করিয়া থাকি, তাহাতেই তুমি-আমি বুঝিতে পারি—সেগুলি সত্য। আমাদের ঐশ্বরিক আত্মা, তাহাদের ঐশ্বরিক আত্মার প্রমাণ। এমন কি, তোমার ঈশ্বরত্ব ঈশ্বরেরও প্রমাণ। যদি তুমি বাস্তবিক মহাপুরুষ না হও তবে ঈশ্বরসম্বন্ধেও কোন কথা সত্য নহে। তুমি যদি ঈশ্বর না হও তবে কোন ঈশ্বরও নাই, কখনই হইবেনও না। বেদান্ত বলেন, এই আদর্শ অনুসরণীয়। আমাদের প্রত্যেককেই মহাপুরুষ হইতে হইবে—আর তুমি স্বরূপতঃ তাহাই আছ। কেবল

উহা জ্ঞাত হও। আত্মার পক্ষে কিছু অসম্ভব আছে, কখনও ভাবিও না। এরূপ বলা ভয়ানক নাস্তিকতা। যদি পাপ বলিয়া কিছু থাকে, তবে এরূপ বলাই একমাত্র পাপ যে, আমি দুর্ব্বল বা অপরে দুর্ব্বল।

# কর্ম্মজীবনে বেদান্ত

## দ্বিতীয় প্রস্তাব

আমি ছান্দোগ্য উপনিষদ্ হইতে একটি গল্প পাঠ করিব—এক বালকের কিরূপে জ্ঞানলাভ হইয়াছিল। অবশ্য গল্পটি প্রাচীন ধরণের বটে, কিন্তু উহার ভিতরে একটি সারতত্ত্ব নিহিত আছে। একটি অল্পবয়স্ক বালক তাহার মাতাকে বলিল, “মা, আমি বেদশিক্ষা করিতে যাইব, আমার পিতার নাম কি ও আমার কি গোত্র, তাহা বলুন।”

তাহার মাতা বিবাহিতা রমণী ছিলেন না, আর ভারতবর্ষে অবিবাহিতা রমণীর সন্তান সমাজে নগণ্যরূপে বিবেচিত—কোন কার্য্যেই তাহার অধিকার নাই। বেদপাঠ করা ত দূরের কথা। তাই তাহার মাতা বলিলেন, “আমি যৌবনে অনেকের পরিচর্য্যা করিতাম, তদবস্থায় তোমায় লাভ করিয়াছি, সুতরাং আমি তোমার পিতার নাম এবং তোমার কি গোত্র তাহা জানি না; এইটুকু মাত্র জানি যে, আমার নাম জবালা।” বালক ঋষিগণের নিকট গমন করিল—সেখানে তাহাকে সেই প্রশ্নই জিজ্ঞাসিত হইল। সে ব্রহ্মচারী শিষ্য হইতে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার পিতার নাম কি এবং তোমার কি গোত্র ?” বালক মাতার নিকট যাহা শুনিয়াছিল, তাহাই আবৃত্তি করিল।

অনেকেই এই উত্তরলাভে সন্তুষ্ট হইলেন না, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, "বৎস, তুমি সত্য বলিয়াছ, তুমি ধর্ম্মপথ হইতে বিচলিত হও নাই—এই সত্যবাদিতাই ব্রাহ্মণের লক্ষণ; অতএব তোমাকে আমি ব্রাহ্মণ বলিয়া নিশ্চয় করিলাম—আমি তোমাকে শিষ্য করিব।" এই বলিয়া তিনি তাহাকে আপনার নিকটে রাখিয়া শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বালকের নাম সত্যকাম।

এক্ষণে প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালী অনুসারে সত্যকামের শিক্ষা হইতে লাগিল। গুরু সত্যকামকে কয়েকশত গো প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, "এইগুলি লইয়া তুমি অরণ্যে গমন কর—যখন সর্ব্বশুদ্ধ সহস্র গো হইবে, তখন প্রত্যাবৃত্ত হইবে।" সে তাহাই করিল। কয়েক বৎসর পরে সেই গো-সকলের মধ্যে একটি প্রধান বৃষ সত্যকামকে বলিল, আমরা এক্ষণে এক সহস্র হইয়াছি, আমাদিগকে তোমার গুরুর নিকট লইয়া যাও। আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব।" সত্যকাম বলিল, "বলুন, প্রভু!" বৃষ বলিল, "উত্তরদিক ব্রহ্মের এক অংশ; পূর্ব্বদিক, দক্ষিণদিক, পশ্চিমদিকও তাঁহার এক এক অংশ। চারিদিক ব্রহ্মের চারি অংশ। অগ্নি তোমাকে আরও কিছু শিক্ষা দিবেন।" তখনকার কালে অগ্নি ব্রহ্মের বিশিষ্ট প্রতীকরূপে পূজিত হইতেন। প্রত্যেক ব্রহ্মচারীকেই অগ্নিচয়ন করিয়া তাহাতে আহুতি দিতে হইত। যাহা হউক, সত্যকাম স্নানাদি করিয়া অগ্নিতে হোম করিয়া তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট আছে, এমন সময়ে অগ্নি হইতে একটি বাণী শুনিতে পাইল—'সত্যকাম'? সত্যকাম বলিল, "প্রভু, আজ্ঞা করুন।" তোমাদের স্মরণ থাকিতে পারে,

বাইবেলের প্রাচীন সংহিতায় এইরূপ একটি গল্প আছে—স্যামুয়েল এইরূপ এক অদ্ভুত বাণী শুনিয়াছিলেন। যাহা হউক, অগ্নি বলিলেন, "আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিব। এই পৃথিবী ব্রহ্মের এক অংশ। অন্তরীক্ষ এক অংশ, স্বর্গ এক অংশ, সমুদ্র এক অংশ। একটি হংস তোমাকে কিছু শিক্ষা দিবেন।" একটি হংস একদিন আসিয়া সত্যকামকে বলিল, "আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিক্ষা দিব। হে সত্যকাম! এই অগ্নি, যাহার তুমি উপাসনা করিতেছ তাহা ব্রহ্মের এক অংশ, সূর্য্য এক অংশ, চন্দ্র এক অংশ, বিদ্যুৎও এক অংশ। মদ্গু নামক এক পক্ষী তোমাকে আরও কিছু শিখাইবেন।" একদিন সেই পক্ষী আসিয়া তাহাকে বলিল, আমি তোমাকে ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু শিখাইব। প্রাণ তাঁহার এক অংশ, চক্ষু এক অংশ, শ্রবণ এক অংশ এবং মন এক অংশ।" তাহার পর বালক তাহার গুরুর নিকট উপনীত হইল, গুরু দূর হইতেই তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, "বৎস, তোমার মুখ যে ব্রহ্মবিদের মত উদ্ভাসিত দেখিতেছি।" বালক গুরুকে ব্রহ্মসম্বন্ধে আরো উপদেশ দিবার জন্য বলিল। তিনি বলিলেন, "তুমি ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু পূর্ব্বেই জানিয়াছ।"

এই সকল রূপক ছাড়িয়া দিয়া বৃষ কি শিখাইল, অগ্নি কি শিখাইল, আর সকলে কি শিখাইল—এসব কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখি তবে বুঝিব, চিন্তার গতি কোন্ দিকে যাইতেছে। আমরা এখান হইতে এই তত্ত্বের আভাস পাইতেছি যে, এই সকল বাণীই আমাদের ভিতরে। আমরা আরও অধিক দূর পাঠ করিয়া গেলে বুঝিব, অবশেষে এই তত্ত্ব

পাওয়া যাইতেছে যে, ঐ বাণী বাস্তবিক আমাদের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে উত্থিত। শিষ্য বরাবরই সত্যসম্বন্ধে উপদেশ পাইতেছেন, কিন্তু তিনি ইহার যে ব্যাখ্যা দিতেছেন অর্থাৎ উহা যে বহির্দ্দেশ হইতে পাওয়া যাইতেছে, তাহা সত্য নহে। আর এক তত্ত্ব ইহা হইতে পাওয়া যাইতেছে—কর্ম্মজীবনে ব্রহ্মোপলব্ধি—ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার। ধর্ম্ম হইতে কার্য্যতঃ কি সত্য পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সর্ব্বদা অন্বেষিত হইতেছে; আর এইসকল গল্পপাঠে আমরা ইহাও দেখিতে পাই, দিন দিন কেমন উহা তাঁহাদের দৈনিক জীবনের অন্তর্গত হইয়া যাইতেছে। তাঁহাদিগকে যে-সকল জিনিসের সঙ্গে সর্ব্বদা সংস্পর্শে আসিতে হইত, তাহাতেই তাঁহারা ব্রহ্ম উপলব্ধি করিতেছেন। অগ্নি—যাহাতে তাঁহারা প্রত্যহ হোম করিতেন—তাহাতে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার করিতেছেন। এই পরিদৃশ্যমান পৃথিবীকে তাঁহারা ব্রহ্মের একাংশরূপে জ্ঞাত হইতেছেন—ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পরবর্ত্তী উপাখ্যানটি সত্যকামের এক শিষ্যসম্বন্ধীয়। ইনি সত্যকামের নিকট শিক্ষালাভার্থ তাঁহার নিকট কিয়ৎকাল বাস করিয়াছিলেন। সত্যকাম কার্য্যবশতঃ কোনও স্থানে গমন করিয়াছিলেন। তাহাতে শিষ্যটি একেবারে ভগ্নহৃদয় হইয়া পড়িল। যখন গুরুপত্নী তাঁহার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস তুমি কিছু খাইতেছ না কেন?" তখন বালক বলিলেন, "আমার মন বড় অসুস্থ, তজ্জন্য কিছু খাইতে ইচ্ছা হইতেছে না।" এমন সময় তিনি যে অগ্নিতে হোম করিতেছিলেন, তাহা হইতে এই বাণী উঠিল, 'প্রাণ ব্রহ্ম, সুখ ব্রহ্ম, আকাশ

ব্রহ্ম, তুমি ব্রহ্মকে জ্ঞাত হও।' তখন তিনি বলিলেন, "প্রাণ যে ব্রহ্ম তাহা আমি জানি, কিন্তু তিনি যে আকাশ, সুখ-স্বরূপ তাহা আমি জানি না।" তখন অগ্নি আরও বলিতে লাগিলেন, "এই পৃথিবী, এই অন্ন, এই সূর্য্য—তুমি যাহার উপাসনা করিতেছ, যিনি এইসকলে বাস করিতেছেন, তিনি তোমাদের সকলের মধ্যেও আছেন। যিনি ইহা জানেন এবং এইরূপে উপাসনা করেন তাঁহার সকল পাপ নষ্ট হইয়া যায়, তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করেন ও সুখী হন। যিনি দিকসকলে বাস করেন, আমিই তিনি। যিনি এই প্রাণে, এই আকাশে, স্বর্গসমূহে ও বিদ্যুতে বাস করেন, আমিই তিনি।" এখানেও আমরা ধর্ম্মের সাক্ষাৎকারের কথা পাইতেছি। যাহা তাঁহারা অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতিরূপে উপাসনা করিতেন, যে-সকল বস্তুর সহিত তাঁহারা পরিচিত ছিলেন তাহাদেরই ব্যাখ্যা করা হইতে লাগিল, তাহাদিগেরই একটি উচ্চতর অর্থ দেওয়া হইতে লাগিল, আর ইহাই বাস্তবিক বেদান্তের সাধনকাণ্ড। বেদান্ত জগৎকে উড়াইয়া দেয় না, কিন্তু উহাকে ব্যাখ্যা করে। উহা ব্যক্তিকে উড়াইয়া দেয় না, উহাকে ব্যাখ্যা করে—উহা আমিত্বকে বিনাশ করিতে উপদেশ দেয় না, কিন্তু প্রকৃত আমিত্ব কি তাহা বুঝাইয়া দেয়। উহা এরূপ বলে না যে, জগৎ বৃথা অথবা উহার অস্তিত্ব নাই কিন্তু বলে যে, জগৎ কি তাহা বুঝ, যাহাতে উহা তোমার কোন অনিষ্ট করিতে না পারে। সেই বাণী সত্যকাম বা তাঁহার শিষ্যকে বলে নাই যে অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র অথবা বিদ্যুৎ অথবা আর কিছু যাহা তাঁহারা উপাসনা করিতেছিলেন, তাহা একেবারে ভুল কিন্তু

ইহাই বলিয়াছিল যে, চৈতন্য সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, অগ্নি এবং পৃথিবীর ভিতরে রহিয়াছেন, তিনি তাঁহাদের ভিতরেও রহিয়াছেন সুতরাং তাঁহার চক্ষে সমস্তই আর এক রূপ ধারণ করিল! যে অগ্নি পূর্ব্বে কেবলমাত্র হোম করিবার জড় অগ্নিমাত্র ছিল, তাহা এক নূতন রূপ ধারণ করিল এবং প্রকৃতপক্ষে ভগবান হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী আর এক রূপ ধারণ করিল, প্রাণ আর এক রূপ ধারণ করিল, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ সকলই আর এক রূপ ধারণ করিল, ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত স্বরূপ তখন পরিজ্ঞাত হইল। কারণ আমাদের ইহা বিশেষরূপে জানা উচিত যে, বেদান্তের উদ্দেশ্যই এই সমুদয় বস্তুতে ভগবান দর্শন করা, তাহারা যেরূপ আপাততঃ প্রতীয়মান হইতেছে তাহা না দেখিয়া তাহাদিগকে তাহাদের প্রকৃত স্বরূপে জ্ঞাত হওয়া।

তাহারপর আর একটি প্রস্তাব আছে, ইহা একটু অদ্ভুত রকমের। 'যিনি চক্ষের মধ্যে দীপ্তি পাইতেছেন, তিনি ব্রহ্ম, তিনি রমণীয় ও জ্যোতির্ম্ময়। তিনি সমুদয় জগতেই দীপ্তি পাইতেছেন।' এখানে ভাষ্যকার বলেন, পবিত্রাত্মা পুরুষগণের চক্ষে যে এক বিশেষপ্রকার জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহাই এখানে চাক্ষুষ জ্যোতির অর্থ। উহাকে সেই সর্ব্বব্যাপী আত্মার জ্যোতিঃ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়া থাকে। সেই জ্যোতিঃই গ্রহগণে এবং সূর্য্য-চন্দ্র-তারায় প্রকাশ পাইতেছে।

তোমাদের নিকট এক্ষণে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি সম্বন্ধে এই প্রাচীন উপনিষদ্‌সকলের কতকগুলি অদ্ভুত অদ্ভুত মতের কথা বলিব। হয়ত ইহা তোমাদের ভাল লাগিতে পারে। শ্বেতকেতু

পাঞ্চালরাজের নিকট গমন করিল। রাজা তাহাকে এইসকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমি কি জান, লোকের মৃত্যু হইলে তাহারা কোথায় যায়? তুমি কি জান, তাহারা কিরূপে আবার ফিরিয়া আসে? তুমি কি জান, পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হইয়া যায় না কেন, শূন্যই বা হয় না কেন?” বালক বলিল, “না, আমি এসকল কিছুই জানি না।” সে তখন তাহার পিতার নিকট গমন করিয়া তাঁহার নিকটও ঐ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিল। পিতা বলিলেন, “আমিও ঐসকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবগত নহি।” তখন তাঁহারা উভয়ে রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজা বলিলেন, “এই জ্ঞান পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদের জানা ছিল না, রাজারাই কেবল উহা জানিতেন আর সেই জ্ঞানবলেই রাজারা পৃথিবী শাসন করিয়া থাকেন।” তখন তাঁহারা উভয়ে কিছুদিন রাজার সেবা করিলেন, অবশেষে রাজা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিতে স্বীকৃত হইলেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, “হে গৌতম, তুমি যে এই অগ্নির উপাসনা করিতেছ, তাহা বাস্তবিক অতি নিম্নদরের পদার্থ। এই পৃথিবী সেই অগ্নিস্বরূপ, সংবৎসর উহার কাষ্ঠস্বরূপ, রাত্রি উহার ধূমস্বরূপ, দিক্‌সকল উহার শিখাস্বরূপ, কোণসকল উহার বিস্ফুলিঙ্গস্বরূপ। এই অগ্নিতে দেবতারা বৃষ্টিরূপ আহুতি দিয়া থাকেন, তাহা হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। রাজা এইরূপে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। এইসকল উপদেশের তাৎপর্য্য এই—তোমার এই ক্ষুদ্র অগ্নিতে হোম করিবার কোন প্রয়োজন নাই, সমুদয় জগৎ সেই অগ্নি এবং দিবারাত্র তাহাতে হোম হইতেছে। দেবতা মানব সকলেই দিবারাত্র উপাসনা করিতেছেন—‘হে গৌতম, মনুষ্যশরীরই

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অগ্নি।' আমরা এখানেও আবার দেখিতেছি ধর্ম্মকে কার্য্যে পরিণত করা যাইতেছে, ব্রহ্মকে নামাইয়া সংসারের ভিতর আনা হইতেছে। আব এইসকল্ রূপক-গল্পের ভিতর এই এক তত্ত্ব দেখিতেছি যে, মানুষেব কৃত প্রতিমা লোকের হিতকারী ও শুভকর হইতে পারে, কিন্তু উহা হইতে শ্রেষ্ঠ প্রতিমা পূর্ব্ব হইতেই রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনা করিবার নিমিত্ত প্রতিমার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে জীবন্ত মানব-প্রতিমা ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদি ঈশ্বর-উপাসনার জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করিতে চাও বেশ, কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই উহা হইতে উচ্চতর, উহা হইতে মহত্তর মানবদেহরূপ মন্দির ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, বেদের দুই ভাগ—কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড। উপনিষদের অভ্যুদয়ের সময়ের কর্ম্মকাণ্ড এত জটিল, বর্দ্ধিতায়তন হইয়াছিল যে, তাহা হইতে মুক্ত হওয়া একরূপ অসম্ভব ব্যাপার হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদে কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিলেই হয়, কিন্তু ধীরে ধীরে আর প্রত্যেক কর্ম্মকাণ্ডের ভিতর একটি উচ্চতর, গভীরতর অর্থ দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। অতি প্রাচীনকালে এইসকল যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড প্রচলিত ছিল, কিন্তু উপনিষদের যুগে জ্ঞানিগণের অভ্যুদয় হইল। তাঁহারা কি করিলেন? আধুনিক সংস্কারকগণের ন্যায় তাঁহারা যাগযজ্ঞাদির বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া উহাদিগকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলেন না, কিন্তু উহাদের উচ্চতর তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া লোককে একটা ধরিবার জিনিস দিলেন।

তাঁহারা বলিলেন, "অগ্নিতে হবন কর—অতি উত্তম কথা, কিন্তু এই পৃথিবীতে দিবারাত্র হবন হইতেছে। এই ক্ষুদ্র মন্দির রহিয়াছে; বেশ, কিন্তু সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই যে আমার মন্দির, যেখানেই আমি উপাসনা করি না কেন কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। তোমরা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া থাক কিন্তু আমার পক্ষে জীবন্ত, চেতন মনুষ্যদেহরূপ বেদী রহিয়াছে এবং এই মনুষ্যদেহরূপ বেদীতে পূজা অন্য অচেতন মৃত জড় আকৃতির পূজা হইতে শ্রেয়স্কর।"

এখানে আর একটি বিশেষ মত বর্ণিত হইতেছে। আমি ইহার অধিকাংশ বুঝি না। যদি তোমরা উহার ভিতর হইতে কিছু সংগ্রহ করিতে পার, তাই তোমাদের নিকট উপনিষদের ঐ স্থল পাঠ করিতেছি। যে ব্যক্তি ধ্যানবলে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন সে প্রথমে অর্চ্চি, তৎপর দিন, ক্রমান্বয়ে শুক্লপক্ষ ও উত্তরায়ণ ছয়মাসে গমন করে; ঐ মাসসকল হইতে বৎসরে, বৎসর হইতে সূর্য্যলোকে, সূর্য্যলোক হইতে চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক হইতে বিদ্যুল্লোকে গমন করে। সেখানে একজন অমানব পুরুষ তাহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহার নাম দেবযান। যখন সাধু ও জ্ঞানীদিগের মৃত্যু হয় তাঁহারা এই পথ দিয়া গমন করেন। এই মাস, বৎসর প্রভৃতি শব্দের অর্থ কি কেহই ভাল করিয়া বুঝেন না, সকলেই স্ব স্ব কপোল-কল্পিত অর্থ করিয়া থাকেন, আবার অনেকে বলেন এই সকল বাজে কথামাত্র। এই চন্দ্রলোক, সূর্য্যলোক প্রভৃতিতে যাওয়ার অর্থ কি? আর এই যে অমানব পুরুষ আসিয়া বিদ্যুল্লোক

হইতে ব্রহ্মলোকে লইয়া যায়, ইহারই বা অর্থ কি? হিন্দুদিগের মধ্যে এক ধারণা ছিল যে, চন্দ্রলোকে প্রাণীর বাস আছে—ইহার পরে আমরা পাইব, কি করিয়া চন্দ্রলোক হইতে পতিত হইয়া মানুষ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়। যাহারা জ্ঞানলাভ করে নাই, কিন্তু এই জীবনে শুভকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের যখন মৃত্যু হয় তাহারা প্রথমে ধূমে গমন করে, পরে রাত্রি, তৎপরে কৃষ্ণপক্ষ, তৎপরে দক্ষিণায়ন ছয়মাস, তৎপর বৎসর হইতে তাহারা পিতৃলোকে গমন করে। পিতৃলোক হইতে আকাশে, তথা হইতে চন্দ্রলোকে গমন করে। তথায় দেবতাদের খাদ্যরূপ হইয়া দেবজন্ম গ্রহণ করে। যতদিন তাহাদের পুণ্যক্ষয় না হয়, ততদিন তথায় বাস করিয়া থাকে। আর কর্ম্মফল শেষ হইলে পুনর্ব্বার তাহাদিগকে পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহারা প্রথমে আকাশরূপে পরিণত হয়; তৎপরে বায়ু, তৎপরে ধূম, তৎপরে মেঘ প্রভৃতিরূপে পরিণত হইয়া শেষে বৃষ্টিকণাকে আশ্রয় করিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়, তথায় শস্যক্ষেত্রে পতিত হইয়া শস্যরূপে পরিণত হইয়া মানুষের খাদ্যরূপে পরিগৃহীত হয়, অবশেষে তাহাদের সন্তানাদিরূপে পরিণত হয়। যাহারা খুব সৎকর্ম্ম করিয়াছিল তাহারা সদ্বংশে জন্মগ্রহণ করে, আর যাহারা খুব অসৎকর্ম্ম করিয়াছে তাহাদের অতি নীচজন্ম হয়, এমন কি তাহাদিগকে কখন কখন শূকরজন্ম পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে হয়। আবার যে-সকল প্রাণী দেবযান ও পিতৃযান নামক এই দুই পথের কোন পথে গমন করিতে পারে না, তাহারা পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং পুনঃ পুনঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। এই জন্যই পৃথিবী একেবারে পরিপূর্ণ হয় না, একেবারে শূন্যও হয় না।

আমরা ইহা হইতেও কতকগুলি ভাব পাইতে পারি, আর পরে হয়ত আমরা ইহার অর্থ অনেকটা বুঝিতে পারিব। শেষ কথাগুলি অর্থাৎ স্বর্গে গমন করিয়া জীব আবার কিরূপে ফিরিয়া আসে, তাহা প্রথম কথাগুলির অপেক্ষা যেন কিছু স্পষ্টতর বোধ হয়, কিন্তু এইসকল উক্তির সার তাৎপর্য্য এই বোধ হয় যে, ব্রহ্মানুভূতি ব্যতীত স্বর্গাদিলাভ বৃথা। মনে কর, কতকগুলি ব্যক্তি আছেন—তাঁহারা ব্রহ্মানুভব করিতে এখনও পারেন নাই, কিন্তু ইহলোকে কতকগুলি সৎকর্ম্ম করিয়াছেন আর সেই কর্ম্ম আবার ফলকামনায় কৃত হইয়াছে, তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা এখান ওখান নানা স্থান দিয়া যাইয়া স্বর্গে উপস্থিত হন আর আমরাও যেমন এখানে জন্মিয়া থাকি, তাঁহারাও ঠিক সেইরূপ দেবতাদের সন্তানরূপে জন্মিয়া থাকেন, আর যতদিন তাহাদের শুভ কার্য্যের শেষ না হয় ততদিন তাঁহারা তথায় বাস করেন। ইহা হইতেই বেদান্তের একটি মূলতত্ত্ব পাওয়া যায় যে, যাহার নাম-রূপ আছে, তাহাই নশ্বর। সুতরাং স্বর্গও অবশ্য নশ্বর হইবে, কারণ তথায় নামরূপ রহিয়াছে। অনন্ত স্বর্গ স্ববিরুদ্ধ বাক্যমাত্র, যেমন এই পৃথিবী কখন অনন্ত হইতে পারে না; কারণ যে-কোন বস্তুর নাম রূপ আছে, তাহারই উৎপত্তি কালে, স্থিতি কালে এবং বিনাশ কালে। বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত স্থির; সুতরাং অনন্ত স্বর্গের ধারণা পরিত্যক্ত হইল।

আমরা দেখিয়াছি, বেদের সংহিতাভাগে অনন্ত স্বর্গের কথা আছে, যেমন মুসলমান ও খ্রীষ্টিয়ানদের আছে। মুসলমানেরা আবার স্বর্গের অতিশয় স্থূল ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা বলে,

স্বর্গে বাগান আছে, তাহার নীচে নদী প্রবাহিত হইতেছে। আরবের মরুতে জল একটি অতি বাঞ্ছনীয় পদার্থ, এই জন্য মুসলমানেরা স্বর্গকে সর্ব্বদাই জলপূর্ণ বলিয়া বর্ণনা করে। আমার যেখানে জন্ম, সেখানে বৎসরের মধ্যে ছয়মাস জল। আমি হয়ত স্বর্গকে শুষ্ক স্থান ভাবিব, ইংরেজেরাও তাহাই ভাবিবেন। সংহিতার এই স্বর্গ অনন্ত, মৃত ব্যক্তিরা তথায় গমন করিয়া থাকে। তাহারা তথায় সুন্দর দেহ লাভ করিয়া তাহাদের পিতৃগণের সহিত অতি সুখে চিরকাল বাস করিয়া থাকে, সেখানে তাহাদের সহিত তাহাদের পিতামাতা স্ত্রী পুত্রাদির সাক্ষাৎ হয় আর তাহারা সর্ব্বাংশে এখানকারই মত, তবে অপেক্ষাকৃত অধিক সুখের জীবন যাপন করিয়া থাকে। তাহাদের স্বর্গের ধারণা এই যে এই জীবনে সুখের যে-সকল বাধাবিঘ্ন আছে সব চলিয়া যাইবে, কেবল ইহার যাহা কিছু সুখকর অংশ তাহাই অবশিষ্ট থাকিবে। স্বর্গের এই ধারণা আমাদের খুব সুখকর বটে, কিন্তু সুখকর ও সত্য এ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক পদার্থ। বাস্তবিক চরম সীমায় না উঠিলে সত্য কখনও সুখকর হয় না। মনুষ্যস্বভাব বড় স্থিতিশীল। মানুষ কোন বিশেষ কার্য্য করিতে থাকে, আর একবার তাহা আরম্ভ করিলে তাহা ত্যাগ করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। মন নূতন চিন্তা আসিতে দিবে না, কারণ উহা বড় কষ্টকর।

অতএব আমরা দেখিতেছি, উপনিষদে পূর্ব্বপ্রচলিত ধারণার বিশেষ ব্যতিক্রম হইয়াছে। উপনিষদে কথিত হইয়াছে—এইসকল স্বর্গ, যেখানে মানুষ যাইয়া পিতৃলোকের সহিত বাস করে, তাহা

কখন নিত্য হইতে পারে না, কারণ নাম-রূপাত্মক বস্তুমাত্রই বিনাশশীল। যদি সাকার স্বর্গ থাকে, তবে কালে অবশ্য সেই স্বর্গের ধ্বংস হইবে। হইতে পারে উহা লক্ষ লক্ষ বৎসর থাকিবে, কিন্তু অবশেষে এমন এক সময় আসিবে যখন তাহার ধ্বংস হইবেই হইবে। আর এক ধারণা ইতোমধ্যে লোকের মনে উদিত হইয়াছে যে, এইসকল আত্মা আবার এই পৃথিবীতে ফিরিয়া আসে আর স্বর্গ কেবল তাহাদের শুভকর্ম্মের ফলভোগের স্থানমাত্র। আর এই ফলভোগ হইয়া গেলে তাহারা আবার আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। একটি কথা ইহা হইতেই বেশ স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, মানুষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই কার্য্য-কারণ বিজ্ঞান জানিত। পরে আমরা দেখিব, আমাদের দার্শনিকেরা দর্শন ও ন্যায়ের ভাষায় এই তত্ত্ব বর্ণনা করিতেছেন, কিন্তু এখানে একরূপ শিশুর অস্পষ্ট ভাষায় ইহা কথিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিবার সময় তোমরা বোধ হয় ইহা লক্ষ্য করিয়াছ যে, এইগুলি সবই আন্তরিক অনুভূতি। যদি তোমরা জিজ্ঞাসা কর ইহা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে কি না আমি বলিব ইহা আগে কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, তৎপরে দর্শনরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। তোমরা দেখিতেছ, এইগুলি প্রথমে অনুভূত, পরে লিখিত হইয়াছে। সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড প্রাচীন ঋষিগণের নিকট কথা বলিত, পক্ষিগণ তাঁহাদের সহিত কথা কহিত, পশুগণ কথা কহিত, চন্দ্রসূর্য্য তাঁহাদের সহিত কথা কহিত। তাঁহারা একটু একটু করিয়া সকল জিনিস অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রকৃতির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা চিন্তা দ্বারা বা ন্যায়বিচার দ্বারা উহা লাভ করেন নাই, কিংবা

আধুনিক কালের যেমন প্রথা, অপরের মস্তিষ্কপ্রসূত কতকগুলি বিষয় সংগ্রহ করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, অথবা আমি যেমন তাঁহাদেরই একখানি গ্রন্থ লইয়া সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া থাকি তাহাও করেন নাই, তাঁহাদিগকে উহা আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল। ইহার সার ছিল সাধন—প্রত্যক্ষানুভূতি, আর চিরকালই তাহা থাকিবে। ধর্ম্ম চিরকালই একটি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান থাকিবে। মতবাদের ধর্ম্ম কখনও হইবে না। প্রথমে অভ্যাস, তার পর জ্ঞান। আত্মাগণ যে এখানে ফিরিয়া আসে, এ ধারণা এই উপনিষদে বর্ত্তমান দেখিতেছি। যাহারা ফলকামনা করিয়া কোন সৎকর্ম্ম করে, তাহারা সেই সৎকর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ ফল নিত্য নহে। কার্য্যকারণবাদ এখানে অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে—কারণ, কথিত হইয়াছে যে, কার্য্য কারণের অনুসারেই হইয়া থাকে; কারণ যাহা, কার্য্যও তাহাই হইবে; কারণ যখন অনিত্য, তখন কার্য্যও অনিত্য হইবে। কারণ নিত্য হইলে কার্য্যও নিত্য হইবে। কিন্তু সৎকর্ম্মকরা-রূপ এই কারণগুলি অনিত্য, সসীম সুতরাং তাহাদের ফলও কখনও নিত্য হইতে পারে না।

এই তত্ত্বের আর একদিক দেখিলে ইহা বেশ বোধগম্য হইবে যে, যে কারণে অনন্ত স্বর্গ হইতে পারে না, অনন্ত নরকও সেই কারণেই হওয়া অসম্ভব। মনে কর, আমি একজন খুব বদ্‌লোক। মনে কর, আমি জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যায় কর্ম্ম করিতেছি, তথাপি এই সারা জীবনটাও অনন্ত জীবনের তুলনায় কিছুই নয়। যদি অনন্ত শাস্তি থাকে তাহার অর্থ এই হইবে যে, সান্ত কারণের দ্বারা অনন্ত ফলের উৎপত্তি হইল। এই জীবনের কার্য্যরূপ সান্ত

কারণ দ্বারা অনন্তফলের উৎপত্তি হইল। তাহা হইতে পারে না। যদি সারা জীবন সৎকর্ম্ম করিয়া অনন্ত স্বর্গলাভ হয় স্বীকার করা যায়, তাহাতেও ঐ দোষ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে-সকল পথের কথা বর্ণিত হইল তদ্ব্যতীত যাঁহারা সত্যকে জানিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য আর এক পথ আছে। ইহাই মায়াবরণ হইতে বাহির হইবার একমাত্র উপায় 'সত্যকে অনুভব করা' আর উপনিষদ্‌সকল এই সত্যানুভব কাহাকে বলে তাহা বুঝাইতেছেন।

ভালমন্দ কিছুই দেখিও না, সকল বস্তু এবং সকল কার্য্যই আত্মা হইতে প্রসূত, চিন্তা করিবে। আত্মা সকলেতেই রহিয়াছেন। বল—জগৎ বলিয়া কিছু নাই, বাহ্যদৃষ্টি রুদ্ধ কর, সেই প্রভুকে স্বর্গনরক সকল স্থলে দেখ। কি মৃত্যু, কি জীবন—সর্ব্বত্রই তাঁহাকে উপলব্ধি কর। আমি পূর্ব্বে তোমাদিগকে যাহা পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতেও এই ভাব—এই পৃথিবী সেই ভগবানের একপাদ, আকাশ ভগবানের একপাদ ইত্যাদি। সকলই ব্রহ্ম। ইহা দেখিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, কেবল ঐ বিষয়ে আলোচনা করিলে বা চিন্তা করিলে চলিবে না। মনে কর, আত্মা জগতের প্রত্যেক বস্তুর স্বরূপ বুঝিতে পারিল, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্মময় বোধ করিতে লাগিল, তখন উহা স্বর্গে যাউক, নরকেই যাউক বা অন্যত্র যাউক কিছুই আসিয়া যায় না। আমি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করি অথবা স্বর্গেই যাই, তখন কিছুই আসিয়া যায় না। আমার পক্ষে এগুলির আর কোন অর্থই নাই; কারণ আমার পক্ষে সব জায়গা সমান ও সকল স্থানই ভগবানের মন্দির, সকল স্থানই পবিত্র; কারণ স্বর্গে, নরকে বা

অন্যত্র আমি কেবল ভগবানের সত্তা অনুভব করিতেছি। ভালমন্দ বা জীবনমৃত্যু আমি কিছুই দেখিতেছি না।

বেদান্তমতে মানুষ যখন এই অনুভূতিসম্পন্ন হয় তখন সে মুক্ত হইয়া যায়, আর বেদান্ত বলেন সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত, অপরে নহে। যে ব্যক্তি জগতে অন্যায় দেখে, সে কিরূপে জগতে বাস করিতে পারে? তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি এখানে নানা বিঘ্ন বাধা বিপদ দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়; যে ব্যক্তি জগতে মৃত্যু দেখে, তাহার জীবন ত দুঃখময়। যে ব্যক্তি জগতে প্রত্যেক বস্তুতে সেই সত্যস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, সেই ব্যক্তিই কেবল জগতে বাস করিবার উপযুক্ত; সে-ই কেবল বলিতে পারে আমি এই জীবন সম্ভোগ করিতেছি, আমি এই জীবন লইয়া বেশ সুখী। এখানে আমি ইহা বলিয়া রাখিতে পারি যে, বেদে কোথাও নরকের কথা নাই। বেদের অনেক পরবর্ত্তী পুরাণে এই নরকের প্রসঙ্গ আছে। বেদের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শাস্তির কথা এই পাওয়া যায়—পুনর্জ্জন্ম, অর্থাৎ আর একবার উন্নতির সুবিধালাভ করা। প্রথম হইতেই নির্গুণের ভাব আসিতেছে, দেখিতে পাওয়া যায়। পুরস্কার ও শাস্তির ভাবই খুব জড়ভাবাত্মক, আর ঐ ভাব কেবল মানুষের ন্যায় সগুণ ঈশ্বরবাদেই সম্ভব হয়—যিনি আমাদেরই ন্যায় একজনকে ভালবাসেন, অপরকে বাসেন না। এরূপ ঈশ্বরধারণার সহিতই পুরস্কার ও শাস্তির ভাব সঙ্গত হইতে পারে। সংহিতার ঈশ্বর এইরূপ ছিল। সেখানে ঐ ধারণার সঙ্গে ভয়ও মিশ্রিত ছিল, কিন্তু উপনিষদে এই ভয়ের ভাব একেবারে লোপ পাইয়াছে;

ইহার সহিত নির্গুণের ধারণা আসিতেছে—আর প্রত্যেক দেশেই এই নির্গুণের ধারণা করা বিশেষ কঠিন ব্যাপার। মানুষ সর্ব্বদাই সগুণ ব্যক্তি লইয়া থাকিতে চায়।

অনেক বড় বড় চিন্তাশীল লোক, অন্ততঃ জগৎ যাঁহাদিগকে খুব চিন্তাশীল লোক বলিয়া থাকে, তাঁহারা এই নির্গুণবাদের উপর বিরক্ত কিন্তু আমার এই সগুণবাদ অতিশয় হাস্যাস্পদ, অতিশয় নিম্নভাবাপন্ন, অতিশয় নীচজনোচিত, এমন কি অতিশয় ভগবন্নিন্দাকর বলিয়া বোধ হয়। বালকের পক্ষে ভগবানকে একজন সাকার মনুষ্য বলিয়া ভাবা শোভা পায়, সে ওরূপ ভাবিলে তাহাকে ক্ষমা করা যাইতে পারে; কিন্তু বয়স্থ ব্যক্তির পক্ষে, চিন্তাশীল নরনারীর পক্ষে ভগবানকে স্ত্রী পুরুষ বলিয়া চিন্তা করা বড় লজ্জার কথা। উচ্চতর ভাব কোন্‌টি—জীবিত ঈশ্বর বা মৃত ঈশ্বর। যে ঈশ্বরকে কেহ দেখিতে পায় না, কেহ যাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানে না, অথবা যে ঈশ্বর জ্ঞাত? সময়ে সময়ে তিনি জগতে তাঁহার এক এক জন দূতকে প্রেরণ করিয়া থাকেন, তাঁহার এক হস্তে তরবারি, অপর হস্তে অভিশাপ, আর আমরা যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস না করি তবে একেবারে বিনাশ! তিনি কেন নিজে আসিয়া, কি করিতে হইবে আমাদের বলিয়া দেন না? তিনি কেন ক্রমাগত দূত পাঠাইয়া আমাদিগকে শাস্তি ও অভিশাপ দিতেছেন? কিন্তু এই বিশ্বাসেই অনেক লোক সন্তুষ্ট। আমাদের কি নীচতা!

অপর পক্ষে, নির্গুণ ঈশ্বরকে জীবন্তস্বরূপে আমার সম্মুখে দেখিতেছি; তিনি একটি তত্ত্বমাত্র। সগুণ নির্গুণের মধ্যে

প্রভেদ এই—সগুণ ঈশ্বর ক্ষুদ্র মানববিশেষ মাত্র, আর নির্গুণ ঈশ্বর—মানুষ, পশু, দেবতা এবং আরও কিছু যাহা আমরা দেখিতে পাই না; কারণ সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত—উহা সমুদয় ব্যক্তি সমষ্টি এবং তদতিরিক্ত আরও অনেক। 'যেমন একই অগ্নি জগতে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে, আবার তদতিরিক্ত অগ্নিরও অস্তিত্ব আছে', নির্গুণও তদ্রূপ। আমরা জীবন্ত ঈশ্বরকে পূজা করিতে চাই। আমি সারা জীবন ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছু দেখি নাই। তুমিও দেখ নাই। এই চেয়ারখানিকে দেখিতে হইলে তোমাকে প্রথমে ঈশ্বরকে দেখিতে হয় তৎপরে তাঁহারই ভিতর দিয়া চেয়ারখানিকে দেখিতে হয়। তিনি দিবারাত্র জগতে থাকিয়া 'আমি আছি', 'আমি আছি' বলিতেছেন। যে মুহূর্ত্তে তুমি বল—'আমি আছি', সেই মুহূর্ত্তেই তুমি সত্তাকে জানিতেছ। কোথায় তুমি ঈশ্বরকে খুঁজিতে যাইবে, যদি তুমি তাঁহাকে নিজ হৃদয়ে, জীবিত প্রাণিগণের ভিতর না দেখিতে পার, যদি না তাঁহাকে ঐ যে লোকটা রাস্তায় মোট বহিয়া গলদঘর্ম্ম হইতেছে তাহার ভিতর দেখিতে পার? 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।' তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি বালক, তুমি বালিকা, তুমি বৃদ্ধ দণ্ডে ভর দিয়া বেড়াইতেছ, তুমি সমুদয় জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি এই সব। কি অদ্ভুত 'জীবন্ত ঈশ্বর! জগতের মধ্যে তিনিই একমাত্র বস্তু'—ইহা অনেকের পক্ষে ভয়ানক বলিয়া বোধ হয়; বাস্তবিক ইহা পূর্ব্বপরিচালিত ঈশ্বরধারণার বিরোধী বটে; সেই ঈশ্বরধারণা এই

যে, তিনি কোন বিশেষ স্থানে কোন আবরণের পশ্চাতে লুকাইয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহই কখন দেখিতে পায় না। পুরোহিতেরা আমাদিগকে কেবল এই আশ্বাস দেন যে, যদি আমরা তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া জিহ্বা দ্বারা তাঁহাদের পদধূলি লেহন করি এবং তাঁহাদিগকে পূজা করি তবে আমরা এই জীবনে ঈশ্বরকে দেখিব না বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় তাঁহারা আমাদিগকে একখানি ছাড়পত্র দিবেন—তখন আমরা ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে পারিব। এ কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই সকল স্বর্গবাদ আর কি? —কেবল পুরোহিতদের দুষ্টামি মাত্র।

অবশ্য নির্গুণবাদে অনেক জিনিস ভাঙ্গিয়া ফেলে, উহা পুরোহিতদের হস্ত হইতে সব ব্যবসায় কাড়িয়া লয়—উহাতে মন্দির, গির্জ্জা প্রভৃতি সব উড়িয়া যায়। ভারতে এক্ষণে দুর্ভিক্ষ চলিতেছে, কিন্তু তথায় এমন অনেক মন্দির আছে যাহাতে অসংখ্য হীরা, জহরৎ রহিয়াছে। যদি লোককে এই নির্গুণ ব্রহ্মের বিষয় শিখান যায়, তাহাদের ব্যবসায় চলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদিগকে ইহা পৌরোহিত্যের ভাব ছাড়িয়া দিয়া শিখাইতে হইবে। তুমিও ঈশ্বর, আমিও তাহাই—তবে কে কাহার আজ্ঞা পালন করিবে? কে কাহার উপাসনা করিবে? তুমিই ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির; আমি কোনরূপ মন্দিরে কোনরূপ প্রতিমা বা কোনরূপ শাস্ত্র উপাসনা না করিয়া বরং তোমার উপাসনা করিব। লোকে এত পরস্পরবিরোধী চিন্তা করে কেন? লোকে বলে, আমরা খাঁটি প্রত্যক্ষবাদী; বেশ কথা। কিন্তু এইখানে তোমাকে উপাসনা করা হইতে আর কি অধিক প্রত্যক্ষ হইতে পারে?

আমি তোমাকে দেখিতেছি, তোমাকে বেশ অনুভব করিতেছি, আর জানিতেছি—তুমি ঈশ্বর। মুসলমানেরা বলেন, আল্লা ব্যতীত ঈশ্বর নাই; কিন্তু বেদান্ত বলেন, মানুষ ব্যতীত ঈশ্বর নাই ইহা শুনিয়া তোমাদের অনেকের ভয় হইতে পারে, কিন্তু তোমরা ক্রমশঃ ইহা বুঝিবে। জীবন্ত ঈশ্বর তোমাদের সঙ্গে রহিয়াছেন, তথাপি তোমরা মন্দির-গির্জ্জা নির্ম্মাণ করিতেছ আর সর্ব্বপ্রকার কাল্পনিক মিথ্যা বস্তুতে বিশ্বাস করিতেছ। মানবাত্মা অথবা মানবদেহই একমাত্র উপাস্য ঈশ্বর। অবশ্য তির্য্যগ্‌-জাতিরাও ভগবানের মন্দির বটে, কিন্তু মনুষ্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্দির—মন্দিরের মধ্যে তাজমহলস্বরূপ। যদি আমি তাঁহার উপাসনা করিতে না পারিলাম, তবে কোন মন্দিরেই কিছু উপকার হইবে না। যে মুহূর্ত্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যদেহরূপ মন্দিরে উপবিষ্ট ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিতে পারিব, যে মুহূর্ত্তে আমি প্রত্যেক মনুষ্যের সম্মুখে ভক্তিভাবে দণ্ডায়মান হইতে পারিব, আর বাস্তবিক তাহার মধ্যে ঈশ্বর দেখিব, যে মুহূর্ত্তে আমার ভিতরে এই ভাব আসিবে, সেই মুহূর্ত্তেই আমি সমুদয় বন্ধন হইতে মুক্ত হইব—সমুদয় পদার্থ ই আমার দৃষ্টি হইতে অপসারিত হইয়া যাইবে।

ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কাজের উপাসনা। মতান্তর লইয়া আমার কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু একথা বলিলে অনেক লোকে ভয় পায়। তাহারা বলে, ইহা ঠিক না। তাহারা তাহাদের অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের পিতামহ তস্য পিতামহ ২০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে কি বলিয়া গিয়াছেন, তিনি যাঁহাকে বলিয়াছেন তিনি আবার অপরকে কি বলিয়াছেন, এইসকল কথার বিচারে

ব্যস্ত। কথাটা এই, স্বর্গের কোন স্থানে অবস্থিত একজন ঈশ্বর কাহাকেও বলিয়াছিলেন—আমি ঈশ্বর। সেই সময় হইতে কেবল মতমতান্তরের আলোচনাই চলিতেছে। তাহাদের মতে ইহাই কাজের কথা—আর আমাদের মত ব্যবহারগম্য নহে। বেদান্ত বলেন, সকলেই আপনার নিজ নিজ পথে চলুক ক্ষতি নাই, ইহাই কিন্তু আদর্শ। স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা প্রভৃতি মন্দ নহে, কিন্তু উহারা সোপানমাত্র, সত্য নহে! ঐসকলে সুন্দর মহৎ ভাবসকল আছে, কিন্তু বেদান্ত প্রতিপদে বলেন, বন্ধো, তুমি যাঁহাকে অজ্ঞাত বলিয়া উপাসনা করিতেছ এবং সারা জগৎ যাঁহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, তিনি জগতে সর্ব্বদাই বিরাজিত। তুমি যে জীবিত রহিয়াছ, তাহাও তিনি আছেন বলিয়া—তিনিই জগতের নিত্য সাক্ষী। সমুদয় বেদ যাঁহার উপাসনা করিতেছেন, শুধু তাহাই নহে, যিনি নিত্য 'আমি'তে সদা বর্ত্তমান, তিনি আছেন বলিয়াই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে। তিনি সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের আলোকস্বরূপ। তিনি যদি তোমাতে বর্ত্তমান না থাকিতেন, তবে তুমি সূর্য্যকেও দেখিতে পাইতে না, সমুদয়ই তোমার পক্ষে অন্ধকারময় জড়রাজি—শূন্য বলিয়া প্রতীত হইত। তিনিই দীপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া তুমি জগৎকে দেখিতেছ।

এ বিষয়ে সাধারণতঃ একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইয়া থাকে—ইহাতে ত ভয়ানক গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে? আমাদের সকলেই মনে করিবে, 'আমি ঈশ্বর—যাহা কিছু আমি ভাবি বা করি তাহাই ভাল—ঈশ্বরের আবার পাপ কি?' প্রথমতঃ,

এই প্রকার বিপরীত ব্যাখ্যারূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহা কি প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, অপর পক্ষে ঐ আশঙ্কা নাই? লোকে আপনা হইতে পৃথক স্বর্গস্থ ঈশ্বরের উপাসনা করিতেছে, তাঁহাকে তাহারা খুব ভয় করিয়া থাকে। তাহারা কেবল ভয়ে কাঁপিতে থাকে আর সারা জীবন এইরূপ কাঁপিয়া কাটাইয়া দেয়। ইহাতে কি জগৎ পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইয়াছে? তুমি ত অপর পক্ষকে ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছিলে। যাঁহারা সগুণ ঈশ্বরবাদ বুঝিয়া তাঁহাকে উপাসনা করিতেছেন, এবং যাঁহারা নির্গুণ ঈশ্বরতত্ত্ব বুঝিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে কোন্ সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে জগতের বড় বড় লোক হইয়াছেন? মহা কর্ম্মিগণ—মহা চরিত্রবলশালিগণ! অবশ্যই নির্গুণ সাধকদের মধ্য হইতে। ভয় হইতে চরিত্রবান বলবান পুরুষ জন্মিবে, ইহা কিরূপে আশা করিতে পার? অবশ্য ইহা কখনই হইতে পারে না। 'যেখানে একজন অপরকে দেখে, যেখানে একজন অপরের হিংসা করে, সেখানেই মায়া। যেখানে একজন অপরকে দেখে না, একজন অপরকে হিংসা করে না, যেখানে সবই আত্মময় হইয়া যায়, সেখানে আর মায়া থাকে না।' তখন সবই তিনি অথবা সবই আমি—তখন আত্মা পবিত্র হইয়া যায়। তখনই—কেবল তখনই আমরা প্রেম কাহাকে বলে বুঝিতে পারি। ভয় হইতে কি এই প্রেমের উৎপত্তি সম্ভব? প্রেমের ভিত্তি স্বাধীনতা। স্বাধীনতা—মুক্তস্বভাব হইলেই তবে প্রেম আসে; তখনই আমরা বাস্তবিক জগৎকে ভালবাসিতে আরম্ভ করি ও সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের অর্থ বুঝিতে পারি—তাহার পূর্ব্বে নহে।

অতএব এই মতে সমুদয় জগতে ভয়ানক পাপের স্রোত প্রবাহিত হইবে, একথা বলা উচিত নয়; যেন অপর মতে কখন লোককে অন্যায়ের দিকে লইয়া যায় না, যেন উহাতে সমস্ত জগৎকে রক্তপ্লাবনে ভাসাইয়া দেয় না, যেন উহাতে লোককে পরস্পর পৃথক করিয়া সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করে না! আমার ঈশ্বরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রমাণ? এস, উভয়ে যুদ্ধ করি—ইহাই প্রমাণ। দ্বৈতবাদ হইতে জগতে এই সমুদয় গোল আসিয়াছে। ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পথসকলে না গিয়া প্রশান্ত উজ্জ্বল দিবালোকে আইস। মহৎ অনন্ত আত্মা কি করিয়া সঙ্কীর্ণভাবে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারে? এই আলোকময় ব্রহ্মাণ্ড সম্মুখে, ইহাদের প্রত্যেক বস্তু আমাদের। আপন বাহু প্রসারিত করিয়া—সমুদয় জগৎকে প্রেমালিঙ্গন করিতে চেষ্টা কর। যদি কখন এরূপ করিবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরকে অনুভব করিয়াছ।

বুদ্ধদেবের জীবনচরিতের মধ্যে তোমাদের সেই অংশটি অবশ্যই স্মরণ আছে, তিনি কিরূপে উত্তর-দক্ষিণে, পূর্ব্বে-পশ্চিমে, উপরে-নিম্নে সর্ব্বত্র প্রেমচিন্তাপ্রবাহ প্রেরণ করিতেন, যতক্ষণ না সমুদয় জগৎ সেই মহান অনন্ত প্রেমে পূর্ণ হইয়া যাইত। যখন সেই ভাব তোমাদের আসিবে, তখনই তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব আসিবে। সমুদয় জগৎ তখন এক ব্যক্তি হইয়া যায়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জিনিসের দিকে আর মন থাকে না। এই অনন্ত সুখের জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ পরিত্যাগ কর। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ লইয়া তোমার লাভ কি? বাস্তবিক কিন্তু ঐ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখগুলিও তোমায় ছাড়িতে হয় না, কারণ তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, পূর্ব্বেই আমরা দেখাইয়াছি

সগুণ নির্গুণের অন্তর্গত। অতএব ঈশ্বর সগুণ নির্গুণ উভয়ই। মানুষ—অনন্তস্বরূপ নির্গুণ মানুষও—আপনাকে সগুণরূপে, ব্যক্তিরূপে দেখিতেছেন। অনন্তস্বরূপ আমরা যেন আপনাদিগকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছি। বেদান্ত বলেন, ইহার কারণ বুঝিতে না পারিলেও এইটুকু বলা যায় যে, ইহা আমাদের প্রত্যক্ষদৃষ্ট ব্যাপার—ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমরা আমাদের কর্ম্মদ্বারা আপনাদিগকে সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছি এবং তাহাই যেন আমাদের গলায় শিকল দিয়া আমাদিগকেও বাঁধিয়া রাখিয়াছে। শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল ও মুক্ত হও। নিয়মকে পদদলিত কর। মনুষ্যের প্রকৃত স্বরূপে কোন বিধি নাই, কোন দৈব নাই, কোন অদৃষ্ট নাই। অনন্তে বিধান বা নিয়ম থাকিবে কিরূপে! স্বাধীনতাই ইহার মূলমন্ত্র, স্বাধীনতাই ইহার স্বরূপ—ইহার জন্মগত স্বত্ব। প্রথমে মুক্ত হও, তারপর যত ইচ্ছা ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব রাখিতে হয়, রাখিও; তখন আমরা রঙ্গমঞ্চে অভিনেতৃগণের ন্যায় অভিনয় করিব। যেমন একজন যথার্থ রাজা ভিখারীর বেশে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু এদিকে বাস্তবিক ভিক্ষুক যে, সে রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণ করিতেছে। উভয়ে কত প্রভেদ দেখ! দৃশ্য উভয়স্থলেই সমান, বাক্যও হয়ত সমান, কিন্তু কি পার্থক্য! একজন ভিক্ষুকের অভিনয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, অপরে যথার্থ দারিদ্র্যকষ্টে প্রপীড়িত। কেন এই পার্থক্য হয়? কারণ একজন মুক্ত, অপরে বদ্ধ। রাজা জানেন, তাঁহার এই দারিদ্র্য সত্য নহে, ইহা কেবল তিনি ক্রীড়ার জন্য অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু যথার্থ ভিক্ষুক ব্যক্তি জানে—ইহা তাহার চিরপরিচিত অবস্থা—তাহার

ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তাহাকে এই দারিদ্র্য সহ্য করিতেই হইবে। তাহার পক্ষে ইহা অভেদ্য নিয়মস্বরূপ, সুতরাং সে কষ্ট পায়। তুমি আমি যতক্ষণ না আমাদের স্বরূপ জ্ঞাত হইতেছি ততক্ষণ আমরা ভিক্ষুকমাত্র, প্রকৃতির অন্তর্গত প্রত্যেক বস্তুই আমাদিগকে দাস করিয়া রাখিয়াছে। আমরা সমুদয় জগতে সাহায্যের জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি—শেষে কাল্পনিক জীবগণের নিকট পর্য্যন্ত সাহায্য চাহিতেছি, কিন্তু কোন কালে এই সাহায্য আসিল না। তথাপি ভাবিতেছি, এইবার সাহায্য পাইব—ভাবিয়া কাঁদিতেছি, চীৎকার করিতেছি, আশা করিয়া বসিয়া আছি, ইতোমধ্যে একটা জীবন কাটিল, আবার সেই খেলা চলিতে লাগিল।

মুক্ত হও ; অপর কাহারও নিকট কিছু আশা করিও না। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি, তোমরা যদি তোমাদের জীবনের অতীত ঘটনা স্মরণ কর, তবে দেখিবে তোমরা সর্ব্বদাই বৃথা অপরের নিকট সাহায্য পাইবার চেষ্টা করিয়াছ, কিন্তু কখনও পাও নাই ; যাহা কিছু সাহায্য পাইয়াছ, সবই আপনার ভিতর হইতে। তুমি নিজে যাহার জন্য চেষ্টা করিয়াছ, তাহাই ফলরূপে পাইয়াছ ; তথাপি কি আশ্চর্য্য, তুমি সর্ব্বদাই অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছ। ধনীদিগের বৈঠকখানায় খানিকক্ষণ বসিয়া যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে বেশ তামাশা দেখিতে পাইবে। দেখিবে, উহা সর্ব্বদাই পূর্ণ, কিন্তু এখন উহাতে যে দল রহিয়াছে খানিক পরে আর সে দল নাই—সর্ব্বদাই তাহারা আশা করিতেছে, ধনী ব্যক্তির নিকট হইতে কিছু আদায় করিবে, কিন্তু কখনই তাহা করিতে পারে না। আমাদের জীবনও তদ্রূপ ; কেবল আশা করিয়াই চলিয়াছি, ইহার

শেষ নাই। বেদান্ত বলেন, এই আশা ত্যাগ কর। কেন আশা করিতে যাইবে? সবই তোমার রহিয়াছে। তুমি আত্মা, তুমি সম্রাটস্বরূপ, তুমি আবার কিসের আশা করিতেছ? যদি রাজা পাগল হইয়া আপন দেশে 'রাজা কোথায়, রাজা কোথায়' বলিয়া খুঁজিয়া বেড়ান, তিনি কখনই রাজার উদ্দেশ পাইবেন না, কারণ তিনি স্বয়ংই রাজা। তিনি তাঁহার রাজ্যের প্রত্যেক গ্রাম, প্রত্যেক নগর—এমন কি, প্রত্যেক গৃহ পর্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পারেন, তিনি মহা চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতে পারেন, তথাপি রাজার উদ্দেশ পাইবেন না; কারণ তিনি নিজেই রাজা। আমরা যদি জানিতে পারি আমরা রাজা, আর এই রাজার অন্বেষণরূপ অনর্থক চেষ্টা ত্যাগ করিতে পারি, তবে বড় ভাল হয়। বেদান্ত বলেন, এইরূপে আপনাদিগকে রাজস্বরূপ জানিতে পারিলেই আমরা সন্তুষ্ট ও সুখী হইতে পারি। এই সব ভূতের বেগার ছাড়িয়া দাও, দিয়া জগতে খেলা করিতে থাক।

এইরূপ অবস্থা লাভ করিতে পারিলে আমাদের দৃষ্টি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অনন্ত কারাস্বরূপ না হইয়া এ জগৎ ক্রীড়াস্থানরূপে পরিণত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র না হইয়া ইহা ভ্রমরগুঞ্জনপূর্ণ বসন্তকালের রূপ ধারণ করে। পূর্ব্বে এই জগৎ নরককুণ্ডরূপে প্রতীয়মান হইতেছিল, তখন তাহাই স্বর্গে পরিণত হইয়া যায়। বদ্ধের দৃষ্টিতে ইহা এক মহা যন্ত্রণার স্থান, কিন্তু মুক্তব্যক্তির দৃষ্টিতে ইহাই স্বর্গ, স্বর্গ অন্যত্র নাই। এক প্রাণই সর্ব্বত্র বিরাজিত। পুনর্জন্মাদি যাহা কিছু হয়, সবই এখানে হইয়া থাকে। দেবতারা সকলেই এখানে—তাঁহারা মনুষ্যাদর্শের অনুসারে কল্পিত।

দেবতারা মানুষকে তাঁহাদের আদর্শে নির্ম্মাণ করেন নাই, কিন্তু মানুষই দেবতা সৃষ্টি করিয়াছে! কর্ম্মরূপ ইন্দ্র রহিয়াছেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডের দেবতারা উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তোমরাই তোমাদের নিজেদের এক অংশকে বাহিরে প্রক্ষেপ করিতেছ, তোমরাই কিন্তু মূল, আসল জিনিষ—তোমরাই প্রকৃত উপাস্য দেবতা। ইহাই বেদান্তের মত এবং এই জন্যই ইহা যথার্থ কাজে লাগাইবার যোগ্য। অবশ্য আমরা মুক্ত হইয়াছি বলিয়া উন্মত্ত হইয়া সমাজ ত্যাগ করিয়া অরণ্যে বা গুহায় মরিতে যাইব না। তুমি যেখানে ছিলে সেইখানেই থাকিবে, তবে তফাৎ হইবে এইটুকু যে তুমি সমুদয় জগতের রহস্য অবগত হইবে। পূর্ব্ব দৃশ্য সমস্তই আসিবে, কিন্তু উহাদের অর্থ তখন অন্যরূপ বুঝিবে। তোমরা এখনও জগতের স্বরূপ জান না; মুক্ত হইলেই কেবল উহার স্বরূপ বুঝা যায়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি বিধি, দৈব বা অদৃষ্ট আমাদের প্রকৃতির অতি ক্ষুদ্র অংশ লইয়াই ব্যাপৃত। এটি কেবল আমাদের প্রকৃতির একদিক, অপর দিকে মুক্তি সর্ব্বদা বিরাজিত, আর আমরা শিকারীর দ্বারা অনুসৃত শশকের ন্যায় মাটিতে আমাদের মুখ লুকাইয়া আমাদিগকে অশুভ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতেছি।

অতএব দেখা গেল, আমরা ভ্রমবশতঃ আমাদের স্বরূপ ভুলিতে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু উহা একেবারে ভুলা যায় না—সর্ব্বদাই উহা কোন না কোনরূপে আমাদের সমক্ষে আসিতেছে। আমরা যে দেবতা, ঈশ্বর প্রভৃতির অনুসন্ধান করিয়া থাকি, আমরা যে বহির্জগতে স্বাধীনতালাভের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকি, এসকল আর

কিছুই নয়—আমাদের মুক্ত প্রকৃতি যেন কোন না কোনরূপে আপনাকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কোথা হইতে এই বাণী উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে আমরা ভুল করিয়াছি মাত্র। আমরা প্রথমে ভাবি এই বাণী অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, তারা বা কোন দেবতা হইতে উত্থিত—অবশেষে আমরা দেখিতে পাই এই বাণী আমাদের ভিতরে। এই সেই অনন্ত বাণী অনন্ত মুক্তির সমাচার ঘোষণা করিতেছে। এই সঙ্গীত অনন্তকাল ধরিয়া চলিয়াছে। আত্মার সঙ্গীতের কিয়দংশ এই নিয়মাবদ্ধ ব্রহ্মাণ্ড, এই পৃথিবীরূপে পরিণত হইয়াছে, কিন্তু যথার্থতঃ আমরা আত্মস্বরূপ আছি ও চিরকাল সেই আত্মস্বরূপ থাকিব। এক কথায় বেদান্তের আদর্শ—জগতে মনুষ্যোপাসনা, আর বেদান্তের ইহাই ঘোষণা যে, যদি তুমি ব্যক্ত ঈশ্বররূপ তোমার ভ্রাতাকে উপাসনা কবিতে না পার, তবে বেদান্ত তোমার উপাসনায় বিশ্বাস করে না।

তোমাদের কি বাইবেলের সেই কথা স্মরণ নাই যে, যদি তুমি তোমার ভ্রাতা, যাহাকে তুমি দেখিতেছ, তাহাকে ভাল না বাসিতে পার, তবে ঈশ্বর যাঁহাকে কখন দেখ নাই, তাঁহাকে কি করিয়া ভালবাসিবে? যদি তাঁহাকে দেবভাবাপন্ন মনুষ্যমুখে না দেখিতে পার, তবে তাঁহাকে মেঘে, অথবা অন্য কোন মৃত জড়ে অথবা তোমার নিজ মস্তিষ্কের কল্পিত গল্পে কিরূপে দেখিবে? যে দিন হইতে তোমরা নরনারীতে ঈশ্বর দেখিতে থাকিবে, সেই দিন হইতে আমি তোমাদিগকে ধার্ম্মিক বলিব, আর তখনই তোমরা বুঝিবে, ডান গালে চড় মারিলে বাঁ গাল তার সম্মুখে ফিরানর অর্থ কি। যখন তুমি মানুষকে ঈশ্বররূপে দেখিবে তখন সকল

বস্তু এমন কি, ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত তোমার নিকট আসিলে তোমার কিছু ক্ষতিবোধ হইবে না। যাহা কিছু তোমার নিকট আসে, সবই সেই অনন্ত আনন্দময় প্রভু নানারূপে আসিতেছেন—তিনি আমাদের পিতা মাতা বন্ধুস্বরূপ। আমাদের আপন আত্মাই আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেছেন।

ভগবানকে পিতা বলা হইতেও উচ্চতর ভাব আছে, তাঁহাকে সাধকেরা মাতা বলিয়া থাকেন। তদপেক্ষাও পবিত্রতর ভাব আছে—তাঁহাকে প্রিয়সখা বলা। তদপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ভাব—আমার প্রেমাস্পদ বলা। ইহার কারণ এই, প্রেম ও প্রেমাস্পদে কিছু প্রভেদ না দেখাই সর্ব্বোচ্চ ভাব। তোমাদের সেই প্রাচীন পারস্যদেশীয় গল্পের কথা স্মরণ থাকিতে পারে। একজন প্রেমিক আসিয়া তাঁহার প্রেমাস্পদের ঘরের দরজায় ঘা মারিলেন। প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে ও?' তিনি বলিলেন, 'আমি'। দ্বার খুলিল না। দ্বিতীয়বার তিনি আসিয়া বলিলেন, 'আমি আসিয়াছি' কিন্তু দ্বার খুলিল না। তৃতীয়বার তিনি আসিলেন, আবার জিজ্ঞাসিত হইল, 'কে ও?' তখন তিনি বলিলেন, 'প্রেমাস্পদ, আমি তুমিই'; তখন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। ভগবান এবং আমাদের মধ্যেও তদ্রূপ। 'তুমি সকলেতে, তুমিই সকল। প্রত্যেক নরনারীই সেই প্রত্যক্ষ জীবন্ত আনন্দময় একমাত্র ঈশ্বর। কে বলে, তুমি অজ্ঞাত? কে বলে, তোমাকে অন্বেষণ করিতে হইবে? আমরা তোমাকে অনন্তকালের জন্য পাইয়াছি। আমরা তোমাতে অনন্ত কালের জন্য বাস করিতেছি—সর্ব্বত্র অনন্তকালের জন্য জ্ঞাত, অনন্তকাল উপাসিত তোমাকে পাইয়াছি।'

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে বুঝিতে হইবে যে, বেদান্ত বলেন —অন্যান্য প্রকারের উপাসনা ভ্রমাত্মক নহে। এই বিষয়টি কোনমতে ভুলা উচিত নহে যে, যাহারা নানাপ্রকারে ক্রিয়াকাণ্ড দ্বারা ভগবানের উপাসনা করে, (আমরা উহাদিগকে যতই অনুপযোগী মনে করি না কেন) তাহারা বাস্তবিক ভ্রান্ত নহে। কারণ লোক সত্য হইতে সত্যে, নিম্নতর সত্য হইতে উচ্চতর সত্যে আরোহণ করিয়া থাকে। অন্ধকার বলিলে বুঝিতে হইবে অল্প আলো; মন্দ বলিলে বুঝিতে হইবে অল্প ভাল; অপবিত্রতা বলিলে বুঝিতে হইবে—অল্প পবিত্রতা। অতএব সত্যধারণার ইহাও এক দিক যে, আমাদিগকে অপরকে প্রেম ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিতে হইবে। আমরাও যে পথ দিয়া আসিয়াছি, তাহারাও সেই পথ দিয়া চলিতেছে। যদি তুমি বাস্তবিক মুক্ত হও, তবে তোমাকে অবশ্যই জানিতে হইবে তাহারাও শীঘ্র বা বিলম্বে মুক্ত হইবে। আর যখন তুমি মুক্তই হইলে তখন তুমি যাহা অনিত্য তাহা দেখ কি করিয়া? যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও তবে তুমি অপবিত্রতা দেখ কিরূপে? কারণ যাহা ভিতরে থাকে তাহাই বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিজেদের ভিতরে অপবিত্রতা না থাকিলে বাহিরে উহা কখনই দেখিতে পাইতাম না। বেদান্তের ইহা একটি সাধনার দিক। আশা করি আমরা সকলে জীবনে ইহা পরিণত করিবার চেষ্টা করিব। ইহা অভ্যাস করিবার জন্য সারা জীবনটা পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু এই সকল বিচার-আলোচনায় আমরা এই ফললাভ করিলাম যে, অশান্তি ও অসন্তোষের পরিবর্ত্তে আমরা শান্তি ও সন্তোষের সহিত কার্য্য

করিব। কারণ আমরা জানিলাম সমুদয়ই আমাদের ভিতরে—উহা আমাদেরই রহিয়াছে, উহা আমাদের জন্মপ্রাপ্ত স্বত্ব। আমাদের আবশ্যক—কেবল উহাকে প্রকাশ করা, প্রত্যক্ষগোচর করা।

# কর্ম্মজীবনে বেদান্ত

## তৃতীয় প্রস্তাব

পূর্ব্বোক্ত (ছান্দোগ্য) উপনিষদ্ হইতেই আমরা পাইতেছি যে, দেবর্ষি নারদ এক সময় সনৎকুমারের নিকট আগমন করিয়া অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সনৎকুমার তাঁহাকে সোপানারোহণন্যায়ে ধীরে ধীরে লইয়া গিয়া অবশেষে আকাশতত্ত্বে উপনীত হইলেন। 'আকাশ তেজ হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যুৎ, তারা সকলেই রহিয়াছে। আকাশেই আমরা শ্রবণ করিতেছি, আকাশেই জীবনধারণ করিয়া আছি, আকাশেই আমরা মরিতেছি।' এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু আছে কিনা। সনৎকুমার বলিলেন, প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। বেদান্তমতে এই প্রাণই জীবনের মূলীভূত শক্তি। আকাশের ন্যায় ইহাও একটি সর্ব্বব্যাপী তত্ত্ব, আর আমাদের শরীরে বা অন্যত্র যাহা কিছু গতি দেখা যায়, সবই প্রাণের কার্য্য। প্রাণ আকাশ হইতেও শ্রেষ্ঠ। প্রাণের দ্বারাই সকল বস্তু বাঁচিয়া রহিয়াছে, প্রাণই মাতা, প্রাণই পিতা, প্রাণই ভগিনী, প্রাণই আচার্য্য, প্রাণই জ্ঞাতা।

আমি তোমাদের নিকট ঐ উপনিষদ্ হইতেই আর এক অংশ পাঠ করিব। শ্বেতকেতু পিতা আরুণির নিকট সত্যসম্বন্ধে প্রশ্ন

করিতে লাগিলেন। পিতা তাঁহাকে নানা বিষয় শিখাইয়া অবশেষে বলিলেন, 'এই সকল বস্তুর যে সূক্ষ্ম কারণ, তাহা হইতেই ইহারা নির্ম্মিত, ইহাই সব, ইহাই সত্য; হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' তারপর তিনি ইহা বুঝাইবার জন্য নানা উদাহরণ দিতে লাগিলেন। 'হে শ্বেতকেতো, যেমন মধুমক্ষিকা বিভিন্ন পুষ্প হইতে মধুসঞ্চয় করিয়া একত্র করে এবং এই বিভিন্ন মধু যেমন জানে না যে তাহারা কোথা হইতে আসিয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎ হইতে উৎপন্ন হইয়াও তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। অতএব হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' 'যেমন বিভিন্ন নদী বিভিন্ন স্থানে উৎপন্ন হইয়া সমুদ্রে পতিত হয়, কিন্তু এই নদীসকল যেমন জানে না ইহারা কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ আমরাও সেই সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা জানি না যে আমরা তাহাই। হে শ্বেতকেতো, তুমি তাহাই।' পিতা পুত্রকে এইরূপ উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এক্ষণে কথা এই, সকল জ্ঞানলাভের দুইটি মূলসূত্র আছে। একটি সূত্র এই—বিশেষকে সাধারণে এবং সাধারণকে আবার সার্ব্বভৌম তত্ত্বে সমাধান করিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হইবে। দ্বিতীয় সূত্র এই—যে কোন বস্তুর ব্যাখ্যা করিতে হইবে, যতদূর সম্ভব সেই বস্তুর স্বরূপ হইতেই তাহার ব্যাখ্যা অন্বেষণ করিতে হইবে। প্রথম সূত্রটি ধরিয়া আমরা দেখিতে পাই, আমাদের সমুদয় জ্ঞান বাস্তবিক উচ্চ হইতে উচ্চতর শ্রেণীবিভাগ মাত্র। একটা কিছু যখন ঘটে তখন আমরা যেন অতৃপ্ত হই। যখন ইহা দেখান যায় যে, সেই একই ঘটনা পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে, তখন আমরা তৃপ্ত

হই এবং উহাকে 'নিয়ম' আখ্যা দিয়া থাকি। যখন একটি প্রস্তর অথবা আপেল পড়িতে দেখিতে পাই, তখন আমরা অতৃপ্ত হই। কিন্তু যখন দেখি, সকল প্রস্তর বা আপেলই পড়িতেছে, তখন আমরা উহাকে মাধ্যাকর্ষণের নিয়ম বলি এবং তৃপ্ত হইয়া থাকি। ব্যাপার এই, আমরা বিশেষ হইতে সাধারণ তত্ত্বে গমন করিয়া থাকি। ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলেও ইহাই একমাত্র বৈজ্ঞানিক প্রণালী।

ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতে গেলে এবং উহাকে বৈজ্ঞানিকভাবে পরিণত করিতে গেলেও আমাদিগকে সেই মূলসূত্রের অনুসরণ করিতে হইবে। বাস্তবিক আমরা দেখিতে পাই, এই প্রণালীই অনুসৃত হইয়াছে। এই উপনিষদ্, যাহা হইতে তোমাদিগকে শুনাইতেছি, তাহাতেও দেখিতে পাই, সর্ব্বপ্রথমে এই ভাবের অভ্যুদয় হইয়াছে—বিশেষ হইতে সাধারণে গমন। আমরা দেখিতে পাই কিরূপে দেবগণ ক্রমশঃ একে লয় হইয়া এক তত্ত্বরূপে পরিণত হইতেছেন; জগতের ধারণায়ও তাঁহারা ক্রমশঃ কেমন অগ্রসর হইতেছেন, কেমন সূক্ষ্ম ভূত হইতে তাঁহারা সূক্ষ্মতর ও অধিকতর ব্যাপী ভূতে যাইতেছেন, কেমন তাঁহারা বিশেষ বিশেষ ভূত হইতে আরম্ভ করিয়া অবশেষে এক সর্ব্বব্যাপী আকাশতত্ত্বে উপনীত হইয়াছেন, কিরূপে তথা হইতেও অগ্রসর হইয়া তাঁহারা প্রাণনামক সর্ব্বব্যাপিনী শক্তিতে উপনীত হইতেছেন, আর এই সকলের ভিতরই আমরা এই এক তত্ত্ব পাইতেছি যে, একটি বস্তু অপর সকল বস্তু হইতে পৃথক নহে। আকাশই সূক্ষ্মতররূপে প্রাণ এবং প্রাণ আবার স্থূল হইয়া আকাশ হয়, আকাশ আবার স্থূল হইতে স্থূলতর হইতে থাকে, ইত্যাদি।

সগুণ ঈশ্বরকে তদপেক্ষা উচ্চতর তত্ত্বে সমাধানও এই মূলসূত্রের আর একটি উদাহরণ। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সগুণ ঈশ্বরের ধারণাও এইরূপ সামান্যীকরণের ফল। ইহা হইতে পাওয়া গিয়াছে এইটুকু যে, সগুণ ঈশ্বর সমুদয় জ্ঞানের সমষ্টিস্বরূপ। কিন্তু ইহাতে একটি শঙ্কা উঠিতেছে, ইহা ত পর্য্যাপ্ত সামান্যীকরণ হইল না! আমরা প্রাকৃতিক ঘটনার এক দিক অর্থাৎ জ্ঞানের দিক লইলাম, তাহা হইতে সামান্যীকরণ প্রণালীতে সগুণ ঈশ্বরে উপনীত হইলাম, কিন্তু বাকী প্রকৃতিটি সব বাদ গেল। সুতরাং প্রথমতঃ এই সামান্যীকরণ অসম্পূর্ণ। ইহাতে আর একটি অসম্পূর্ণতা আছে, তাহা দ্বিতীয় সূত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতেই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। অনেক লোক হয় ত এক সময়ে ভাবিত, মাটিতে যে কোন পাথর পড়ে তাহাই ভূতে ফেলিতেছে, কিন্তু মাধ্যাকর্ষণই বাস্তবিক ইহার ব্যাখ্যা, আর যদিও আমরা জানি ইহা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নহে, কিন্তু ইহা অপর ব্যাখ্যা হইতে যে শ্রেষ্ঠ তাহা নিশ্চয়; কারণ একটি ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দ্দেশস্থ কারণ হইতে, অপরটি বস্তুর স্বভাব হইতে লব্ধ। এইরূপে আমাদের সমুদয় জ্ঞানের সম্বন্ধেই যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর প্রকৃতি হইতে লব্ধ তাহা বৈজ্ঞানিক, আর যে-কোন ব্যাখ্যা বস্তুর বহির্দ্দেশ হইতে লব্ধ তাহা অবৈজ্ঞানিক।

এক্ষণে 'সগুণ ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা' এই তত্ত্বটিকেও এই সূত্রটি দ্বারা পরীক্ষা করা যাউক। যদি এই ঈশ্বর প্রকৃতির বহির্দ্দেশে থাকেন, যদি প্রকৃতির সঙ্গে তাঁহার কোন সম্বন্ধ না থাকে এবং যদি এই প্রকৃতি শূন্য হইতে, সেই ঈশ্বরের আজ্ঞা হইতে

উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে স্বভাবতঃই ইহা অতি অবৈজ্ঞানিক মত হইয়া দাঁড়াইল। আর চিরকালই সগুণ ঈশ্বরবাদের এইখানে একটু গোল আছে—ইহাই ইহার দুর্ব্বলতা। এই মতে ঈশ্বর মানবগুণসম্পন্ন, কেবল সেই গুণগুলি অপেক্ষাকৃত অধিক পরিমাণে বর্দ্ধিত। যিনি শূন্য হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন অথচ যিনি জগৎ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, এরূপ ঈশ্বরবাদের দুইটি দোষ দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রথমতঃ, ইহা সামান্যের সম্পূর্ণ সমাধান নহে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা বস্তুর স্বভাব হইতে উহার ব্যাখ্যা নহে। উহা কার্য্যকে কারণ হইতে পৃথক্ বলিয়া ব্যাখ্যা করে। কিন্তু মানুষ যতই জ্ঞানলাভ করিতেছে, ততই সে এই মতের দিকে অগ্রসর হইতেছে যে, কার্য্য কারণের রূপান্তরমাত্র। আধুনিক বিজ্ঞানের সমুদয় আবিষ্ক্রিয়া এই দিকেই ইঙ্গিত করিতেছে আর আধুনিক সর্ব্ববাদিসম্মত ক্রমবিকাশবাদের তাৎপর্য্যই এই যে, কার্য্য কারণের রূপান্তরমাত্র। শূন্য হইতে সৃষ্টি আধুনিক বৈজ্ঞানিকদের উপহাসের বিষয়।

ধর্ম্ম কি পূর্ব্বোক্ত দুইটি পরীক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে? যদি এমন কোন ধর্ম্মমত থাকে, যাহা এই দুইটি পরীক্ষায় টিকিয়া যায়, তাহাই আধুনিক চিন্তাশীল মনে গ্রাহ্য হইবে। যদি পুরোহিত, চার্চ্চ, অথবা কোন শাস্ত্রের মতানুসারে কোন মত তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করিতে বল, তবে বর্ত্তমান কালের লোকে উহা বিশ্বাস করিতে পারিবে না, তাহার ফল দাঁড়াইবে—ঘোর অবিশ্বাস। যাহারা বাহিরে দেখিতে খুব বিশ্বাসী, তাহারা বাস্তবিক ভিতরে

ঘোর অবিশ্বাসী দেখা যায়। অবশিষ্ট লোকে ধর্ম্ম একেবারে ছাড়িয়া দেয়, উহা হইতে দূরে পলাইয়া যায়, যেন উহার সহিত কোন সম্পর্কই রাখিতে চায় না, উহাকে পুরোহিতদের জুয়াচুরি মনে করে।

ধর্ম্ম এক্ষণে জাতীয়ভাবে পরিণত হইয়াছে। উহা আমাদেব প্রাচীন সমাজের একটি মহান উত্তরাধিকার, অতএব উহাকে থাকিতে দাও—ইহাই আমাদের ভাব। কিন্তু আধুনিক লোকের পূর্ব্বপুরুষ উহার জন্য যে প্রকৃত আগ্রহ বোধ করিতেন, এক্ষণে তাহা চলিয়া গিয়াছে; লোকে উহাকে এখন যুক্তিযুক্ত মনে করে না। এইরূপ সগুণ ঈশ্বর ও সৃষ্টির ধারণা, যাহাকে সচরাচর সকল ধর্ম্মেই একেশ্বরবাদ বলে, তাহাতে এখন লোকের প্রাণ তৃপ্ত হয় না, আর ভারতে বৌদ্ধদের প্রভাবে উহা প্রবল হইতে পায় নাই; আর এই বিষয়েই বৌদ্ধেরা প্রাচীনকালে জয়লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা ইহা দেখাইয়া দিলেন, যদি প্রকৃতিকে অনন্তশক্তিসম্পন্ন বলিয়া মানা যায়, যদি প্রকৃতি উহার আপন অভাব আপনিই পূরণ করিতে পারে, তবে প্রকৃতির অতীত কিছু আছে, ইহা স্বীকার করা অনাবশ্যক। আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিবারও কোন প্রয়োজন নাই। এই বিষয়ে প্রাচীনকাল হইতে একটি তর্কবিতর্ক চলিয়া আসিতেছে। এখনও সেই প্রাচীন কুসংস্কার জীবিত রহিয়াছে—দ্রব্য ও গুণের বিচার।

ইউরোপে মধ্যযুগে, এমন কি, দুঃখের সহিত আমাকে বলিতে হইতেছে, তাহার অনেকদিন পর পর্য্যন্তও এই একটি বিশেষ বিচারের বিষয় ছিল যে, গুণ দ্রব্যে লাগিয়া আছে, না দ্রব্য গুণে

লাগিয়া আছে। দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেধ কি জড়পদার্থ নামক দ্রব্যবিশেষে লাগিয়া আছে? আর এই গুণগুলি না থাকিলেও দ্রব্যটির অস্তিত্ব থাকে কি-না। এক্ষণে বৌদ্ধ আসিয়া বলিতেছেন, এরূপ একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, এই গুণগুলির কেবল অস্তিত্ব আছে। উহার অতিরিক্ত তুমি আর কিছু দেখিতে পাও না, আর ইহাই আধুনিক অধিকাংশ অজ্ঞেয়বাদীর মত, কারণ এই দ্রব্যগুণের বিচার আর একটু উচ্চভূমিতে লইয়া গেলে দেখা যায়, উহা ব্যবহারিক ও পারমার্থিক সত্তার বিচার। এই দৃশ্য জগৎ—নিত্যপরিণামশীল জগৎ রহিয়াছে আর ইহার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছুও রহিয়াছে, যাহার কখন পরিণাম হয় না; আর কেহ কেহ বলেন, এই দ্বিবিধ পদার্থেরই অস্তিত্ব আছে। আবার অনেকে অধিকতর যুক্তির সহিত বলেন আমাদের এই উভয় পদার্থ মানিবার কোন আবশ্যকতা নাই, কারণ আমরা যাহা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, তাহা কেবল দৃশ্যপদার্থ মাত্র। দৃশ্যের অতিরিক্ত কোন পদার্থ মানিবার তোমার কোন অধিকার নাই। এই কথার কোন সঙ্গত উত্তর প্রাচীনকালে কেহ দিতে পারেন নাই। কেবল আমরা বেদান্তের অদ্বৈতবাদ হইতে ইহার উত্তর পাইয়া থাকি—এক বস্তুর কেবল অস্তিত্ব আছে তাহাই কখন দ্রষ্টা কখন বা দৃশ্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে। ইহা সত্য নহে যে পরিণামশীল বস্তুর সত্তা আছে, আর তাহারই অভ্যন্তরে—অপরিণামী বস্তুও রহিয়াছে, কিন্তু সেই এক বস্তুই যাহা পরিণামশীল বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে, বাস্তবিকপক্ষে তাহা অপরিণামী।

বুঝিবার উপযুক্ত একটি দার্শনিক ধারণা করিবার জন্য আমরা দেহ, মন, আত্মা প্রভৃতি নানা ভেদ করিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এক সত্তাই বিরাজিত। সেই এক বস্তুই নানারূপে প্রতিভাত হইতেছে। অদ্বৈতবাদীদের চিরপরিচিত উপমা অনুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয়, রজ্জুই সর্পাকারে প্রতিভাত হইতেছে। অন্ধকারবশতঃ অথবা অন্য কোন কারণে অনেকে রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন, কিন্তু জ্ঞানের উদয় হইলে সর্পভ্রম ঘুচিয়া যায়, আর উহাকে রজ্জু বলিয়া বোধ হয়। এই উদাহরণের দ্বারা আমরা বেশ বুঝিতেছি যে, মনে যখন সর্পজ্ঞান থাকে তখন রজ্জুজ্ঞান চলিয়া যায়, আবার যখন রজ্জুজ্ঞানের উদয় হয় তখন সর্পজ্ঞান চলিয়া যায়। যখন আমরা ব্যবহারিক সত্তা দেখি তখন পারমার্থিক সত্তা থাকে না, আবার যখন আমরা সেই অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা দেখি তখন অবশ্যই ব্যবহারিক সত্তা আর প্রতিভাত হয় না। এক্ষণে আমরা প্রত্যক্ষবাদী ও বিজ্ঞানবাদী (idealist) উভয়েরই মত বেশ পরিষ্কার বুঝিতেছি। প্রত্যক্ষবাদী কেবল ব্যবহারিক সত্তা দেখেন আর বিজ্ঞানবাদী পারমার্থিক সত্তার দিক দেখিতে চেষ্টা করেন। প্রকৃত বিজ্ঞানবাদী, যিনি অপরিণামী সত্তাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে পরিণামশীল জগৎ আর থাকে না; তাঁহারই কেবল বলিবার অধিকার আছে যে, জগৎ সমস্তই মিথ্যা, পরিণাম বলিয়া কিছুই নাই। প্রত্যক্ষবাদী কিন্তু পরিণামীর দিকেই লক্ষ্য করিয়া থাকেন, তাঁহার পক্ষে অপরিণামী সত্তা উড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং তাঁহার জগৎ সত্য বলিবার অধিকার আছে।

এই বিচারের ফল কি হইল? ফল এই হইল যে, ঈশ্বরের সগুণ ধারণাই পর্য্যাপ্ত নহে। আমাদিগকে আরও উচ্চতর ধারণা করিতে হইবে অর্থাৎ নির্গুণের ধারণা চাই। উহা দ্বারা যে সগুণ ধারণা নষ্ট হইবে, তাহা নহে। আমরা সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করিলাম না, কিন্তু আমরা দেখাইলাম যে, যাহা আমরা প্রমাণ করিলাম, তাহাই একমাত্র ন্যায়সঙ্গত সিদ্ধান্ত। মানুষকেও আমরা এইরূপে সগুণ নির্গুণ উভয়াত্মক বলিয়া থাকি। আমরা সগুণও বটে, আবার নির্গুণও বটে। অতএব আমাদের প্রাচীন ঈশ্বরধারণা, অর্থাৎ ঈশ্বরের সগুণ ধারণা, তাঁহাকে কেবল একটি ব্যক্তি বলিয়া ধারণা, অবশ্যই চলিয়া যাওয়া চাই, কারণ মানুষকে যে ভাবে সগুণ নির্গুণ উভয়ই বলা যায়, আর একটু উচ্চতর ভাবে ঈশ্বরকেও সেইভাবে সগুণ নির্গুণ উভয়ই বলা যায়। অতএব সগুণের ব্যাখ্যা করিতে হইলে অবশ্যই অবশেষে আমাদিগকে নির্গুণ ধারণায় যাইতে হইবে, কারণ নির্গুণ ধারণা সগুণ ধারণা হইতে উচ্চতর ভাবে সমাধান। অনন্ত কেবল নির্গুণই হইতে পারে, সগুণ কেবল সান্ত মাত্র। অতএব এই ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা সগুণের রক্ষাই করিলাম, উহাকে উড়াইয়া দিলাম না। অনেক সময়ে এই সংশয় আসে—নির্গুণ ঈশ্বরের ধারণায় সগুণ ধারণা নষ্ট হইয়া যাইবে, নির্গুণ জীবাত্মার ধারণায় সগুণ জীবাত্মার ভাব নষ্ট হইয়া যাইবে; বাস্তবিক কিন্তু উহাতে 'আমিত্বের' নাশ না হইয়া উহার প্রকৃত রক্ষা হইয়া থাকে। আমরা সেই অনন্ত সত্তার সমাধান না করিয়া ব্যক্তির অস্তিত্ব কোনরূপে প্রমাণ করিতে পারি না।

যদি আমরা ব্যক্তিকে সমুদয় জগৎ হইতে পৃথক করিয়া ভাবিতে চেষ্টা করি, তবে কখনই তাহাতে সমর্থ হইব না, ক্ষণকালের জন্যও ওরূপ ভাবা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় তত্ত্বের আলোকে আমরা আরও কঠিন ও দুর্ব্বোধ্য তত্ত্বে উপনীত হই। যদি সকল বস্তুকে তাহার স্বরূপ হইতে ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এই দাঁড়ায় যে, সেই নিগুর্ণ পুরুষ—সামান্যীকরণপ্রক্রিয়ায় আমরা যে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্বে উপনীত হইয়াছি, তাহা আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে, বাস্তবিকপক্ষে আমরা তাহাই। 'হে শ্বেতকেতো, তত্ত্বমসি'—তুমি তাহাই, তুমিই সেই নিগুর্ণ পুরুষ, তুমিই সেই ব্রহ্ম যাঁহাকে তুমি সমুদয় জগতে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তাহা সর্ব্বদাই তুমি স্বয়ং। 'তুমি' কিন্তু 'ব্যক্তি' অর্থে নহে, নিগুর্ণ অর্থে। আমরা এই যে মানুষকে জানিতেছি, যাঁহাকে ব্যক্ত দেখিতেছি, তিনি বাস্তবিক সগুণ হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার প্রকৃত সত্তা নিগুর্ণ। এই সগুণকে জানিতে হইলে আমাদিগকে নিগুর্ণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে, বিশেষকে জানিতে হইলে সাধারণের ভিতর দিয়া জানিতে হইবে। সেই নিগুর্ণ সত্তাই বাস্তবিক সত্য, তিনি মানুষের আত্মস্বরূপ—এই সগুণ ব্যক্ত পুরুষকে সত্য বলা হয় নাই।

এসম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন উঠিবে। আমি ক্রমশঃ সেইগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা করিব। অনেক কূট প্রশ্ন উঠিবে, কিন্তু উহাদের মীমাংসার পূর্ব্বে আমরা অদ্বৈতবাদ কি বলেন, তাহা বুঝিতে চেষ্টা করি, আইস। অদ্বৈতবাদ বলেন, এই যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছি,

ইহারই একমাত্র অস্তিত্ব আছে, অন্যত্র সত্যের অন্বেষণ করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। স্থূল-সূক্ষ্ম সবই এখানে; কার্য্য-কারণ সবই এখানে—জগতের ব্যাখ্যা এখানেই রহিয়াছে। যাহা বিশেষ বলিয়া পরিচিত, তাহা সেই সর্ব্বানুস্যূত সত্তারই সূক্ষ্ম ভাবে পুনরাবৃত্তিমাত্র। আমরা আমাদের আত্মা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াই জগৎসম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া থাকি। এই অন্তর্জ্জগৎ সম্বন্ধে যাহা সত্য, বহির্জ্জগৎসম্বন্ধেও তাহাই সত্য। স্বর্গ-নরক বলিয়া বাস্তবিক যদি কোন স্থান থাকে, তাহারাও এই জগতের অন্তর্গত, সমুদয় মিলিয়া এই এক ব্রহ্মাণ্ড হইয়াছে। অতএব প্রথম কথা এই, নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণুর সমষ্টিস্বরূপ এই 'এক' অখণ্ড বস্তু রহিয়াছে আর আমাদের প্রত্যেকেই যেন সেই একের অংশস্বরূপ। ব্যক্তজীবভাবে আমরা যেন পৃথক হইয়া রহিয়াছি, কিন্তু সেই একই সত্যস্বরূপ; আর যতই আমরা আপনাদিগকে উহা হইতে কম পৃথক মনে করিব, আমাদের পক্ষে ততই মঙ্গল। আর যতই আমরা ঐ সমষ্টি হইতে আপনাকে পৃথক মনে করিব, ততই আমাদের কষ্ট আসিবে। এই তত্ত্ব হইতে আমরা অদ্বৈতবাদসঙ্গত নীতিতত্ত্ব প্রাপ্ত হইলাম; আর আমি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি, আর কোন মত হইতে আমরা কোনরূপ নীতিতত্ত্বই প্রাপ্ত হই না। আমরা জানি নীতির প্রাচীনতম ধারণা ছিল—কোন পুরুষবিশেষ অথবা কতকগুলি পুরুষবিশেষের খেয়াল যাহা, তাহাই কর্ত্তব্য। এখন আর কেহ উহা মানিতে প্রস্তুত নহে; কারণ উহা আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র। হিন্দুরা বলেন, এই কার্য্য করা উচিত নয়, কারণ

বেদ উহা নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু খ্রীশ্চিয়ান বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করিতে প্রস্তুত নন। খ্রীশ্চিয়ান আবার বলেন—এ কাজ করিও না, ওকাজ করিও না, কারণ বাইবেলে ঐ সকল কার্য্য করিতে নিষেধ আছে। যাহারা বাইবেল মানে না, তাহারা অবশ্য একথা শুনিবে না। আমাদিগকে এমন এক তত্ত্ব বাহির করিতে হইবে, যাহা এই নানাবিধ বিভিন্ন ভাবের সমন্বয় করিতে পারে। যেমন লক্ষ লক্ষ লোক সগুণ সৃষ্টিকর্ত্তায় বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, সেইরূপ এই জগতে সহস্র সহস্র মনীষী আছেন, যাঁহাদের পক্ষে ঐ সকল ধারণা পর্য্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারা উহা অপেক্ষা উচ্চতর কিছু প্রার্থনা করেন ; আর যখনই ধর্ম্মসম্প্রদায়সমূহ এইসকল মনীষিগণকে আপনার অন্তর্ভুক্ত করিবার উপযোগী উদারভাবাপন্ন হয় নাই, তখনই ফল এই হইয়াছে যে, সমাজের উজ্জ্বলতম রত্নগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় পরিত্যাগ করিয়াছে, আর বর্ত্তমান কালে প্রধানতঃ ইউরোপখণ্ডে ইহা যত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, আর কখনও এরূপ হয় নাই।

ইহাদিগকে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ভিতর রাখিতে হইলে অবশ্য উহা খুব উদারভাবাপন্ন হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্ম যাহা কিছু বলে, সমুদয় যুক্তির কষ্টিতে ফেলিয়া পরীক্ষা করা আবশ্যক। সকল ধর্ম্মেই কেন যে এই এক দাবি করিয়া থাকেন যে, তাঁহারা যুক্তির দ্বারা পরীক্ষিত হইতে চান না, তাহা কেহই বলিতে পারে না। বাস্তবিক ইহার কারণ এই যে, গোড়াতেই গলদ আছে। যুক্তির মানদণ্ড ব্যতীত, ধর্ম্মবিষয়েও কোনরূপ বিচার বা সিদ্ধান্ত

সম্ভব নহে। কোন ধর্ম্ম হয়ত কিছু বীভৎস ব্যাপার করিতে আজ্ঞা দিল।···মনে কর, মুসলমানধর্ম্মেব কোন আদেশের উপর একজন খ্রীশ্চিয়ান কোন এক দোষারোপ করিল। তাহাতে মুসলমান স্বভাবতঃই জিজ্ঞাসা কবিবেন—কি করিয়া তুমি জানিলে উহা ভাল কি মন্দ? তোমার ভালমন্দের ধারণা ত তোমাব শাস্ত্র হইতে! আমার শাস্ত্র বলিতেছে, 'ইহা সৎকার্য্য।' যদি তুমি বল, তোমার শাস্ত্র প্রাচীন, তাহা হইলে বৌদ্ধেবা বলিবেন—আমাদের শাস্ত্র তোমাদের অপেক্ষা প্রাচীন। আবার হিন্দু বলিবেন—আমার শাস্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। অতএব শাস্ত্রের দোহাই দিলে চলিবে না। তোমার আদর্শ কোথায়, যাহাকে লইয়া তুমি সমুদয় তুলনা করিতে পাব? খ্রীশ্চিয়ান বলিবেন, ঈশার 'শৈলোপদেশ' দেখ; মুসলমান বলিবেন, 'কোরাণের নীতি' দেখ। মুসলমান বলিবেন—এ দুয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে, তাহা কে বিচার করিবে, মধ্যস্থ কে হইবে? বাইবেল ও কোরাণে যখন বিবাদ, তখন উভয়ের মধ্যে কেহই মধ্যস্থ হইতে পারেন না। কোন স্বতন্ত্র ব্যক্তি উহার মীমাংসক হইলেই ভাল হয়। উহা কোন গ্রন্থ হইতে পারে না, কিন্তু সার্ব্বভৌম কোন পদার্থ ইহার মীমাংসক হওয়া আবশ্যক। যুক্তি হইতে সার্ব্বভৌম আর কি আছে? কথিত হইয়া থাকে, যুক্তি সকল সময়ে সত্যানুসন্ধানে সক্ষম নহে। অনেক সময় উহা ভুল করে বলিয়া এই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কোন পুরোহিত-সম্প্রদায়ের শাসনে বিশ্বাস করিতে হইবে। ···আমি কিন্তু বলি, যদি যুক্তি দুর্ব্বল হয়, তবে পুরোহিতসম্প্রদায় আরও অধিক

দুর্ব্বল হইবেন, আমি তাঁহাদের কথা না শুনিয়া যুক্তি শুনিব, কারণ যুক্তিতে যতই দোষ থাকুক, উহাতে কিছু সত্য পাইবার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু অপর উপায়ে কোন সত্যলাভেরই সম্ভাবনা নাই।

অতএব আমাদিগকে যুক্তির অনুসরণ করিতে হইবে, আর যাহারা যুক্তির অনুসরণ করিয়া কোন বিশ্বাসেই উপনীত হয় না, তাহাদিগের সহিতও আমাদিগকে সহানুভূতি করিতে হইবে। কারণ কাহারও মতে মত দিয়া বিশ লক্ষ দেবতা বিশ্বাস করা অপেক্ষা যুক্তির অনুসরণ করিয়া নাস্তিক হওয়াও ভাল। আমরা চাই উন্নতি, বিকাশ, প্রত্যক্ষানুভূতি। কোন মত অবলম্বন করিয়াই মানুষ শ্রেষ্ঠ হয় নাই। কোটি কোটি শাস্ত্রও আমাদিগকে পবিত্রতর হইতে সাহায্য করে না। ঐরূপ হইবার একমাত্র শক্তি আমাদের ভিতরেই আছে। প্রত্যক্ষানুভূতিই আমাদিগকে পবিত্র হইতে সাহায্য করে আর ঐ প্রত্যক্ষানুভূতি মননের ফলস্বরূপ। মানুষ চিন্তা করুক। মৃত্তিকাখণ্ড কখন চিন্তা করে না। ইহা তুমি মানিয়াই লইতে পার যে, উহা সমুদয় বিশ্বাস করে, তথাপি উহা মৃত্তিকাখণ্ডমাত্র। একটি গাভীকে যাহা ইচ্ছা বিশ্বাস করান যাইতে পারে। কুকুর সর্ব্বাপেক্ষা চিন্তাহীন জন্তু। ইহারা কিন্তু যে কুকুর, যে গাভী, যে মৃত্তিকাখণ্ড তাহাই থাকে, কিছুই উন্নতি করিতে পারে না। কিন্তু মানুষের মহত্ত্ব—মননশীল জীব বলিয়া; পশুদিগের সহিত আমাদের ইহাই প্রভেদ। মানুষের এই মনন স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, অতএব আমাদিগকে অবশ্য মনের চালনা করিতে হইবে। এই জন্যই আমি যুক্তিতে বিশ্বাস করি এবং যুক্তির অনুসরণ করি, আমি শুধু লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া কি

অনিষ্ট হয়, তাহা বিশেষরূপে দেখিয়াছি, কারণ আমি যে দেশে জন্মিয়াছি সেখানে এই অপরের বাক্যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত করিয়াছে।

হিন্দুরা বিশ্বাস করেন, বেদ হইতে সৃষ্টি হইয়াছে। একটি গো আছে, কিরূপে জানিলে? কারণ 'গো' শব্দ বেদে রহিয়াছে। মানুষ আছে কি করিয়া জানিলে? কারণ বেদে 'মনুষ্য' শব্দ রহিয়াছে। হিন্দুরা ইহাই বলেন। এ যে বিশ্বাসের চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি আর আমি যে-ভাবে ইহার আলোচনা করিতেছি, সে ভাবে ইহার আলোচনা হয় না। কতকগুলি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ব্যক্তি ইহা লইয়া কতকগুলি অপূর্ব্ব দার্শনিক তত্ত্ব বাহির করিয়াছেন, আর সহস্র সহস্র বুদ্ধিমান ব্যক্তি সহস্র সহস্র বৎসর এই মতান্দোলনে কালক্ষেপণ করিয়াছেন। লোকের কথায় যুক্তিশূন্য বিশ্বাসের এতদূর শক্তি, উহাতে বিপদও এত। উহা মনুষ্যজাতির উন্নতির স্রোত অবরুদ্ধ করে, আর আমাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয় যে, আমাদের উন্নতিই আবশ্যক। সমুদয় আপেক্ষিক সত্যানুসন্ধানেও সত্যটি অপেক্ষা আমাদের মনের চালনাই বেশী আবশ্যক হইয়া থাকে। মননই আমাদের জীবন।

অদ্বৈতবাদের এইটুকু গুণ যে, ধর্ম্মমতের ভিতর এই মতটিই অনেকটা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণের যোগ্য। নির্গুণ ঈশ্বর, প্রকৃতিতে তাঁহার অবস্থিতি আর প্রকৃতি যে নির্গুণ পুরুষের পরিণাম, এই সত্যগুলি অনেকটা প্রমাণের যোগ্য, আর অন্য সমুদয় ভাব—ঈশ্বরের আংশিক ও সগুণ ধারণাসকল—বিচারসহ নহে। ইহার আর একটি গুণ এই যে, এই যুক্তিসঙ্গত ঈশ্বরবাদ ইহাই প্রমাণ করে যে, এই আংশিক ধারণাগুলি এখনও অনেকের পক্ষে আবশ্যক। এই

মতগুলির অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে ইহাই একমাত্র যুক্তি। দেখিবে, অনেক লোকে বলিয়া থাকে, এই সগুণবাদ অযৌক্তিক, কিন্তু ইহা বড় শান্তিপ্রদ। তাহারা সখের ধর্ম্ম চাহিয়া থাকে; আর আমরা বুঝিতে পারি, তাহাদের জন্য ইহার প্রয়োজন আছে। অতি অল্প লোকই সত্যের বিমল আলোক সহ্য করিতে পারে, তদনুসারে জীবনযাপন করা ত দূরের কথা। অতএব এই সখের ধর্ম্মও থাকা দরকার; সময়ে ইহা অনেককে উচ্চতর ধর্ম্মলাভে সাহায্য করে। যে ক্ষুদ্র মনের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামান্য বস্তুই যে মনের উপাদান, সে মন কখন উচ্চ চিন্তার রাজ্যে বিচরণ করিতে সাহস করে না। তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতা, প্রতিমা ও আদর্শের ধারণা উত্তম ও উপকারী, কিন্তু তোমাদিগকে নির্গুণবাদও বুঝিতে হইবে, আর এই নির্গুণবাদের আলোকেই এইগুলির উপকারিতা প্রতীত হইতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ জন ষ্টুয়ার্ট মিলের কথা ধর। তিনি ঈশ্বরের নির্গুণভাব বুঝেন ও বিশ্বাস করেন—তিনি বলেন, সগুণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। আমি এ বিষয়ে তাঁহার সহিত একমত; তবে আমি বলি, মনুষ্যবুদ্ধিতে নির্গুণের যতদূর ধারণা করা যাইতে পারে, তাহাই সগুণ ঈশ্বর। আর বাস্তবিকই জগৎটা কি? বিভিন্ন মন সেই নির্গুণেরই যতদূর ধারণা করিতে পারে তাহাই; উহা যেন আমাদের সম্মুখে বিস্তৃত এক একখানি পুস্তকস্বরূপ, আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুদ্ধি দ্বারা উহা পাঠ করিতেছে, আর প্রত্যেককেই উহা নিজে নিজে পাঠ করিতে হয়। সকল মানুষেরই বুদ্ধি কতকটা সদৃশ, সেইজন্য

মনুষ্যবুদ্ধিতে কতকগুলি জিনিস একরূপ বলিয়া প্রতীত হয়। তুমি আমি উভয়েই একখানি চেয়ার দেখিতেছি। ইহাতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের উভয়ের মনই কতকটা একভাবে গঠিত। মনে কর অপর কোনরূপ ইন্দ্রিয়সম্পন্ন জীব আসিল; সে আর আমাদের অনুভূত চেয়ার দেখিবে না, কিন্তু যাহারা যাহারা সমপ্রকৃতিক, তাহারা সব একরূপ দেখিবে। অতএব জগৎই সেই নিরপেক্ষ অপরিণামী পারমার্থিক সত্তা, আর ব্যবহারিক সত্তা তাহাকেই বিভিন্নভাবে দর্শনমাত্র। ইহার কারণ প্রথমতঃ ব্যবহারিক সত্তা সর্ব্বদাই সসীম। আমরা যে-কোন ব্যবহারিক সত্তা দেখি, অনুভব করি বা চিন্তা করি, আমরা দেখিতে পাই, উহা অবশ্যই আমাদের জ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ, অতএব সসীম হইয়া থাকে; আর সগুণসম্বন্ধে আমাদের যেরূপ ধারণা তাহাতে তিনিও ব্যবহারিক মাত্র। কার্য্যকারণ ভাব কেবল ব্যবহারিক জগতেই সম্ভব, আর তাঁহাকে যখন জগতের কারণ বলিয়া ভাবিতেছি তখন অবশ্য তাঁহাকে সসীমরূপে ধারণা করিতেই হইবে। তাহা হইলেও কিন্তু তিনি সেই নিগুণ ব্রহ্ম। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, এই জগৎও আমাদের বুদ্ধির মধ্য দিয়া দৃষ্ট সেই নির্গুণ ব্রহ্মমাত্র। প্রকৃতপক্ষে জগৎ সেই নির্গুণ পুরুষমাত্র, আর আমাদের বুদ্ধির দ্বারা উহার উপর নাম-রূপ দেওয়া হইয়াছে। এই টেবিলের মধ্যে যতটুকু সত্য তাহা সেই পুরুষ, আর এই টেবিলের আকৃতি আর অন্যান্য যাহা কিছু সবই সদৃশ মানববুদ্ধি দ্বারা তাহার উপর প্রদত্ত হইয়াছে।

উদাহরণস্বরূপ গতির বিষয় ধর। ব্যবহারিক সত্তার উহা

নিত্যসহচর। উহা কিন্তু সেই সার্ব্বভৌম পারমার্থিক সত্তা-সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র অণু, জগতের অন্তর্গত প্রত্যেক পরমাণু সর্ব্বদাই পরিবর্ত্তন ও গতিশীল, কিন্তু সমষ্টি হিসাবে জগৎ অপরিণামী, কারণ গতি বা পরিণাম আপেক্ষিক পদার্থমাত্র। আমরা কেবল গতিহীন পদার্থের সহিত তুলনায় গতিশীল পদার্থের কথা ভাবিতে পারি। গতি বুঝিতে গেলেই দুইটি পদার্থের আবশ্যক। সমুদয় সমষ্টিজগৎ এক অখণ্ডসত্তাস্বরূপ, উহার গতি অসম্ভব। কাহার সহিত তুলনায় উহার গতি হইবে? উহার পরিণাম হয়, তাহাও বলিতে পারা যায় না। কাহার সহিত তুলনায় উহার পরিণাম হইবে? অতএব সেই সমষ্টি নিরপেক্ষ সত্তা, কিন্তু উহার অন্তর্গত প্রত্যেক অণুই নিরন্তর গতিশীল; এক সময়েই উহা অপরিণামী ও পরিণামী, সগুণ নির্গুণ উভয়ই। আমাদের জগৎ, গতি এবং ঈশ্বরসম্বন্ধে এই ধারণা, আর তত্ত্বমসির অর্থ ইহাই। আমাদিগকে আমাদের স্বরূপ জানিতে হইবে।

সগুণ মানুষ তাহার উৎপত্তিস্থল ভুলিয়া যায়, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্র হইতে বাহির হইয়া আসিয়া সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এইরূপ আমরা সগুণ হইয়া, ব্যষ্টি হইয়া আমাদের প্রকৃত স্বরূপ ভুলিয়া গিয়াছি, আর অদ্বৈতবাদ আমাদিগকে বিষমভাবাপন্ন জগৎকে ত্যাগ করিতে শিক্ষা দেয় না, উহা কি তাহাই বুঝিতে বলে। আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জলস্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে, আর বাস্তবিকই উহা সমুদ্র—সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদয় সমুদ্রস্বরূপ, কারণ যে অনন্ত শক্তিরাশি

ব্রহ্মাণ্ডে বর্ত্তমান, তাহার সমুদয়ই তোমার ও আমার। তুমি আমি, এমন কি, প্রত্যেক ব্যক্তিই যেন কতকগুলি প্রণালীর মত—যাহাদের ভিতর দিয়া সেই অনন্ত সত্তা আপনাকে অভিব্যক্ত করিতেছে; আর এই যে পরিবর্ত্তনসমষ্টিকে আমরা 'ক্রমবিকাশ' নাম দিই, তাহারা বাস্তবিকপক্ষে আত্মার নানারূপ শক্তিবিকাশ মাত্র, কিন্তু অনন্তের এ পারে, সান্ত জগতে আত্মার সমুদয় শক্তির প্রকাশ হওয়া অসম্ভব। আমরা এখানে যতই শক্তি, জ্ঞান বা আনন্দলাভ করি না কেন, উহারা কখনই এ জগতে সম্পূর্ণ হইতে পারে না। অনন্ত সত্তা, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ আমাদের রহিয়াছে। উহাদিগকে যে আমরা উপার্জ্জন করিব, তাহা নহে, উহারা আমাদেরই রহিয়াছে, প্রকাশ করিতে হইবে মাত্র।

অদ্বৈতবাদ হইতে এই এক মহৎ সত্য পাওয়া যাইতেছে, আর ইহা বুঝা বড় কঠিন। আমি বাল্যকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, সকলেই দুর্ব্বলতা শিক্ষা দিতেছে; জন্মাবধিই আমি শুনিয়া আসিতেছি, আমি দুর্ব্বল। এক্ষণে আমার পক্ষে আমার স্বকীয় অন্তর্নিহিত শক্তির জ্ঞান কঠিন হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যুক্তি-বিচারের দ্বারা দেখিতে পাইতেছি, আমাকে কেবল আমার নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিসম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে হইবে মাত্র, তাহা হইলেই সব হইয়া গেল। এই জগতে আমরা যে-সকল জ্ঞানলাভ করিয়া থাকি, তাহারা কোথা হইতে আসিয়া থাকে? উহারা আমাদের ভিতরই রহিয়াছে। বহির্দ্দেশে কোন্ জ্ঞান আছে?—আমাকে এক বিন্দুও দেখাও। জ্ঞান কখনও জড়ে ছিল না, উহা বরাবর মনুষ্যের ভিতরেই ছিল। কেহ কখনও জ্ঞানের সৃষ্টি করে নাই;

মানুষ উহা আবিষ্কার করে, উহাকে ভিতর হইতে বাহির করে, উহা তথায়ই রহিয়াছে। এই যে ক্রোশব্যাপী বৃহৎ বটবৃক্ষ রহিয়াছে, তাহা ঐ সর্ষপবীজের অষ্টমাংশের তুল্য ঐ ক্ষুদ্র বীজে রহিয়াছে —ঐ মহাশক্তিরাশি তথায় নিহিত রহিয়াছে। আমরা জানি, একটি জীবাণুকোষের ভিতর অত্যদ্ভুত প্রখরা বুদ্ধি কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করে; তবে অনন্ত শক্তি কেন না তাহাতে থাকিতে পারিবে? আমরা জানি, ইহা সত্য। প্রহেলিকাবৎ বোধ হইলেও ইহা সত্য। আমরা সকলেই একটি জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, আর আমাদের যাহা কিছু ক্ষুদ্র শক্তি রহিয়াছে, তাহা তথায়ই কুণ্ডলীভূত হইয়া অবস্থান করিতেছিল। তোমরা বলিতে পার না, উহা খাদ্য হইতে প্রাপ্ত; রাশীকৃত খাদ্য লইয়া খাদ্যের এক পর্ব্বত প্রস্তুত কর, দেখ তাহা হইতে কি শক্তি বাহির হয়। আমাদের ভিতর শক্তি পূর্ব্ব হইতেই অন্তর্নিহিত ছিল অব্যক্তভাবে, কিন্তু উহা ছিল নিশ্চয়ই; অতএব সিদ্ধান্ত এই—মানুষের আত্মার ভিতর অনন্ত শক্তি রহিয়াছে, মানুষ উহার সম্বন্ধে না জানিলেও উহা রহিয়াছে, কেবল উহাকে জানিবার অপেক্ষামাত্র। ধীরে ধীরে যেন ঐ অনন্তশক্তিমান দৈত্য জাগরিত হইয়া আপনার শক্তি-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতেছে, আর যতই সে এই জ্ঞানলাভ করিতেছে ততই তাহার বন্ধনের পর বন্ধন খসিয়া যাইতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া যাইতেছে, আর এমন একদিন অবশ্য আসিবে যখনই এই অনন্তজ্ঞান পুনর্লাভ হইবে, তখন জ্ঞানবান ও শক্তিমান হইয়া এই দৈত্য দাঁড়াইয়া উঠিবে এস, আমরা সকলে এই অবস্থা-আনয়নে সাহায্য করি।

# কর্ম্মজীবনে বেদান্ত

## চতুর্থ প্রস্তাব

আমরা এ পর্য্যন্ত সমষ্টির আলোচনাই করিয়া আসিয়াছি। অদ্য প্রাতে আমি তোমাদের সমক্ষে ব্যষ্টির সহিত সমষ্টির সম্বন্ধ-বিষয়ে বেদান্তের মত বলিতে চেষ্টা করিব। আমরা প্রাচীনতর দ্বৈতবাদাত্মক বৈদিক মতসকলে দেখিতে পাই, প্রত্যেক জীবের একটি নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট আত্মা আছে, প্রত্যেক জীবে অবস্থিত এই বিশেষ আত্মা-সম্বন্ধে অনেক প্রকার মতবাদ প্রচলিত আছে। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ও প্রাচীন বৈদান্তিকদিগের মধ্যে প্রধান বিচার্য্য বিষয় এই ছিল যে—প্রাচীন বৈদান্তিকেরা স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মাতে বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধেরা এরূপ জীবাত্মার অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিতেন। আমি পূর্ব্বদিনই তোমাদিগকে বলিয়াছি, ইউরোপে দ্রব্য-গুণ সম্বন্ধে যে বিচার চলিয়াছিল, এ ঠিক তাহারই মত। একদলের মতে গুণগুলির পশ্চাতে দ্রব্যরূপী কিছু আছে, যাহাতে গুণগুলি লাগিয়া থাকে, আর এক মতে দ্রব্য স্বীকার করিবার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, গুণই স্বয়ং থাকিতে পারে। অবশ্য আত্মা-সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন মত অহং-সারূপ্যগত যুক্তির উপর স্থাপিত—'আমি আমিই,' কল্যকার যে আমি অদ্যও সেই আমি, আর অদ্যকার আমি আবার আগামী কল্যের আমি হইব,

শরীরে যাহা কিছু পরিণাম হইয়াছে তৎসমুদয় সত্ত্বেও আমি বিশ্বাস করি যে, আমি সর্ব্বদাই একরূপ। যাহারা সীমাবদ্ধ অথচ স্বয়ংপূর্ণ জীবাত্মায় বিশ্বাস করিতেন, ইহাই তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

অপরদিকে, প্রাচীন বৌদ্ধগণ এইরূপ জীবাত্মা-স্বীকারের প্রয়োজন অস্বীকার করিতেন। তাঁহারা এই তর্ক করিতেন যে, আমরা কেবল এই পরিণামগুলিকেই জানি এবং এই পরিণামগুলি ব্যতীত আর কিছু জানা আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে। একটি অপরিণম্য ও অপরিণামী দ্রব্য-স্বীকার কেবল বাহুল্যমাত্র, আর বাস্তবিক যদিই এরূপ অপরিণামী বস্তু কিছু থাকে, আমরা কখনই উহাকে বুঝিতে পারিব না, আর কোনরূপেও কখন উহাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব না। বর্ত্তমানকালেও ইউরোপে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানবাদী (idealist) এবং আধুনিক প্রত্যক্ষবাদী (realist) ও অজ্ঞেয়বাদীদের (agnostic) ভিতর সেইরূপ বিচার চলিতেছে। একদলের বিশ্বাস, অপরিণামী পদার্থ কিছু আছে। ইঁহাদের সর্ব্বশেষ প্রতিনিধি হার্ব্বার্ট স্পেন্সার (H. Spencer) বলেন, আমরা যেন অপরিণামী কোন পদার্থের আভাস পাইয়া থাকি। অপর মতের প্রতিনিধি কোম্‌তের (Comte) বর্ত্তমান শিষ্যগণ ও আধুনিক অজ্ঞেয়বাদিগণ। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে মিঃ হ্যারিসন (Mr. Harrison) ও মিঃ হার্ব্বার্ট স্পেন্সরের মধ্যে যে তর্ক হইয়াছিল, তোমাদের মধ্যে যাহারা উহা আগ্রহের সহিত আলোচনা করিয়াছিলে, তাহারা দেখিয়া থাকিবে ইহাতেও সেই প্রাচীন গোল বিদ্যমান; একদল পরিণামী বস্তুসমূহের পশ্চাতে কোন

অপরিণামী সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, অপর দল এরূপ স্বীকার করিবার আবশ্যকতাই একেবারে অস্বীকার করিতেছেন। একদল বলিতেছেন, আমরা অপরিণামী সত্তার ধারণা ব্যতীত পরিণাম ভাবিতেই পারি না; অপর দল যুক্তি দেখান—এরূপ স্বীকার করার কোন প্রয়োজন নাই, আমরা কেবল পরিণামী পদার্থেরই ধারণা করিতে পারি। অপরিণামী সত্তাকে আমরা জানিতে, অনুভব করিতে বা প্রত্যক্ষ করিতে পারি না।

ভারতে এই মহান প্রশ্নের সমাধান অতি প্রাচীন কালে প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, কারণ আমরা দেখিয়াছি গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত অথচ গুণভিন্ন পদার্থের সত্তা কখনই প্রমাণ করা যাইতে পারে না; শুধু তাহাই নহে, আত্মার অস্তিত্বের অহং-সারূপ্যগত প্রমাণ স্মৃতি হইতে আত্মার অস্তিত্বের যুক্তি—কালও যে আমি ছিলাম, আজও সেই আমি আছি; কারণ আমার উহা স্মরণ আছে, অতএব আমি বরাবর আছি—এই যুক্তিও কোন কাজের নহে। আর একটি যুক্ত্যাভাস যাহা সচরাচর কথিত হইয়া থাকে, তাহা কেবল কথার মারপ্যাঁচ মাত্র। 'আমি যাচ্ছি,' 'আমি খাচ্ছি,' 'আমি স্বপ্ন দেখ্‌ছি,' 'আমি ঘুমাচ্ছি,' 'আমি চলছি'—এইরূপ কতকগুলি বাক্য লইয়া তাঁহারা বলেন—করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা, এ সব বিভিন্ন পরিণাম বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে 'আমি'টি নিত্যভাবে রহিয়াছে, এইরূপে তাঁহারা সিদ্ধান্ত করেন যে, এই 'আমি' নিত্য ও স্বয়ং একটি ব্যক্তি আর ঐ পরিণামগুলি শরীরের ধর্ম্ম। এই যুক্তি আপাততঃ খুব উপাদেয় ও সুস্পষ্ট বোধ হইলেও বাস্তবিক উহা কেবল কথার মারপ্যাঁচের

উপর স্থাপিত। এই আমি এবং করা, যাওয়া, স্বপ্ন দেখা প্রভৃতি কাগজে-কলমে পৃথক হইতে পারে, কিন্তু মনে কেহই ইহাদিগকে পৃথক করিতে পারে না।

যখন আমি আহার করি, খাইতেছি বলিয়া চিন্তা করি, তখন আহারকার্য্যের সহিত আমার তাদাত্ম্যভাব হইয়া যায়। যখন আমি দৌড়াইতে থাকি, তখন আমি ও দৌড়ান দুইটি পৃথক বস্তু থাকে না। অতএব এই যুক্তি বড় দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। যদি আমার অস্তিত্বের সারূপ্য আমার স্মৃতিদ্বারা প্রমাণ করিতে হয়, তবে আমার যেসকল অবস্থা আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সেইসকল অবস্থায় আমি ছিলাম না বলিতে হয়। আর আমরা জানি, অনেক লোক বিশেষ বিশেষ অবস্থায় সমুদয় অতীত অবস্থা একেবারে বিস্মৃত হইয়া যায়। অনেক উন্মাদরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নিজদিগকে কাচনির্মিত অথবা কোন পশু বলিয়া ভাবিতে দেখা যায়। যদি স্মৃতির উপর সেই ব্যক্তির অস্তিত্ব নির্ভর করে, তাহা হইলে সে অবশ্য কাচ অথবা পশুবিশেষ হইয়া গিয়াছে বলিতে হইবে; কিন্তু বাস্তবিক যখন তাহা হয় নাই, তখন আমরা এই অহং-সারূপ্য স্মৃতিবিষয়ক অকিঞ্চিৎকর যুক্তির উপর স্থাপিত করিতে পারি না। তবে কি দাঁড়াইল? দাঁড়াইল এই যে, সীমাবদ্ধ অথচ সম্পূর্ণ ও নিত্য অহং-এর সারূপ্য আমরা গুণসমূহ হইতে পৃথকভাবে স্থাপন করিতে পারি না। আমরা এমন কোন সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ অস্তিত্ব স্থাপন করিতে পারি না, যাহার পশ্চাতে গুণগুলি লাগিয়া রহিয়াছে।

অপর পক্ষে প্রাচীন বৌদ্ধদের এই মত দৃঢ়তর বলিয়া বোধ হয়

যে, গুণসমূহের পশ্চাতে অবস্থিত কোন বস্তুর সম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না এবং জানিতেও পারি না। তাঁহাদের মতে অনুভূতি ও ভাবরূপ কতকগুলি গুণের সমষ্টিই আত্মা। এই গুণরাশিই আত্মা আর উহারা ক্রমাগত পরিবর্ত্তনশীল। অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই উভয় মতের সামঞ্জস্যসাধন হয়।

অদ্বৈতবাদের সিদ্ধান্ত এই—আমরা বস্তুকে গুণ হইতে পৃথকরূপে চিন্তা করিতে পারি না এ কথা সত্য, আর আমরা পরিণাম ও অপরিণাম এ দুইটিও একসঙ্গে ভাবিতে পারি না। এরূপ চিন্তা করা অসম্ভব। কিন্তু যাহাকেই বস্তু বলা হইতেছে, তাহাই গুণস্বরূপ। দ্রব্য ও গুণ পৃথক নহে। অপরিণামী বস্তুই পরিণামরূপে প্রতিভাত হইতেছে। এই অপরিণামী সত্তা পরিণামী জগৎ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র নহে। পারমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু নহে, কিন্তু সেই পারমার্থিক সত্তাই ব্যবহারিক সত্তা হইয়াছে। অপরিণামী আত্মা আছেন আর আমরা যাহাদিগকে অনুভূতি, ভাব প্রভৃতি আখ্যা দিয়া থাকি শুধু তাহাই নহে, এই শরীর পর্য্যন্তও সেই আত্মস্বরূপ আর বাস্তবিক আমরা এক সময়ে দুই বস্তুর অনুভব করি না, একটিরই করিয়া থাকি। আমাদের শরীর আছে, মন আছে, আত্মা আছে—এইরূপ ভাবা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমাদের একটি যাহা হয় কিছু আছে, একটিরই এক সময়ে অনুভব হইয়া থাকে, দুই প্রকারের পর্য্যন্ত অনুভূতি এক সময়ে হয় না।

যখন আমি আমাকে শরীর বলিয়া চিন্তা করি, তখন আমি শরীরমাত্র; 'আমি ইহার অতিরিক্ত কিছু' বলা বৃথা মাত্র। আর

যখন আমি আমাকে আত্মা বলিয়া চিন্তা করি, তখন দেহ কোথায় উড়িয়া যায়, দেহানুভূতি আর থাকে না। দেহজ্ঞান দূর না হইলে কখন আত্মানুভূতি হয় না। গুণের অনুভূতি চলিয়া না গেলে বস্তুর অনুভব কেহই করিতে পারেন না।

এইটি পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য অদ্বৈতবাদীদের প্রাচীন রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন লোকে দড়িকে সাপ বলিয়া ভুল করে তখন তাহার পক্ষে দড়ি উড়িয়া যায়, আর যখন সে উহাকে যথার্থ দড়ি বলিয়া বোধ করে তখন তাহার সর্পজ্ঞান কোথায় চলিয়া যায়, তখন কেবল দড়িটিই অবশিষ্ট থাকে। কেবলমাত্র বিশ্লেষণপ্রণালী অনুসরণ করাতেই আমাদের এই দ্বিত্ব বা ত্রিত্বের অনুভূতি হইয়া থাকে। বিশ্লেষণের পর পুস্তকে উহা লিখিত হইয়াছে। আমরা ঐসকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া অথবা উহাদের সম্বন্ধে শ্রবণ করিয়া এই ভ্রমে পড়িয়াছি যে, সত্যই বুঝি আমাদের আত্মা ও দেহ উভয়েরই অনুভব হইয়া থাকে; বাস্তবিক কিন্তু তাহা কখন হয় না। হয় দেহ, নয় আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। উহা প্রমাণ করিতে কোন যুক্তির প্রয়োজন হয় না। নিজে মনে মনে ইহা পরীক্ষা করিতে পারি।

তুমি আপনাকে দেহশূন্য আত্মা বলিয়া ভাবিতে চেষ্টা কর দেখি; তুমি দেখিবে ইহা একরূপ অসম্ভব, আর যে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি ইহাতে কৃতকার্য্য হইবেন, তাঁহারা দেখিবেন যখন তাঁহারা নিজদিগকে আত্মস্বরূপ অনুভব করিতেছেন তখন তাঁহাদের দেহজ্ঞান থাকে না। তোমরা হয়ত দেখিয়াছ বা শুনিয়াছ, অনেক ব্যক্তি বশীকরণ ( hypnotism )-প্রভাব অথবা স্নায়ুরোগ বা

অন্য কোন কারণে সময়ে সময়ে একপ্রকার বিশেষরূপ অবস্থা লাভ করেন। তাঁহাদের অভিজ্ঞতা হইতে তোমরা জানিতে পার, যখন তাঁহারা ভিতরের কিছু অনুভব করিতেছিলেন তখন তাঁহাদের বাহ্যজ্ঞান একেবারে উড়িয়া গিয়াছিল, মোটেই ছিল না। ইহা হইতেই বোধ হইতেছে অস্তিত্ব একটি, দুইটি নহে। সেই একই নানারূপে প্রতীয়মান হইতেছেন আর তাহাদের মধ্যে কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ আছে। কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অর্থ পরিণাম, একটি অপরটিতে পরিণত হয়। সময়ে সময়ে যেন কারণের অন্তর্দ্ধান হয়, তৎস্থলে কার্য্য অবশিষ্ট থাকে। যদি আত্মা দেহের কারণ হন, তবে যেন কিছুক্ষণের জন্য তাঁহার অন্তর্দ্ধান হয়, তৎস্থলে দেহ অবশিষ্ট থাকে, আর যখন শরীরের অন্তর্দ্ধান হয় তখন আত্মা অবশিষ্ট থাকেন। এই মতে বৌদ্ধদের মত খণ্ডিত হইবে। বৌদ্ধেরা আত্মা ও শরীর এই দুইটি পৃথক—এই অনুমানের বিরুদ্ধে তর্ক করিতেছিলেন। এক্ষণে অদ্বৈতবাদের দ্বারা এই দ্বৈতভাব অধিকৃত হওয়াতে এবং দ্রব্য ও গুণ একই বস্তুর বিভিন্ন রূপ প্রদর্শিত হওয়াতে তাঁহাদের মত খণ্ডিত হইল।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি যে, অপরিণামিত্ব কেবল সমষ্টিসম্বন্ধেই সত্য হইতে পারে, ব্যষ্টি সম্বন্ধে নহে। পরিণাম—গতি, এই ভাবের সহিত ব্যষ্টির ধারণা জড়িত। যাহা কিছু সসীম তাহাই পরিণামী, কারণ অপর কোন সসীম পদার্থ বা অসীমের সহিত তুলনায় তাহার পরিণাম চিন্তা করা যাইতে পারে, কিন্তু সমষ্টি অপরিণামী, কারণ উহা ব্যতীত আর কিছুই নাই যাহার সহিত তুলনা করিয়া তাহার পরিণাম বা গতি চিন্তা

করা যাইবে। পরিণাম কেবল অপর কোন অল্পপরিণামী বা একেবারে অপরিণামী পদার্থের সহিত তুলনায় চিন্তা করা যাইতে পারে।

অতএব অদ্বৈতবাদ-মতে সর্ব্বব্যাপী, অপরিণামী, অমর আত্মার অস্তিত্ব যথাসম্ভব প্রমাণের বিষয়। ব্যষ্টিসম্বন্ধেরই গোলমাল। তবে আমাদের প্রাচীন দ্বৈতবাদাত্মক মতসকলের কি হইবে, যাহারা আমাদের উপর এখনও ভয়ানক প্রভাব বিস্তার করিতেছে? সসীম, ক্ষুদ্র, ব্যক্তিগত আত্মা সম্বন্ধে কি হইবে?

আমরা দেখিয়াছি, সমষ্টিভাবে আমরা অমর, কিন্তু প্রশ্ন এই—আমরা ক্ষুদ্র ব্যক্তি হিসাবেও অমর হইতে ইচ্ছুক। ইহার কি হইল? আমরা দেখিয়াছি, আমরা অনন্ত আর তাহাই আমাদের যথার্থ ব্যক্তিত্ব। কিন্তু আমরা এই ক্ষুদ্র আত্মাকে ব্যক্তিরূপে প্রতিপন্ন করিয়া তাহাকে অমর করিয়া রাখিতে চাই। সেইসকল ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের কি হয়? আমরা দেখিতেছি, ইহাদের ব্যক্তিত্ব আছে বটে কিন্তু এই ব্যক্তিত্ব বিকাশশীল। এক বটে অথচ পৃথক। কালকার আমি আজকার আমিও বটে, আবার না-ও বটে। ইহাতে দ্বৈতভাবাত্মক ধারণা অর্থাৎ পরিণামের ভিতরে একত্বসূত্র রহিয়াছে—এই মত পরিত্যক্ত হইল, আর খুব আধুনিক ভাব, যথা ক্রমবিকাশবাদ-মত গ্রহণ করা হইল। সিদ্ধান্ত হইল, উহার পরিণাম হইতেছে বটে, কিন্তু ঐ পরিণামের ভিতরে একটি সারূপ্য রহিয়াছে, উহা নিত্য বিকাশশীল।

যদি ইহা সত্য হয় যে মানুষ মাংসল জন্তুবিশেষের (mollusc) পরিণামমাত্র, তবে সেই জন্তু ও মানুষ একই পদার্থ, কেবল মানুষ

সেই জন্তুবিশেষের বহুপরিমাণে বিকাশমাত্র। উহা ক্রমশঃ বিকাশপ্রাপ্ত হইতে হইতে অনন্তের দিকে চলিয়াছে, এক্ষণে মানুষরূপ ধারণ করিয়াছে। অতএব সীমাবদ্ধ জীবাত্মাকেও ব্যক্তি বলা যাইতে পাবে; তিনি ক্রমশঃ পূর্ণ ব্যক্তিত্বের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। পূর্ণ ব্যক্তিত্ব তখনই লাভ হইবে যখন তিনি অনন্তে পঁহুছিলেন, কিন্তু সেই অবস্থালাভের পূর্ব্বে তাঁহার ব্যক্তিত্বের ক্রমাগত পরিণাম, ক্রমাগত বিকাশ হইতেছে।

অদ্বৈতবেদান্তের এক বিশেষপ্রকার গতি ছিল। অনেক সময় ইহাতে উহার অনেক উপকার হইয়াছিল, আবার ইহাতে কখন কখন উহার গভীর তত্ত্বের অনেক ক্ষতিও হইয়াছে। সেই গতি এই—পূর্ব্ব পূর্ব্ব মতের সহিত উহার সামঞ্জস্যসাধন করা। বর্ত্তমান কালে ক্রমবিকাশবাদীদের যে মত, তাহাদের সেই মত ছিল অর্থাৎ তাঁহারা বুঝিতেন সমুদয়ই ক্রমবিকাশের ফল, আর এই মতের সহায়তায় তাঁহারা সহজেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রণালীর সহিত এই মতের সামঞ্জস্যবিধানে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী কোন মতই পরিত্যক্ত হয় নাই। বৌদ্ধমতের এই একটি বিশেষ দোষ ছিল যে, তাঁহারা এই ক্রমবিকাশবাদ বুঝিতেন না, সুতরাং তাঁহারা আদর্শে আরোহণ করিবার পূর্ব্ববর্ত্তী সোপানগুলির সহিত তাঁহাদের মতের সামঞ্জস্য করিবার কোন চেষ্টা পান নাই। বরং সেগুলিকে নিরর্থক ও অনিষ্টকর বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মে এরূপ গতি বড় অনিষ্টকর হইয়া থাকে। কোন ব্যক্তি এক নূতন ও শ্রেষ্ঠতর ভাব পাইল। তখন সে তাহার

পুরাতন ভাবগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সিদ্ধান্ত করে, সেগুলি অনিষ্টকর ও অনাবশ্যক ছিল। সে কখন ইহা ভাবে না যে, তাহার বর্ত্তমান দৃষ্টি হইতে সেগুলিকে এখন যতই বিসদৃশ বোধ হউক না কেন, তাহারা তাহার পক্ষে এক সময়ে অত্যাবশ্যক ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থায় পঁহুছিতে তাহাদের বিশেষ উপযোগিতা ছিল, আর আমাদের প্রত্যেককেই সেইরূপ উপায়ে আত্মবিকাশ করিতে হইবে, সেইসকল ভাব গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাদের মধ্যে ভালটুকু লইতে এবং তৎপরে উচ্চতর অবস্থায় আরোহণ করিতে হইবে। এইজন্য অদ্বৈতবাদ প্রাচীনতম মতসমূহের উপর, দ্বৈতবাদের উপর এবং আর আর যে-সব মত তাহারও পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল, সকলেরই প্রতি মিত্রভাবাপন্ন। এরূপ নয় যে, তিনি উচ্চমঞ্চের উপর দাঁড়াইয়া সেগুলিকে যেন দয়ার চক্ষে দেখিতেছেন; তাঁহার ধারণা সেগুলিও সত্য, একই সত্যের বিভিন্ন বিকাশ, আর অদ্বৈতবাদ যে সিদ্ধান্তে পঁহুছিয়াছেন তাঁহারাও সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন।

অতএব মানুষকে যেসকল সোপানশ্রেণীর উপর দিয়া উঠিতে হয়, সেগুলির প্রতি পরুষভাষা প্রয়োগ না করিয়া বরং তাহাদের প্রতি আশীর্ব্বচন প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। এইজন্যই বেদান্তে এইসকল ভাব যথাযথ রক্ষিত হইয়াছে, পরিত্যক্ত হয় নাই। আর এইজন্যই দ্বৈতবাদসঙ্গত পূর্ণজীবাত্মবাদও বেদান্তে স্থান পাইয়াছে।

এই মতানুসারে মানুষের মৃত্যু হইলে সে অন্যান্য লোকে গমন করে—এইসকল ভাবও সম্পূর্ণ রক্ষিত হইয়াছে, কারণ অদ্বৈত-

বাদ স্বীকার করিয়া এই মতগুলিকেও তাহাদের যথাস্থানে রক্ষা করা যাইতে পারে, কেবল এইটুকু মানিতে হইবে যে উহারা প্রকৃত সত্যের আংশিক বর্ণনামাত্র।

যদি তুমি খণ্ড দৃষ্টিতে জগৎকে দেখ, তবে জগৎ তোমাব নিকট এইরূপই প্রতীয়মান হইবে। দ্বৈতবাদীর দৃষ্টি হইতে এই জগৎ কেবল ভূত বা শক্তির সৃষ্টিরূপেই দৃষ্ট হইতে পাবে, উহাকে কোন বিশেষ ইচ্ছাশক্তির ক্রীডারূপেই চিন্তা করা যাইতে পাবে, আর সেই ইচ্ছাশক্তিকেও জগৎ হইতে পৃথকরূপেই ভাবনা সম্ভব। এই দৃষ্টি হইতে মানুষ আপনাকে আত্মা ও দেহ উভযেব সমষ্টি এইরূপেই চিন্তা করিতে পারে, আর এই আত্মা সসীম হইলেও পূর্ণ। এরূপ ব্যক্তির অমরত্ব ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহাও সেই আত্মাতেই প্রযুক্ত হইবে। এইজন্যই এই মতগুলিও বেদান্তে রক্ষিত হইয়াছে আর এইজন্যই দ্বৈতবাদীদের খুব প্রচলিত সাধারণ মতগুলিও তোমাদের নিকট আমার বলা আবশ্যক।

এই মতানুসারে প্রথমতঃ অবশ্য আমাদের স্থূল শরীর হইয়াছে। এই স্থূলশরীরের পশ্চাতে সূক্ষ্মশরীর। এই সূক্ষ্মশরীরও ভৌতিক, তবে উহা খুব সূক্ষ্মভূতে নির্ম্মিত। উহা আমাদের সমুদয় কর্ম্মের আশয়স্বরূপ। সমুদয় কর্ম্মের সংস্কার এই সূক্ষ্মশরীরে বর্ত্তমান— তাহারা সর্ব্বদাই ফলপ্রদানোন্মুখ হইয়া আছে। আমরা যাহা কিছু চিন্তা করি, আমরা যেকোন কার্য্য করি, তাহাই কিছুকাল পরে সূক্ষ্মস্বরূপ ধারণ করে, যেন বীজভাব প্রাপ্ত হয়, আর তাহাই এই শরীরে অব্যক্তভাবে অবস্থান করে, কিছুকাল পরে আবার

প্রকাশ হইয়া ফলপ্রদান করে। মানুষের সারা জীবনটাই এইরূপ। সে আপন অদৃষ্ট নিজেই গঠন করে। মানুষ আর কোন নিয়ম দ্বারা বদ্ধ নহে, সে আপনার নিয়মে, আপনার জালে আপনি বদ্ধ। আমরা যেসকল কর্ম্ম করি, আমরা যেসকল চিন্তা করি, তাহারা আমাদের বন্ধনজালের সূত্রমাত্র। একবার কোন শক্তিকে চালনা করিয়া দিলে তাহার পূর্ণ ফল আমাদিগকে ভোগ করিতে হয়। ইহাই কর্ম্মবিধান। এই সূক্ষ্ম শরীরের পশ্চাতে সসীম জীবাত্মা রহিয়াছেন। এই জীবাত্মার কোন আকৃতি আছে কি-না, ইহা অণু, বৃহৎ বা মধ্যম আকারের—এই লইয়া অনেক তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছে। কোন কোন সম্প্রদায়ের মতে ইহা অণু, অপরের মতে ইহা মধ্যম এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতে উহা বিভু। এই জীব সেই অনন্ত সত্তার এক অংশমাত্র, আর উহা অনন্তকাল ধরিয়া রহিয়াছে। উহা অনাদি, উহা সেই সর্ব্বব্যাপী সত্তার এক অংশরূপে অবস্থান করিতেছে। উহা অনন্ত। আর উহা আপন প্রকৃত স্বরূপ, শুদ্ধভাব প্রকাশ করিবার জন্য নানা দেহের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতেছে। জীব যে অবস্থা হইতে আসিয়াছে, যে কার্য্যের দ্বারা সে সেই অবস্থা হইতে পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবৃত্ত হয় তাহাকে অসৎ কার্য্য বলে; চিন্তাসম্বন্ধেও তদ্রূপ। আর যে কার্য্যের দ্বারা, যে চিন্তার দ্বারা তাহার স্বরূপপ্রকাশের বিশেষ সাহায্য হয়, তাহাকে সৎকার্য্য বা সচ্চিন্তা বলে। কিন্তু ভারতের অতি নিম্নতম দ্বৈতবাদী এবং অতি উন্নত অদ্বৈতবাদী—সকলেরই এই সাধারণ মত যে, আত্মার সমুদয় শক্তি ও ক্ষমতা তাহার ভিতরেই রহিয়াছে, উহারা অন্য কোথাও হইতে আসে না।

উহারা আত্মাতে অব্যক্তভাবে থাকে, আর সমুদয় জীবনের কার্য্য কেবল উহার ঐ অব্যক্ত শক্তিসমূহের বিকাশ।

তাঁহারা পুনর্জন্মবাদও মানিয়া থাকেন—এই দেহের ধ্বংস হইলে জীব আর এক দেহ লাভ করিবেন, আবার সেই দেহনাশের পর আর এক দেহ, এইরূপ চলিবে। তিনি এই পৃথিবীতেও জন্মাইতে পারেন, বা অন্য লোকেও জন্মাইতে পারেন। তবে এই পৃথিবীই শ্রেষ্ঠতর বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তাঁহাদের মত এই—আমাদের সমুদয় প্রয়োজনের জন্য এই পৃথিবীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। অন্যান্য লোকে দুঃখকষ্ট খুব কম আছে বটে, কিন্তু তাঁহারা বলেন সেই কারণেই সেইসকল লোকে উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবারও সুযোগ নাই। এই জগতে বেশ সামঞ্জস্য আছে, খুব দুঃখও আছে, আবার কিছু সুখও আছে, সুতরাং জীবের এখানে কখন না কখন মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবার সম্ভাবনা, কখন না কখন তাহার মুক্তিলাভের ইচ্ছার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু যেমন এই লোকে খুব বড়মানুষদের উচ্চতর বিষয় চিন্তা করিবার খুব অল্পই সুযোগ আছে, সেইরূপ এই জীব যদি স্বর্গে গমন করে তাহারও আত্মোন্নতির কোন সম্ভাবনা থাকিবে না, এখানে যে সুখ ছিল তদপেক্ষা সুখ অনেক পরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে—তাহার যে সূক্ষ্মদেহ থাকিবে, তাহাতে কোন ব্যাধি থাকিবে না, তাহার আহার পান করিবারও কিছুমাত্র আবশ্যকতা থাকিবে না, আর তাহার সকল বাসনাই পরিপূর্ণ হইবে। জীব সেখানে সুখের পর সুখ সম্ভোগ করে এবং আপনার স্বরূপ ও উচ্চভাব সমুদয় ভুলিয়া যায়। তথাপি এইসকল উচ্চতর লোকে কতক

ব্যক্তি আছেন যাঁহারা এই সকল ভোগসত্ত্বেও তথা হইতে আরও উচ্চতর ভাবে আরোহণ করেন। একপ্রকার স্থূলদর্শী দ্বৈতবাদীরা উচ্চতম স্বর্গকেই চরম লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া থাকেন —তাঁহাদের মতে জীবাত্মাগণ তথায় গমন করিয়া চিরকাল ভগবানের সহিত বাস করিবেন। তাঁহারা সেখানে দিব্যদেহ লাভ করিবেন—তাঁহাদের আর রোগ শোক মৃত্যু বা অন্য কোনরূপ অশুভ থাকিবে না। তাঁহাদের সকল বাসনা পরিপূর্ণ হইবে এবং তাঁহারা চিরকাল তথায় ভগবানের সহিত বাস করিবেন। সময়ে সময়ে তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পৃথিবীতে আসিয়া দেহধারণ করিয়া লোকশিক্ষা দিবেন, আর জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাচার্য্যগণ সকলেই এই স্বর্গ হইতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা পূর্ব্বেই মুক্ত হইয়াছেন। তাঁহারা ভগবানের সহিত এক লোকে বাস করিতেছিলেন, কিন্তু দুঃখার্ত্ত মানবজাতির প্রতি তাঁহাদের এতদূর কৃপা হইল যে, তাঁহারা এখানে আসিয়া পুনরায় দেহধারণ করিয়া মানুষকে স্বর্গের পথসম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তাঁহারা অন্যান্য উচ্চতর লোকসমূহেও গমন করিয়া থাকেন।

অবশ্য অদ্বৈতবাদী বলেন, এই স্বর্গ কখন আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিদেহমুক্তিই আমাদের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। যেটি আমাদের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ তাহা কখন সসীম হইতে পারে না। অনন্ত ব্যতীত আর কিছুই আমাদের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না, কিন্তু দেহ ত কখন অনন্ত হয় না। ইহা হওয়াই অসম্ভব, কারণ সসীমতা

হইতেই শরীরের উৎপত্তি। চিন্তা অনন্ত হইতে পারে না; কারণ সসীম ভাব হইতেই চিন্তা আসিয়া থাকে। অদ্বৈতবাদী বলেন, আমাদিগকে দেহ এবং চিন্তারও বাহিরে যাইতে হইবে। আর আমরা অদ্বৈতবাদের সেই বিশেষ মতও পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এই মুক্তি লাভ করিবার নয়, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। আমরা কেবল উহা ভুলিয়া যাই ও উহাকে অস্বীকার করিয়া থাকি। এই পূর্ণতা লাভ করিতে হইবে না, উহা বর্ত্তমানই রহিয়াছে। এই অমরত্ব ও অপরিণামিতা লাভ করিতে হইবে না, উহারা পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান—উহারা বরাবর আমাদের রহিয়াছে।

যদি তুমি সাহস করিয়া বলিতে পার 'আমি মুক্ত,' এই মুহূর্ত্তে তুমি মুক্ত হইবে। যদি তুমি বল 'আমি বদ্ধ,' তবে তুমি বদ্ধ থাকিবে। যাহা হউক, দ্বৈতবাদী ও অন্যান্যবাদীদের বিভিন্ন মত কথিত হইল। তোমরা ইহার মধ্যে যাহা ইচ্ছা তাহাই গ্রহণ করিতে পার।

বেদান্তের এই কথাটি বুঝা বড় কঠিন, আর লোকে সর্ব্বদা ইহা লইয়া বিবাদ করিয়া থাকে। প্রধান মুশকিল হয় এইটুকু যে, ইহার মধ্যে যে একটি মত অবলম্বন করে, সে অপর মত একেবারে অস্বীকার করিয়া তন্মতাবলম্বীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়। তোমার পক্ষে যাহা উপযুক্ত তাহা গ্রহণ কর; অপরের উপযোগী মত তাহাকে গ্রহণ করিতে দাও। যদি তুমি এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, এই সসীম মানবত্ব রাখিতে এতই ইচ্ছুক হও তবে তুমি তাহা অনায়াসে রাখিতে পার, তোমার সকল বাসনাই রাখিতে পার এবং তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকিতে পার। যদি মানুষভাবে

থাকিবার সুখ তোমার নিকট এতই সুন্দর ও মধুর লাগে, তবে তুমি যতদিন ইচ্ছা উহা রাখিয়া দাও, কারণ তুমি জান তুমিই তোমার অদৃষ্টের নির্ম্মাতা, কেহই তোমাকে বাধ্য করিয়া কিছু করাইতে পারে না। তোমার যতদিন ইচ্ছা ততদিন মানুষ থাকিতে পার। কেহই তোমায় বাধ্য করিতে পারে না। যদি দেবতা হইতে ইচ্ছা কর দেবতাই হইবে—এই কথা। কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন যাঁহারা দেবতা পর্য্যন্ত হইতে অনিচ্ছুক। তোমার তাঁহাদিগকে বলিবার কি অধিকার আছে যে এ ভয়ানক কথা? তোমার এক শত টাকা নষ্ট হইবার ভয় হইতে পারে, কিন্তু এমন অনেক লোক থাকিতে পারেন যাঁহাদের জগতে যত অর্থ আছে সব নষ্ট হইলেও কিছু কষ্ট হইবে না। এইরূপ লোক পূর্ব্বকালে অনেক ছিলেন এবং এখনও আছেন। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার আদর্শানুসারে বিচার করিতে কেন যাও? তুমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ জাগতিক ভাবে বদ্ধ হইয়া আছ। ইহাই তোমার সর্ব্বোচ্চ আদর্শ হইতে পারে। তুমি এই আদর্শ লইয়া থাক না কেন? তুমি যেমনটি চাও তেমনটি পাইবে, কিন্তু তোমা ছাড়া এমন অনেক লোক আছেন যাঁহারা সত্যকে দর্শন করিয়াছেন—তাঁহারা ঐ স্বর্গাদিভোগে তৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা আর উহাতে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চান না, তাঁহারা সকল সীমার বাহিরে যাইতে চাহেন, জগতের কিছুই তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিতে পারে না। জগৎ ও উহার সমুদয় ভোগ তাঁহাদের পক্ষে গোষ্পদ-তুল্য। তুমি তাঁহাদিগকে তোমার ভাবে বদ্ধ করিয়া রাখিতে চাও কেন?

এই ভাবটি একেবারে ছাড়িতে হইবে, প্রত্যেককে আপনার ভাবে চলিতে দাও।

অনেকদিন পূর্ব্বে আমি 'সচিত্র লণ্ডন সমাচার' ( Illustrated London News ) নামক সংবাদপত্রে একটি সংবাদ পাঠ করি। কতকগুলি জাহাজ* প্রশান্ত মহাসাগরস্থ দ্বীপপুঞ্জের নিকট ঝটিকাক্রান্ত হয়। ঐ পত্রিকায় ঐ ঘটনার একখানি চিত্রও ছিল। একখানি ব্রিটিশ জাহাজ ছাড়া সকলগুলিই ভগ্ন হইয়া ডুবিয়া যায়। সেই ব্রিটিশ জাহাজখানি ঝড় কাটাইয়া চলিয়া আসে। আর ছবিখানিতে ইহা দেখাইতেছে, যে জাহাজগুলি ডুবিয়া যাইতেছে, তাহাদের মজ্জমান আরোহিদল ডেকের উপর দাঁড়াইয়া যে জাহাজখানি ঝড় কাটাইতেছে, তাহার লোকগুলিকে উৎসাহ দিতেছেন। অপর লোককে টানিয়া নিজের ভূমিতে লইয়া যাইও না। আবার লোকে নির্ব্বোধের ন্যায় আর এক মতবাদ পোষণ করিয়া থাকে যে, যদি আমরা আমাদের এই ক্ষুদ্র আমিত্ব হারাইয়া ফেলি, তবে জগতে কোনরূপ নীতিপরায়ণতা থাকিবে না, মনুষ্যজাতির কোন আশাভরসা থাকিবে না। যেন যাঁহারা উহা বলেন তাঁহারা সমগ্র মনুষ্যজাতির জন্য সর্ব্বদা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়া আছেন! যদি সকল দেশে অন্ততঃ দুই শত নরনারী বাস্তবিক দেশের শুভাকাঙ্ক্ষী হন, তবে দুই দিনে সত্যযুগ উপস্থিত হইতে পারে। আমরা জানি, আমরা মনুষ্যজাতির উপকারের জন্য কেন মরিতে প্রস্তুত!

---

* প্রশান্ত মহাসাগরস্থ সামেরা দ্বীপপুঞ্জের নিকট ব্রিটিশ জাহাজ 'ক্যালিয়োপী' ও আমেরিকার কতকগুলি যুদ্ধজাহাজ।

এসকল লম্বা লম্বা কথামাত্র—এসকল কথা বলিবার কোন স্বার্থপূর্ণ অভিসন্ধি আছে। জগতের ইতিহাসে ইহা প্রকাশ যে, যাঁহারা এই ক্ষুদ্র 'আমি'কে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই মনুষ্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হিতকারী, আর যতই লোকে আপনাকে ভুলিবে, ততই পরোপকারে অধিক সমর্থ হইবে। উহার মধ্যে একটি স্বার্থপরতা, অপরটি নিঃস্বার্থপরতা। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভোগসুখে আসক্ত হইয়া থাকা এবং এইগুলিই চিরকাল থাকিবে মনে করাই ঘোর স্বার্থপরতা, উহা সত্যানুরাগ হইতে উৎপন্ন নহে, অপরের প্রতি দয়াও এই ভাবের উৎপত্তির কারণ নহে—উহার উৎপত্তির কারণ ঘোর স্বার্থপরতা। অপর কাহারও দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া নিজেই সমস্ত ভোগ করিব, এই ভাব হইতে উহার উৎপত্তি। আমার ত এইরূপই বোধ হয়। আমি জগতে প্রাচীন মহাপুরুষ ও সাধুগণের তুল্য চরিত্রবলশালী পুরুষ আরও দেখিতে চাই—তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র পশুর উপকারের জন্য শত শত জীবন ত্যাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। নীতি ও পবোপকারের কথা কি বলিতেছ? ইহা ত আধুনিক কালের বাজে কথামাত্র।

আমি সেই গৌতমবুদ্ধের ন্যায় চরিত্রবলশালী লোক দেখিতে চাই, যিনি সগুণ ঈশ্বর বা ব্যক্তিগত আত্মায় বিশ্বাসী ছিলেন না, যিনি ঐসম্বন্ধে কখন প্রশ্নই করেন নাই, ঐসম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন, কিন্তু যিনি সকলের জন্য নিজের প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলেন—সারা জীবন সকলের উপকার করিতে নিযুক্ত ছিলেন, সারা জীবন অপরের হিত কিসে হয়, ইহাই

যাঁহার চিন্তা ছিল। তাঁহার জীবনচরিত-লেখক বেশ বলিয়াছেন যে, তিনি 'বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়' জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজের মুক্তির জন্য পর্য্যন্ত চেষ্টা করিতে বনে গমন করেন নাই। জগৎ জ্বলিয়া গেল—কেহ উহা হইতে বাঁচিবার পথ না করিলে চলিবে কেন? তাঁহার সারাজীবন এই এক চিন্তা ছিল—জগতে এত দুঃখ কেন? তোমরা কি মনে কর, আমরা তাঁহার মত নীতিপরায়ণ?

* * *

যীশুখ্রীষ্ট যে ধর্ম্ম প্রচার করিযাছিলেন, সেই খাঁটি খ্রীষ্টধর্ম্মে ও বেদান্তধর্ম্মে অতি অল্পই প্রভেদ ছিল। তিনি অদ্বৈতবাদও প্রচার করিয়াছেন, আবার সাধারণকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য তাহাদিগকে উচ্চতম আদর্শ ধারণা করাইবার সোপানরূপে দ্বৈতবাদের কথাও বলিয়াছেন। যিনি 'আমাদের স্বর্গস্থ পিতা' বলিয়া প্রার্থনা করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি আবার ইহাও বলিয়াছেন, 'আমি ও আমার পিতা এক,' আর তিনি ইহাও জানিতেন, এই স্বর্গস্থ পিতারূপে দ্বৈতভাবে উপাসনা করিতে করিতেই অভেদবুদ্ধি আসিয়া থাকে। তখন খ্রীষ্টধর্ম্ম কেবল প্রেম ও আশীর্ব্বাদপূর্ণ ছিল, কিন্তু অবশেষে নানাবিধ মত উহাতে প্রবিষ্ট হওয়ায় উহা বিকৃত ভাব ধারণ করিল। এই যে ক্ষুদ্র 'আমি'র জন্য মারামারি, 'আমি'র প্রতি অতিশয় ভালবাসা, শুধু এ জীবনে নহে মৃত্যুর পরও এই ক্ষুদ্র 'আমি,' এই ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব লইয়া থাকিবার ইচ্ছা, ইহা ঐ ধর্ম্মের বিকৃতভাব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা

বলেন, ইহা নিঃস্বার্থপরতা—ইহা নীতির ভিত্তিস্বরূপ। ইহা যদি নীতির ভিত্তি হয়, তবে আর দুর্নীতির ভিত্তি কি? স্বার্থপরতা নীতির ভিত্তি, আর যে-সকল নরনারীর নিকট আমরা অধিক জ্ঞানের প্রত্যাশা করি, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র 'আমি'র নাশ হইলে একেবারে সব নীতিভ্রষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া আকুল। সর্ব্বপ্রকার শুভের, সর্ব্বপ্রকার নৈতিক মঙ্গলের মূলমন্ত্র 'আমি' নয়, 'তুমি'। কে ভাবিতে যায় স্বর্গ নরক আছে কি-না। কে ভাবিতে যায় আমার আত্মা আছে কি-না। কে ভাবিতে যায় কোন অপরিণামী সত্তা আছে কি-না। এই সংসার পড়িয়া রহিয়াছে, ইহা মহাদুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের ন্যায় এই সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দাও। হয় উহা দূর কর, নয় ঐ চেষ্টায় প্রাণবিসর্জ্জন কর। আপনাকে ভুলিয়া যাও; আস্তিকই হও, নাস্তিকই হও, অজ্ঞেয়বাদী হও বা বৈদান্তিক হও, খ্রীষ্টিয়ান হও বা মুসলমান হও—ইহাই প্রথম শিক্ষার বিষয়। এই শিক্ষা, এই উপদেশ সকলেই বুঝিতে পারে, নাহং নাহং তুঁহু তুঁহু—অহংনাশ ও প্রকৃত 'আমি'র বিকাশ।

দুইটি শক্তি সর্ব্বদা সমভাবে কার্য্য করিতেছে। একটি 'অহং' অপরটি 'নাহং'। এই নিঃস্বার্থপরতাশক্তি শুধু মানুষের ভিতর নয়, তির্য্যগ্‌জাতির ভিতরও এই শক্তির বিকাশ দেখা যায়—এমন কি, ক্ষুদ্রতম কীটাণুগণের ভিতর পর্য্যন্ত এই শক্তির প্রকাশ। নরশোণিতপানে লোলজিহ্বা ব্যাঘ্রী তাহার শাবককে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত। অতি দুর্ব্বৃত্ত ব্যক্তি, যে অনায়াসে তাহার ভ্রাতার গলা কাটিতে পারে, সেও তাহার অনাহারে মুমূর্ষু স্ত্রী অথবা পুত্র-কন্যার জন্য সব করিতে প্রস্তুত। অথবা দেখা যায় সৃষ্টির

ভিতরে এই দুই শক্তি পাশাপাশি কার্য্য করিতেছে—যেখানে একটি শক্তি দেখিবে, সেখানে অপর শক্তিটিরও অস্তিত্ব দেখিবে। একটি স্বার্থপরতা, অপরটি নিঃস্বার্থপরতা। একটি গ্রহণ, অপরটি ত্যাগ। ক্ষুদ্রতম প্রাণী হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্য্যন্ত সমুদয় ব্রহ্মাণ্ডই এই দুই শক্তির লীলাক্ষেত্র। ইহা কোন প্রমাণসাপেক্ষ নহে—ইহা স্বতঃপ্রমাণ।

সমাজের এক সম্প্রদায়ের লোকের বলিবার কি অধিকার আছে যে, জগতের সমুদয় কার্য্য ও বিকাশ ঐ দুই শক্তির মধ্যে অন্যতম 'অহং'—শক্তিপ্রসূত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও সংঘর্ষণ হইতে উত্থিত হয়? জগতের সমুদয় কার্য্য রাগ, দ্বেষ, বিবাদ ও প্রতিযোগিতার উপর স্থাপিত—এ কথা বলিবার তাঁহাদের কি অধিকার আছে? এইসকল প্রবৃত্তি যে জগতের অনেকাংশ পরিচালিত করিতেছে, ইহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু তাঁহাদের অপর শক্তিটির অস্তিত্ব একেবারে অস্বীকার করিবার কি অধিকার আছে? আর তাঁহারা কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, এই প্রেম, এই অহংশূন্যতা, এই ত্যাগই জগতের একমাত্র ভাবরূপিণী শক্তি? অপর শক্তিটি ঐ 'নাহং' বা প্রেমশক্তিরই বিপরীতভাবে নিয়োগ এবং উহা হইতেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার উৎপত্তি। অশুভের উৎপত্তিও নিঃস্বার্থপরতা হইতে—অশুভের পরিণামও শুভ বই আর কিছুই নয়। উহা কেবল মঙ্গলবিধায়িনী শক্তির অপব্যবহার মাত্র। এক ব্যক্তি যে অপর ব্যক্তিকে হত্যা করে, তাহাও অনেক সময় তাহার নিজের পুত্রাদির প্রতি স্নেহের প্রেরণায়—তাহাদিগকে ভরণ-পোষণ করিবে বলিয়া। তাহার প্রেম অন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি হইতে

গুটাইয়া তাহার সন্তানের উপর পড়িয়া সসীম ভাব ধারণ করিয়াছে। কিন্তু সীমাবদ্ধই হউক, অসীমই হউক, উহা সেই ভগবান বই আর কিছুই নহে।

অতএব সমগ্র জগতের পরিচালক, জগতের মধ্যে একমাত্র প্রকৃত ও জীবন্ত শক্তি সেই অদ্ভুত জিনিস—উহা যে-কোন আকারে ব্যক্ত হউক না কেন, উহা সেই প্রেম, নিঃস্বার্থপরতা, ত্যাগ বই আর কিছুই নয়। বেদান্ত এই স্থানেই দ্বৈতবাদ ত্যাগ করিয়া অদ্বৈতের উপর ঝোঁক দেন। আমরা এই অদ্বৈতব্যাখ্যার উপর বিশেষ জোর দিই এইজন্য যে, আমরা জানি আমাদের জ্ঞান-বিজ্ঞানের অভিমান সত্ত্বেও আমাদের মানিতেই হইবে যে, যেখানে একটি কারণ দ্বারা কতকগুলি কার্য্যের ব্যাখ্যা করা যায়, আবার অনেকগুলি কারণ দ্বারাও যদি সেই কার্য্যগুলির ব্যাখ্যা করা যায়, তবে অনেকগুলি কারণ স্বীকার না করিয়া একটি কারণ স্বীকার করাই অধিক যুক্তিসঙ্গত। এখানে যদি আমরা কেবল স্বীকার করি যে, সেই একই অপূর্ব্ব সুন্দর প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়াই অসংরূপে প্রতীয়মান হয়, তবে এক প্রেমশক্তি দ্বারা সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করিলাম। নচেৎ আমাদিগকে জগতের দুইটি কারণ মানিতে হইবে—একটি শুভশক্তি, অপরটি অশুভশক্তি—একটি প্রেমশক্তি, অপরটি দ্বেষশক্তি। এই দুই সিদ্ধান্তের মধ্যে কোন্‌টি অধিক ন্যায়সঙ্গত? অবশ্য শক্তির এই একত্ব মানিয়া সমুদয় জগতের ব্যাখ্যা করা।

আমি এক্ষণে এমন সকল বিষয়ে গিয়া পড়িতেছি, যাহা সম্ভবতঃ দ্বৈতবাদীদের মতসঙ্গত নহে। আমার বোধ হয়, আমি

দ্বৈতবাদের আলোচনা লইয়া বেশীক্ষণ কাটাইতে পারি না। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য যে, নীতি ও নিঃস্বার্থপরতার উচ্চতম আদর্শ উচ্চতম দার্শনিক ধারণার সহিত অসঙ্গত নহে। আমার ইহাই দেখান উদ্দেশ্য, নীতিপরায়ণ হইতে গেলে তোমার দার্শনিক ধারণাকে খাট করিতে হয় না; বরং নীতির ভিত্তিভূমি প্রাপ্ত হইতে গেলে তোমাকে উচ্চতম দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক-ধারণাসম্পন্ন হইতে হয়। মনুষ্যের জ্ঞান মনুষ্যের শুভের বিরোধী নয়। বরং জীবনের প্রত্যেক বিভাগেই জ্ঞান আমাদিগকে রক্ষা করিয়া থাকে। জ্ঞানই উপাসনা। আমরা যতই জানিতে পারি, ততই আমাদের মঙ্গল। বেদান্তী বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান অশুভের কারণ—অসীমের সীমাবদ্ধ ভাব। যে প্রেম সীমাবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্রভাবাপন্ন হইয়া যায় ও অশুভ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই আবার চরমাবস্থায় ব্রহ্ম প্রকাশ করে। আর বেদান্ত ইহাও বলেন, এই আপাতপ্রতীয়মান সমুদয় অশুভের কারণ আমাদের ভিতরেই রহিয়াছে। কোন অপ্রাকৃতিক পুরুষের নিন্দা করিও না, অথবা নিরাশ বা বিষণ্ন হইয়া পড়িও না, অথবা ইহাও মনে করিও না আমরা গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া আছি—যতক্ষণ না অপর কেহ আসিয়া আমাদিগকে সাহায্য করেন, ততক্ষণ তাহা হইতে উঠিতে পারিব না। বেদান্ত বলেন, অপরের সাহায্যে আমাদের কিছু হইতে পারে না। আমরা গুটিপোকার মত। আমরা আপনার শরীর হইতে আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া তাহাতে আবদ্ধ হইয়াছি। কিন্তু এ বদ্ধভাব চিরকালের জন্য নয়। আমরা উহা হইতে প্রজাপতিরূপে বাহির হইয়া মুক্ত হইব। আমরা আমাদের

চতুর্দ্দিকে এই কর্ম্মজাল জড়াইয়াছি, আমরা অজ্ঞানবশতঃ মনে করিতেছি আমরা যেন বদ্ধ; আর কখন কখন সাহায্যের জন্য চীৎকার ও ক্রন্দন করিতেছি। কিন্তু বাহির হইতে কোন সাহায্য পাওয়া যায় না, সাহায্য পাওয়া যায় ভিতর হইতে। জগতের সকল দেবতার নিকট উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে পার। আমি অনেক বৎসর ধরিয়া এইরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলাম; অবশেষে আমি দেখিলাম আমি সাহায্য পাইয়াছি। কিন্তু এই সাহায্য ভিতর হইতে আসিল, আর ভ্রান্তিবশতঃ এতদিন নানারূপ কর্ম্ম করিতেছিলাম, সেই ভ্রান্তিকে নিরাস করিতে হইল। ইহাই একমাত্র উপায়। আমি নিজে যে জালে আপনাকে জড়াইয়াছিলাম তাহা আমাকেই ছিন্ন করিতে হইবে, আর তাহা ছিন্ন করিবার শক্তিও আমার ভিতরে রহিয়াছে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি যে, আমার জীবনের সদসৎ কোন প্রবৃত্তিই বৃথা যায় নাই—আমি সেই অতীত শুভাশুভ উভয় কর্ম্মেরই সমষ্টিস্বরূপ। আমি জীবনে অনেক ভুলচুক করিয়াছি, কিন্তু এইগুলি না করিলে আমি আজ যাহা তাহা কখনই হইতাম না। আমি এক্ষণে আমার জীবন লইয়া বেশ তুষ্ট আছি। আমার এ কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, তোমরা বাড়ীতে যাও, গিয়া তথায় নানাপ্রকার অন্যায় কর্ম্ম করিতে থাক, আমার কথা এইরূপে ভুল বুঝিও না। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, কতকগুলি ভুলচুক হইয়া গিয়াছে বলিয়া একেবারে বসিয়া পড়িও না, কিন্তু জানিও পরিণামে তাহাদের ফল শুভই হইবে। অন্যরূপ হইতে পারে না, কারণ শিবত্ব ও বিশুদ্ধত্ব আমাদের প্রকৃতিসিদ্ধ ধর্ম্ম, আর কোন

উপায়েই সেই প্রকৃতির ব্যত্যয় হয় না। আমাদের যথার্থ স্বরূপ সর্ব্বদাই একরূপ।

আমাদের ইহা বুঝা আবশ্যক যে, আমরা দুর্ব্বল বলিয়াই নানাবিধ ভ্রমে পড়িয়া থাকি, আর অজ্ঞান বলিয়াই আমরা দুর্ব্বল। আমি পাপ শব্দ ব্যবহার না করিয়া ভ্রম শব্দ ব্যবহার করা অধিক পছন্দ করি। আমাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছে কে? আমরা আপনারাই আপনাদিগকে অজ্ঞানে ফেলিয়াছি। আমরা আপনাদের চক্ষে আপনি হাত দিয়া অন্ধকার বলিয়া চীৎকার করিতেছি। হাত সরাইয়া লও, তাহা হইলে দেখিবে সেই জীবাত্মার স্বপ্রকাশ স্বরূপের আলোক রহিয়াছে। আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ কি বলিতেছেন, তাহা কি দেখিতেছ না? এই সকল ক্রমবিকাশের হেতু কি? বাসনা। কোন পশু যেভাবে অবস্থিত সে তদতিরিক্ত অন্য কিছুরূপে থাকিতে চায়—সে দেখে, সে যে-সকল অবস্থার মধ্যে অবস্থিত সেগুলি তাহার উপযোগী নহে, সুতরাং সে একটি নূতন শরীর গঠন করিয়া লয়। তুমি সর্ব্বনিম্নতম জীবাণু হইতে নিজ ইচ্ছাশক্তিমূলে উৎপন্ন হইয়াছ—আবার সেই ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ কর, আরও উৎপন্ন হইতে পারিবে। ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমান। তুমি বলিতে পার, যদি ইচ্ছা সর্ব্বশক্তিমতী হয়, তবে আমি অনেক কাজ—যাহা ইচ্ছা করি, তাহা করিতে পারি না কেন? তুমি যখন এ কথা বল, তখন তুমি তোমার ক্ষুদ্র 'আমি'র দিকে লক্ষ্য করিতেছ মাত্র। ভাবিয়া দেখ, তুমি ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার আপন ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইহা সর্ব্বশক্তিমতী? যাহা

তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও অধিকতর উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন—চরিত্র, ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা—উহার দুর্ব্বলতা নহে।

অতএব যদি আমি তোমাকে উপদেশ দিই যে, তোমার প্রকৃতিই অসৎ, আর তুমি কতকগুলি ভুল করিয়াছ বলিয়া তোমাকে অনুতাপ ও ক্রন্দন করিয়া জীবন কাটাইতে উপদেশ করি, তাহাতে তোমার বিশেষ কিছুই উপকার হইবে না, বরং উহা তোমাকে অধিকতর দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে, আর তাহাতে তোমাকে ভাল হইবার পথ না দেখাইয়া বরং আরও মন্দ হইবার পথ দেখান হইবে। যদি সহস্র বৎসর ধরিয়া এই গৃহ অন্ধকারময় থাকে আর তুমি সেই গৃহে আসিয়া 'হায়, বড় অন্ধকার! বড় অন্ধকার!' বলিয়া রোদন করিতে আরম্ভ কর, তবে কি অন্ধকার চলিয়া যাইবে? একটি দিয়াশলাই জ্বালিলেই এক মুহূর্ত্তে গৃহ আলোকিত হইবে। অতএব সারা জীবন 'আমি অনেক দোষ করিয়াছি, আমি অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছি' বলিয়া চিন্তা করিলে তোমার কি উপকার হইবে? আমরা নানা দোষে দোষী, ইহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। জ্ঞানের আলো জ্বাল, এক মুহূর্ত্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপকে প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে—সেই জ্যোতির্ম্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে—প্রকাশ কর; প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে প্রকাশ কর। আমি ইচ্ছা করি, সকল ব্যক্তিই এমন অবস্থা লাভ করুন যে, অতি জঘন্য পুরুষকে দেখিলেই তাহার বাহিরের দুর্ব্বলতার দিকে লক্ষ্য না করিয়া তাহার হৃদয়াভ্যন্তরবর্ত্তী ভগবানকে দেখিতে পারেন

আর তাহার নিন্দা না করিয়া বলিতে পারেন, 'হে স্বপ্রকাশক, জ্যোতির্ম্ময়, উঠ! হে সদাশুদ্ধস্বরূপ, উঠ। হে অজ, অবিনাশী, সর্ব্বশক্তিমান, উঠ! আত্মস্বরূপ প্রকাশ কর। তুমি যে-সকল ক্ষুদ্র ভাবে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছ, তাহা তোমাতে সাজে না।' অদ্বৈতবাদ এই শ্রেষ্ঠতম প্রার্থনার উপদেশ দিয়া থাকেন। ইহার একমাত্র প্রার্থনা—নিজস্বরূপ-স্মরণ, সদা সেই অন্তরস্থ ঈশ্বরের স্মরণ, তাঁহাকে সর্ব্বদা অনন্ত সর্ব্বশক্তিমান সদাশিব নিষ্কাম বলিয়া স্মরণ। এই ক্ষুদ্র অহং তাঁহাতে নাই, ক্ষুদ্র বন্ধনসমূহ তাঁহাতে নাই। আর তিনি অকাম বলিয়াই অভয় ও ওজঃস্বরূপ; কারণ কামনা, স্বার্থ হইতেই ভয়ের উৎপত্তি। যাহার নিজের অন্য কোন কামনা নাই, সে কাহাকে ভয় করিবে? কোন্ বস্তুই বা তাহাকে ভীত করিতে পারে? মৃত্যু তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অশুভ, বিপদ তাহাকে কি ভয় দেখাইতে পারে? অতএব যদি আমরা অদ্বৈতবাদী হই, আমাদিগকে অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে যে, আমরা এই মুহূর্ত্ত হইতেই মৃত। তখন আমি স্ত্রী, আমি পুরুষ—এসকল ভাব চলিয়া যায়, ঐগুলি কেবল কুসংস্কারমাত্র। অবশিষ্ট থাকেন সেই নিত্যশুদ্ধ নিত্যওজঃস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বজ্ঞস্বরূপ, আমি তখন আমার সকল ভয় চলিয়া যায়। কে এই সর্ব্বব্যাপী 'আমার' অনিষ্ট করিতে পারে? এরূপে আমার সমুদয় দুর্ব্বলতা চলিয়া যায়, তখন অপর সকলের ভিতর সেই শক্তির উদ্দীপনা করিয়া দেওয়াই আমার একমাত্র কার্য্য হয়। আমি দেখিতেছি, তিনিও সেই আত্মস্বরূপ কিন্তু তিনি তাহা জানেন না। সুতরাং আমায় তাঁহাকে শিখাইতে হইবে, তাঁহার সেই অনন্তস্বরূপ-প্রকাশে আমাকে সহায়তা করিতে

হইবে। আমি দেখিতেছি, জগতে ইহার প্রচারই বিশেষরূপে আবশ্যক। এইসকল মত অতি পুরাতন—সম্ভবতঃ অনেক পর্ব্বতও তখন উৎপন্ন হয় নাই যখন এইসকল মত প্রথম প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। সকল সত্যই সনাতন। সত্য ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নহে। কোন জাতি, কোন ব্যক্তিই উহা নিজস্ব বলিয়া দাবি করিতে পারে না। সত্যই সকল আত্মার যথার্থ স্বরূপ। কোন ব্যক্তিবিশেষের উহার উপর বিশেষ দাবি নাই। কিন্তু উহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে হইবে, সরলভাবে উহার প্রচার করিতে হইবে, কারণ তোমরা দেখিবে—উচ্চতম সত্যসকল অতি সহজ ও সরল। খুব সহজ ও সরলভাবে উহার প্রচার আবশ্যক, যাহাতে উহা সমাজের সর্ব্বাংশ ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিতে পারে, যাহাতে উহা উচ্চতম মস্তিষ্ক হইতে আরম্ভ করিয়া অতি সাধারণ মনের পর্য্যন্ত অধিকারের বিষয় হইতে পারে, যাহাতে আবালবৃদ্ধবনিতা উহা জানিতে পারে। এই সকল ন্যায়ের কূটবিচার, দার্শনিক মীমাংসাবলী, এই সকল মতবাদ ও ক্রিয়াকাণ্ড এক সময়ে উপকার করিয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আইস আমরা এক্ষণে ধর্ম্মকে সহজ করিবার চেষ্টা করি, আর সেই সত্যযুগ আনিবার সহায়তা করি, যখন প্রত্যেক ব্যক্তিই উপাসক হইবেন আর প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরস্থ সত্যই তাঁহার উপাস্য দেবতা হইবেন।

**সমাপ্ত**